হ্যালেভজ্

অভীক মুখোপাধ্যায়

চন্দ্রনাথ সেন

হ্যারেংজ্

বিড়ালের বাঘ হয়ে ওঠার কাহিনি

– অভীক মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ সেন

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০২০

প্রচ্ছদ
স্বর্ণাভ বেরা

প্রকাশক
অভিষেক আইচ ও অরিজিৎ ভদ্র
দ্য কাফে টেবল

আমার প্রিয়তমা, কোয়েলকে
—অভীক মুখোপাধ্যায়

বাবা আর মা'কে,
যাদের জন্য এই পৃথিবীর আলো দেখেছি
—চন্দ্রনাথ সেন

একজনের নাম আলাদা ভাবে উল্লেখ না করলে আমাদের পাপ হবে-

ডক্টর মুশতাক হুসেইন
ডিপার্টমেন্ট অব পলিটিক্যাল সায়েন্স
এসজিটিবি খালসা কলেজ
ইউনিভার্সিটি অব দিল্লি

আবেদন

নুক্‌, কিন্ডেল, কবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে) ইত্যাদি প্রথম দিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই বুঝতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

ভুমিকা

'হ্যারেৎজ'—অদ্ভুত এই নামটাকে বইয়ের প্রচ্ছদে দেখার পরে নিশ্চয়ই অনেক পাঠকবন্ধু গুগলে সার্চ করে দেখেছেন। কী পেয়েছেন সার্চ রেজাল্টে?

'দ্য ল্যান্ড [অব ইসরায়েল]'।

ওখানে 'দ্য' আর 'ল্যান্ড' এই শব্দ দুটোর মাঝখানে অলিখিত আরও একটা শব্দকে পড়তে হবে বন্ধুরা— 'প্রমিসড'... যে ভূমি বা জমির জন্য কথা দেওয়া হয়েছিল— দ্য প্রমিসড ল্যান্ড; দ্য প্রমিসড ল্যান্ড অব ইসরায়েল।

আমরা এই বইতে ইসরায়েল দেশটার বা ইহুদিদের জাতিগত ইতিহাস লিখতে বসিনি। লিখেছি তাদের সংক্ষিপ্ত সামরিক ইতিহাস বা কনসাইজড ডিফেন্স হিস্ট্রি। সম্ভবত বিশ্বের সর্বোচ্চ মেধাসম্পন্ন এই জাতির সামরিক শক্তি নিয়ে লেখালিখি করাটা হাস্যকরও, কারণ তারা মেধায় ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও সেই গুণটি নিয়ে কথা বলাই হয় না; ইহুদিদের ক্ষাত্রশক্তি নিয়েই বিশ্ববাসী বেশি আলোচনা করে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দুই-ই সমৃদ্ধ হয়েছে তথা হয়ে চলেছে তাদের জ্ঞানে— যদিও তা অনেক ক্ষেত্রেই স্বীকৃত হয়নি বা হয় না। খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক প্রভু যিশু, ঈশ্বরের পুত্র যিশু, তিনি কিন্তু ইহুদিই ছিলেন। খ্রিস্ট প্রচারিত খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীরাই বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় জনগোষ্ঠী। দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইহুদিদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে, কারণ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন আব্রাহাম ও ইসমায়েল।

পৃথিবীতে ইহুদিরাই সবথেকে বেশি বার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। এই বিশ্বের তাবড় তাবড় বিদ্বান, তার্কিক, দার্শনিক, অভিনেতা, বিজ্ঞানীর সঙ্গে জিউস যোগসূত্র মিলবে। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, সিগমন্ড ফ্রয়েড, উডি অ্যালেন থেকে হালফিলের ড্যানিয়েল র‍্যাডক্লিফ অবধি— প্রতিটা নামের সঙ্গেই ইহুদি রক্তের যোগ পাবেন বন্ধুরা। এমনকী আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভারত থেকে যে কমিউনিস্টরা ইসরায়েলের বিভিন্ন পলিসির ঘোর বিরোধ করে থাকেন, তাঁদের বাইবেল 'দাস ক্যাপিটাল'টাও লিখেছিলেন ইহুদি রক্তের ধারক-বাহক কার্ল মার্ক্স।

সেই ৩,০০০ বছর আগে নিজেদের দুধ-মধুর দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল এই দুর্দান্ত জাতিটি। সারা বিশ্বে বিচরণ করেছে অনায়াসে। যেখানেই পা রেখেছে, সেখানেই ফলিয়েছে সোনা। ভারতেও এসেছে। মোটামুটি শান্তিপ্রিয় ভূমিকাতেই তাদের দেখা গেছে সব জায়গায়। তবুও নানা বিবাদ ইহুদিদের পিছু ছাড়েনি। বিশেষ করে ইহুদিরা যখন নিজেদের কাঙ্ক্ষিত ভূমিতে ফিরে গিয়ে ১৯৪৮ সালে প্রথম বারের জন্য একটি স্বাধীন ইহুদি-রাষ্ট্র তৈরি করেছে, তখন থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের কট্টর ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর কাছে তারা চোখের বালি হয়ে উঠেছে। আঘাত এসেছে, প্রত্যাঘাত করে ইসরায়েল জবাব দিয়েছে। কেউ পিছু হটে গেছে ভয়ে, কেউ সাময়িক ভাবে কিছু দিন বা কয়েক বছর চুপ থাকার পর আবার আঘাত করেছে। যুদ্ধ চলছে সমানে। এখনও। অক্ষয়, অমর ইহুদিরা সূচাগ্র মেদিনী তো ছাড়েইনি, উলটে দখল নিয়েছে শত্রু শিবিরের। দুর্দান্ত জাতিটি ক্রমশ দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে।

আমাদের কাছে ইসরায়েলের সামরিক ক্ষমতা আসলে এক বিস্ময়। আমরা দুই বন্ধুই

পড়তে ভালোবাসি। ইসরায়েলের এসপিওনাজ, সামরিক ক্ষমতা নিয়ে ছড়ানো ছেটানো কিছু পড়াশোনা দুজনেই করছিলাম। টুকটাক ইংরেজি বইপত্র কিছু পড়াই ছিল, কিন্তু আমরা খুঁজছিলাম বাংলা বই। বোঝেনই, বাংলা ছাড়া অনেক কিছুই হজম হয় না যে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, বাংলাতে কোনো স্ট্যান্ডার্ড বই পাইনি। নেই। আর তখনই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম — ইসরায়েলের সামরিক ইতিহাস নিয়ে একটা বাংলা বই লিখে ফেললে কেমন হয়।

ব্যস, ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে লেগেছে। লিখতে বসে গেলাম। হাজার তোড়জোড়, হাজার পড়াশোনা, রাতজাগা, অসুস্থতা, নিজ নিজ গৃহিণীর বকুনি— সব সহ্য করে বইটা লিখে ফেলাই হল অবশেষে।

এখন প্রশ্ন হল, পাঠক কেন ভারতের সামরিক ইতিহাস ছেড়ে ইসরায়েলের সামরিক ইতিহাস নিয়ে পড়তে যাবেন?

উত্তর একটাই— ভারত ইসরায়েল হতে চলেছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ সুধী পাঠক, ঠিকই পড়লেন— ভারত ইসরায়েল হতে চলেছে।

কেন?

কারণ ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি সব কিছু ভারতকে ক্ষাত্রশক্তিতে বলীয়ান একটি রাষ্ট্র হয়ে ওঠার দিকে ত্বরান্বিত করছে, যে শত্রুর ঘরে ঢুকে মারবে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে, তাদের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেবে এয়ার স্ট্রাইক দিয়ে, এসপিওনাজ সিস্টেমকে সশক্ত করে দুর্বল করে দেবে নিজের প্রতিপক্ষকে।

এছাড়াও প্রচুর মিল দুই দেশের মধ্যে। অনতি অতীত থেকে অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে ভারতের রাজনীতি উত্তপ্ত হয়েছে। একবার মধ্যপ্রাচ্যের ইসরায়েলের জেরুসালেম শহরটার দিকে তাকাতে অনুরোধ করব আমরা। দুটি ধর্মের বিবাদ একটি নির্দিষ্ট সৌধকে ঘিরে— এই তো?

দেখুন, দু' জায়গাতেই তা-ই। অযোধ্যায় রামমন্দির-বাবরি মসজিদ, জেরুসালেমে ওয়েস্টার্ন ওয়াল। ভারতে এক দল বলছে অযোধ্যার ওই বিতর্কিত ভূমি শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান ছিল, এক দল সেখানে মীর বাঁকির তৈরি করা বাবরি মসজিদের পক্ষ নিয়ে লড়ছে; জেরুসালেমের ওই বিখ্যাত দেওয়ালকে ইহুদিরা তাদের পবিত্র মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বলে, আর মুসলমানেরা বলে এখান থেকেই তাদের নবী হজরত মুহম্মদ বুরাক নামক জীবের পিঠে চড়ে জন্নতে যাত্রা করেছিলেন। একটি করে ভূমিখণ্ড, দুটি ধর্মের নাভি সেখানে গাঁথা। দুটো জায়গারই কত মিল! দুই ক্ষেত্রেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পরিসর। বাদবিবাদ।

ইহুদিরা বিদেশের মাটিতে ছিন্নমূল অবস্থায় দিনের পর দিন মার খেয়েছে। জার্মানরা মেরেছে, রাশিয়ানরা মেরেছে এভাবে লিখতে বসলে তালিকাটা দীর্ঘতর হবে। হলোকাস্টের কথা আমাদের চোখে জল এনেছে। এমন অসাধারণ মেধাবী একটি জাতিকে কীভাবে শেষ করার চক্রান্ত করেছিল তা পড়লে আপনাদের চোখও ভিজে উঠতে বাধ্য বলেই মনে করি আমরা। অনেকটা বাধ্য হয়েই নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং ভবিষ্যৎকে রক্ষা করার জন্য বর্তমান ইসরায়েলের স্থাপনা করে তারা। আর তার পর থেকে আজ অবধি (সময়কালের) ইসরায়েলের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের কথা লিখেছি আমরা দুই বন্ধুতে মিলে। পাঁচ পাঁচটি ক্ষমতাধর ইসলামিক রাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সদ্যোজাত দেশের অসম যুদ্ধের কথা। এক সকালে তিনটি দেশের বায়ুসেনাকে সমূলে বিনষ্ট করে ছ' দিনের যুদ্ধে নিজের দেশের

ক্ষেত্রফলকে চার গুণ বাড়িয়ে ফেলার অপ্রতিম শৌর্যগাথা। নিজের খেলোয়াড়দের হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য দুনিয়ার প্রতিটি কোণায় লুকিয়ে দুশমনকে নিকেশ করার কাহিনি। ইহুদি জাতির প্রচণ্ড জিজীবিষার কথা।

ইসরায়েলিদের নাগরিক জীবনও কিন্তু বর্মাবৃত। সবসময় শত্রুদেশ কিংবা উগ্রপন্থী হামলার ভয়ে থাকতে হয় তাদের। এই বুঝি সাইরেন বেজে উঠল, এখুনি পড়ি কি মরি করে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে কারো বাড়িতে বা নির্দিষ্ট বাঙ্কারে। ভাবুন, কতটা বিপন্নতার মধ্যে থাকতে হয় এই দেশকে। তারা যে লড়তে লড়তে বিড়াল থেকে বাঘ হয়ে উঠবে এতে আর আশ্চর্যের কী আছে?

একজন কৃষক নিজের সব ফসল কিন্তু একবারে খেয়ে ফেলে না। অল্প কিছুটা পরের চাষের কাজে লাগাবে বলে বীজ হিসাবে রেখে দেয়। ইসরায়েল ১৯৪৮ সালে জন্ম নেওয়ার পর যখন নিজের সবথেকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখ পড়ল, তখন কিন্তু ইহুদিরা ভাবেনি যে তারা এই সংঘর্ষ থেকে নিজেদের অক্ষত অবস্থায় বের করে আনতে পারবে। তারা কী করেছিল বলুন তো? নিজেদের সন্তানদের সুরক্ষিত করেছিল। প্রত্যেক পরিবারের বাবা কিংবা মায়ের মধ্যে একজন বাচ্চাকে(দের) নিয়ে সুরক্ষিত জায়গায় চলে যায়, আর অপর অভিভাবক মোর্চার সামনে চলে আসে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মায়েরাই সন্তানকে সুরক্ষিত করার ভার নিয়েছিলেন এবং দেশের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন পিতারা। আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে যে মায়েরা নিজেদেরকে দেশরক্ষার জন্য বেশি সক্ষম মনে করেছিলেন, তাঁরা কিন্তু সেই কাজটা করতে পিছপা হননি। সন্তানের দায়িত্ব বাবার হাতে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন বীরবিক্রমে।

একটি মৌমাছি যেভাবে নিজের চাকের বাইরে একাকী, স্বতন্ত্র এবং স্বকেন্দ্রিক জীবন কল্পনাও করতে পারে না, ঠিক তেমন ভাবেই একজন ইসরায়েলি নিজের সমাজ আর দেশকে ছাড়া নিজের জীবনের কল্পনা করতে পারবে না এবং দেশের হয়ে যে কোনো যুদ্ধের সময় তার মধ্যে আত্মোৎসর্গ করার ভাবটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে চলে আসে। ইসরায়েলিদের মনে এধরনের আইডিয়ার প্রথম বীজ কিন্তু উপ্ত হয়ে থাকে কিবুটজ্ থেকে।

কিবুটজ্ হল এক ধরনের কমিউন। সেখানে অনেক পরিবার একই সঙ্গে সামূহিক জীবন নির্বাহ করে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা এবং কৌশল অনুসারে কাজ করে সেখানে, প্রত্যেকটি মানুষ সেখানে অপরিহার্য। কেউ শ্রমিক, কেউ কারিগর, কেউ শিক্ষক, কেউ ডাক্তার। সবার সন্তান একইসঙ্গে বেড়ে ওঠে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভেদাভেদটাকে মুছে ফেলা হয়। উৎপাদনের দৃষ্টিতে কিবুটজ্ একটি স্বাধীন ইউনিটের মতো কাজ করে। ফার্ম চালানো হয়, কারখানার পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ইসরায়েলের সামগ্রিক প্রাকৃতিক এবং জনসম্পদের মাত্র ১০%-এরও কম ব্যবহার করে কিবুট-এর মাধ্যমে মোট কৃষি উৎপাদনের ৮০% এবং ঔদ্যোগিক উৎপাদনের ৫০% সৃষ্টি হয়। এটা শুধু ইসরায়েলের অর্থব্যবস্থারই নয়, সামাজিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ডও বটে।

যখন দেশে যুদ্ধ নেই, তখন অসৈনিক জনসংখ্যার ক্ষেত্রে অনুশাসন ও সমর্পণের এমন উৎকৃষ্ট উদাহরণ সম্ভবত আর কোথাও মেলে না। আমরা যত পড়েছি, ততই মনে হয়েছে ইসরায়েলের সৈন্য-গাথা যেন এক রূপকথা, কিন্তু পড়ে বিশ্লেষণ করে আমরাই বলতে বাধ্য হয়েছি—- ওদের সৈন্য সংস্কৃতি আসলে ওদের সমাজ-ব্যবস্থারই প্রতিফলন মাত্র। ইসরায়েলের সামরিক দৃষ্টি সশক্ত হওয়ার কারণ হল তাদের সামাজিক দৃষ্টি সবল। একতা প্রবল! এমনই তাদের সমাজ। এমনই তাদের ফৌজ যে, দেশের ক্ষমতাধারী দল এবং বিরোধী দল দেশের শত্রুর প্রতি একটাই চিন্তাধারা রেখে নিজেদের বাহিনীকে বলে—-

রাইজ অ্যান্ড কিল ফার্স্ট!

১৯৪৮ সালের আগের ২,০০০-৩,০০০ বছর দেখলেই বোঝা যায় যে, ইহুদিদের তখনকার ইতিহাসটা আসলে তাদের পরাজয়ের ইতিহাস, পরাভবের কাহিনি। নিজেদের ভিটেমাটি হারিয়ে, দেশ ছেড়ে ইহুদিরা রুটিরুজির তাগিদে ব্যবসার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মেধাবী ইহুদিরা ব্যাঙ্ক, ফ্যাক্টরির মালিক হয়ে উঠেছিল। তখন তাদের হাতে অগুনতি টাকা। অন্য কিছু দেখতে অভ্যস্ত ছিল না তারা, অন্তত ওই সময়ে তো বটেই। বড় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল তাদের সব কিছুই। যে দেশেই থেকেছে, সেখানে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে থেকেছে, কেবল নিজের আর নিজের পরিবারের জন্য বেঁচেছে। বিশ্ব তখন ইহুদিদের পরজীবী তকমা দিয়েছে। আর তার ফলে তারা যত না অর্থ উপার্জন করেছে, তার থেকেও বেশি উপার্জন করেছে ঘৃণা। এবং শেষমেশ একদিন এই ক্রমশ পুঞ্জীভূত হতে থাকা ঘৃণা তাদের অস্তিত্ব সংকটের কারণ হয়ে উঠল। স্টিভেন স্পিলবার্গের একটা সিনেমা আছে — 'শিন্ডলার্স লিস্ট'। সেখানে একেবারে শেষ দৃশ্যে যখন রেড আর্মি অস্কার শিন্ডলারের ক্যাম্প থেকে ইহুদিদের মুক্তি দিচ্ছে, তখন একজন রাশিয়ান আধিকারিক বলে ওঠে, 'ইউ অল আর ফ্রি টু গো বাট হোয়্যার উইল ইউ গো? ইউ কান্ট গো টু ইস্ট... দে হেট ইউ দেয়ার। ইফ আই ওয়্যার ইউ, আই ওন্ট গো টু ওয়েস্ট ইদার...

ইসরায়েলিদের সামনে তখন যাওয়ার মতো কোনো জায়গা ছিল না। না পূর্বে, না পশ্চিমে। তারা তখন জেরুসালেমের দিকে চলতে শুরু করে দিল। তাদের লড়াই তখন নিয়তির বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। দু' চোখে স্বপ্ন ছাড়া সঙ্গে কোনো অস্ত্র ছিল না, কোনো ক্ষমতাই ছিল না তাদের। একটি স্বাধীন ইহুদি-রাষ্ট্রের মানচিত্র আসলে তাদের হৃদয়ে আঁকা ছিল। তারা বুক থেকে সেই মানচিত্রটাকে মাটিতে নামিয়ে তৈরি করেছিল 'ইসরায়েল', যার আক্ষরিক অর্থ হল 'ঈশ্বরকেও হারিয়ে দেয় যে'— 'ট্রায়াম্ফ্যান্ট অব গড'! আর এই নতুন দেশ তৈরির দাম চুকিয়েছিল নিজেদের রক্তে। আসলে অসংখ্য খারাপ অভিজ্ঞতাই ইসরায়েলকে আজকের ইসরায়েল করে তুলেছে। হিটলার নামক দানব, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, গ্যাস চেম্বার, দুর্ধর্ষ আরব দেশগুলোর মুহুর্মুহু আক্রমণ, ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদী হানা, ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর, ফাতাহ্, পি এল ও এসবের মধ্যে দিয়ে ইহুদিরা যা কিছু শিখেছিল বা শিখেছে, তা আমরা শিখতে পারি ইসরায়েলের সামরিক ইতিহাস পড়ে।

কাজ যত এগিয়েছে, আমরা ততই বুঝেছি যে একটা বইয়ের মধ্যে ইসরায়েলের সামরিক ইতিহাস, গুপ্তচর সংস্থাগুলোর কাজকে বেঁধে ফেলা কার্যত অসম্ভব। যদি পাঠক চান, তবে এর পরেও এই নিয়ে কাজ করার অবকাশ রয়ে গেল।

অভীক মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ সেন
গীতবিতান, ডানকুনি, হুগলী বর্ধমান

তথ্যঋণ:

১. ইসরায়েল, আ কনসাইজ হিস্ট্রি অব আ নেশন রিবর্ন, ড্যানিয়েল গার্ডিস।

২. জেরুসালেম, দ্য বায়োগ্রাফি, সাইমন সেবাগ মন্টেফিয়োর।

৩. দ্য স্টোরি অব দ্য জিউস, ফাইন্ডিং দ্য ওয়ার্ডস ওয়ান থাউজ্যান্ড বিসিই-১৪৯২ সিই, সিমন সামা।

৪. দ্য জিউস স্টেট, থিওডোর হার্জেল।

৫. দ্য উইপন উইজার্ডস, হাউ ইসরায়েল বিকেম আ হাই-টেক, মিলিটারি সুপারপাওয়ার, য়াকভ কাটজ অ্যান্ড আমির বোহবট।

৬. নাৎসি জার্মানির জন্ম ও মৃত্যু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

৭. মোসাদ, দ্য গ্রেটেস্ট মিশনস্ অব দ্য ইসরায়েলি সিক্রেট সার্ভিস, মাইকেল বার জোহার, নিসিম মিসাল।

৮. বিইং ইন্ডিয়ান, বিইং ইসরায়েলি; মাইগ্রেশন, এথনিসিটি অ্যান্ড জেন্ডার ইন দ্য জিউয়িশ হোমল্যান্ড, ময়না চাওলা সিং।

৯. মাইন কাম্পফ্, অ্যাডলফ হিটলার।

১০. মোসাদ এক্সোডাস, গ্যাড সিমরন।

১১. জিউস, গড অ্যান্ড হিস্ট্রি, ম্যাক্স আই ডিমন্ট।

১২. রাইজ অ্যান্ড কিল ফার্স্ট, আ সিক্রেট হিস্ট্রি অব ইসরায়েলস্ টার্গেটেড অ্যাসাসিনেশনস্, রনেন বার্গম্যান।

১৩. টুয়েলভ স্টাডিজ অন দ্য মেকিং অব আ নেশন, দ্য বিগিনিং অব ইসরায়েলস হিস্ট্রি, জেরেমিয়াহ হুইপল জেক্স।

১৪. দ্য মোসাদ, সিক্স ল্যান্ডমার্ক মিশনস অব দ্য ইসরায়েলি ইনটেলিজেন্স এজেন্সি, ১৯৬০, ১৯৯০, মার্ক ই. ভার্গো

১৫. গাইডন’স স্পায়েজ, দ্য সিক্রেট হিস্ট্রি অব দ্য মোসাদ, গর্ডন থমাস।

১৬. মৃত্যোর্মা অমৃতম্, নারায়ণ সান্যাল।

১৭. ভেনজেন্স: দ্য ট্রু স্টোরি অব অ্যান ইসরায়েলি কাউন্টার টেররিস্ট টিম, জর্জ জোনাস।

১৮. অপারেশন অচার্ড, ইসরায়েলি মোসাদ, ইসরায়েল’স স্ট্রাইক অন দ্য সিরিয়ান রি-অ্যাক্টর, ড্যান মাগেন।

১৯. ইয়াসির আরাফাত, আ পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফি, ব্যারি রুবিন অ্যান্ড জুডিথ কল্প রুবিন।

২০. নো মিশন ইজ ইমপসিবল, মাইকেল বার জোহার, নিসিম মিসাল।

২১. মাই প্রমিসড ল্যান্ড, দ্য ট্রায়াম্ফ অ্যান্ড ট্রাজেডি অব ইসরায়েল, আরি শাবিত।

২২. সিক্স ডেজ অব ওয়র, মাইকেল বি. ওরেন।

২৩. spiegel.de/international/

২৪. aljazeera.com

২৫. jewishvirtuallibrary.org

২৬. haaretz.com

২৭. economictimes.indiatimes.com/news/defence/israel-wins-777-mn, indian-missile-defence-order

রিটার্ন টু জায়ন

১৮৯৮ সালের কথা, মার্ক টোয়েন বলেছিলেন— 'ইহুদিরা যদি একটা রাষ্ট্র গঠন করে, তাহলে তা হবে বিশ্বের সবচেয়ে উর্বর মস্তিষ্কের মানুষদের দেশ। এটা হতে দেওয়াটা ঠিক হবে না। এই জাতি নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পেরে যাবে। ঘোড়া যদি নিজের শক্তির কথা জেনে যায়, তাহলে তো আমরা আর ঘোড়ায় চড়তেই পারব না'।

টোয়েন কি জানতেন যে, এর ঠিক ৫০ বছর পরে ইহুদিরা একটা রাষ্ট্র তৈরি করবে?

হয়তো 'না'।

ইহুদিদের ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠন মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক অসাধারণ অধ্যায়! নতুন রাষ্ট্র গড়ে তোলার পরের কয়েক দশকের মধ্যেই তাঁরা এমন উচ্চতায় নিজেদের নিয়ে গেছে যে তা আজ রূপকথার মতোই শোনায়। আর মনে হয় সার্থক বেন-গুরিয়নের সেই উক্তি— 'ইন ইসরায়েল, ইন অর্ডার টু বি রিয়ালিস্ট ইউ মাস্ট বিলিভ ইন মিরাকলস।'

হ্যাঁ, ইসরায়েল আসলে এক অলৌকিক ভূমির নাম। সেই সত্তর খ্রিস্টাব্দের কথা। এই মাটি থেকে রোমানদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছে ইহুদির দল। তারপর প্রায় দু' হাজার বছর ধরে ইহুদিরা তাদের পুণ্যভূমিতে ফিরে আসার স্বপ্ন দেখেছে। পৃথিবীর যে স্থানেই থাকুক না কেন, ইহুদিরা প্রার্থনা করত জেরুসালেমের দিকে মুখ করে। একদিন যে তারা সেখানে ফিরবেই এই বিশ্বাস কখনো তাদের মধ্যে থেকে হারিয়ে যায়নি। প্রায় দু' হাজার বছর তারা বাস করেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এই সময় তাদের নিজস্ব কোনো দেশ ছিল না।

ষষ্ঠ শতক থেকেই প্যালেস্টাইন বা ফিলিস্তিনে ইহুদিরা ছিল সংখ্যালঘু। সেই সময় থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত প্যালেস্টাইন ছিল পাথুরে, অনুর্বর ও ক্যাকটাস ভরা এক মরুময় এলাকা।

জায়নিজম— যার মানে রিটার্ন টু জায়ন' বা 'রিটার্ন টু জেরুসালেম'। ইহুদিদের স্বপ্ন ছিল তারা যখন আবার প্যালেস্টাইনে ফিরে যাবে, তখন জেরুসালেমই হবে তাদের রাজধানী।

জায়নিজমই কি ইহুদি ধর্ম?

না, ইহুদি রীতির সঙ্গে জায়নিজমের একটা মূলগত পার্থক্য আছে। জায়নিজমের আবির্ভাবের আগে ইহুদিরা বিশ্বাস করত যে, একজন মসীহা আবির্ভূত হবেন এবং তিনিই ইহুদিদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন ফিলিস্তিনের মাটিতে। আর জায়নিস্টরা বলেন—মসীহা নয়, এই কাজ করতে হবে আমাদেরই, ইহুদিদেরই!

জায়নিজমের সূত্রপাত ১৮৬০ সাল নাগাদ। ইহুদি-বিদ্বেষ তখন ইহুদিদের কাছে এক জ্বলন্ত সমস্যা এবং তা কোনো বিশেষ দেশের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ইউরোপে ইহুদিদের প্রতি খ্রিস্টানদের একটা জাতিগত বিদ্বেষ ছিলই। পূর্ব ইউরোপে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, যিশু খ্রিস্টকে ইহুদিরা হত্যা করেছে। আর এই বিদ্বেষ এতটাই প্রবল ছিল যে কোনো ইহুদি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেও তাকে ঘৃণার চোখেই দেখা হত। মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপেও এই বিদ্বেষ সংক্রামিত হয়। ইহুদিরা এটা উপলব্ধি করে যে, এক দেশ থেকে পালিয়ে অন্য কোনো দেশে আশ্রয় নিলেও তারা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না।

১৮৮০ সালে রাশিয়াতে সরকারি স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহুদিদের ভর্তির জন্য একটা

সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়, যাতে সব ইহুদি শিক্ষার সুযোগ না পায়। ১৮৯১-১৮৯২ সালের মধ্যে কম করে কুড়ি হাজার ইহুদিকে মস্কোর বাইরে বের করে দেওয়া হল। এভাবেই ইহুদিরা হয়রানির শিকার হচ্ছিল। ১৮৮২ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে পূর্ব ইউরোপের অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, জার্মানি থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ ইহুদি পালিয়ে বাঁচেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পনেরো বছর আগে থেকে প্রায় ১৩ লক্ষ ইহুদি রাশিয়া থেকে পলায়ন করে। এদের একটা বড় অংশ আমেরিকায় পাড়ি জমায়। আর কিছু লোক চলে যায় প্যালেস্টাইনে।

জায়নিজমের উত্থানের ক্ষেত্রে ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত লেখা বেশ কিছু বই ইহুদিদের মধ্যে বিস্তর প্রভাব ফেলেছিল। যেমন ১৯৬২ সালে মোজেস হেস-এর লেখা ‘রোম অ্যান্ড জেরুসালেম’। এই বইতে হেস ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানান। এই সময়েই পেরেট্জ সমোলেসকিন এক হিব্রু মাসিক পত্রিকা বের করতে শুরু করেন, যেখানে তিনি লেখেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ ‘দ্য ইটারনাল পিপল’। তাঁর মত ছিল— ‘প্যালেস্টাইন একদিন সমগ্র বিশ্বের কাছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে এবং ইহুদিরা আবার সেখানে নিজেদের পুরোনো ঐতিহ্য ফিরে পাবে।’ ভদ্রলোকের দূরদর্শিতা দেখলে অবাক হতে হয়।

১৮৮০ সালে রাবাই স্যামুয়েল মহিলিভার প্যালেস্টাইনে প্রথম ইহুদিদের অনুপ্রবেশের সূচনা করেন। তিনি একটি রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করেন, যার নাম ছিল— ‘লাভার্স অফ জায়ন’। মহিলিভার নিজের রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে জমি কেনার ডাক দেন। রাশিয়া ও পোল্যান্ডের ইহুদিদের মধ্যে তাঁর প্রচারই সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল।

লাভার্স অফ জায়নের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন জুডা পিন্সকার। তাঁর আরও একটা পরিচয় ছিল— রাশিয়ান মেডিকাল কর্পসের একজন আধিকারিক। তিনি ওদেসাতে ইহুদিদের ওপর চলা হত্যাকাণ্ড নিজের চোখে দেখেছিলেন। পিন্সকার ইহুদিদের শক্ত হাতে লড়াই করার ডাক দিলেন। তিনি বললেন, ‘ইহুদিরা নিজেরা নিজেদের রক্ষা করতে না পারলে কেবলমাত্র অন্যের দয়ার ওপর নির্ভর করে কোনোভাবেই টিকে থাকতে পারবে না।’

আর ঠিক এই সময়েই আবির্ভাব ঘটল ইহুদিদের সবচেয়ে বেশি আলোচিত নেতা থিওডর হার্জেলের। ১৮৬০ সালে হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট শহরে এক সম্ভ্রান্ত ইহুদি পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ভিয়েনাতে তিনি আইন নিয়ে পড়াশোনা করেন। কিন্তু পেশা হিসাবে বেছে নেন সাংবাদিকতাকে এবং একজন দক্ষ সাংবাদিক হিসাবে তিনি ভিয়েনাতে বেশ সুনামও অর্জন করেন।

এই পর্যন্ত হার্জেলের জীবন স্বাভাবিক খাতেই বইছিল। কিন্তু ওই যে, নিয়তি কেন বাধ্যতে। জীবনের বাঁক বদল করে দিল একটি ঘটনা, যা ‘ডেফাস অ্যাফেয়ার’ নামে ইতিহাসে খ্যাত। একটি পত্রিকার তরফ থেকে হার্জেলকে এই কেসটা কভার করার জন্য প্যারিসে পাঠানো হয়। সময়টা ছিল ১৮৯৪ সালের ডিসেম্বর মাস। ক্যাপ্টেন আলফ্রেড ড্রেফাস ছিলেন একজন ফরাসি আর্টিলারি অফিসার। জাতিতে ইহুদি। জার্মানিকে ফরাসি সেনার গোপন তথ্য সরবরাহ করার অভিযোগে এই ইহুদি অফিসারকে জেলে পোরা হয়। ১৮৯৬ সাল নাগাদ অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেল যে, আসল অপরাধী ড্রেফাস নন, আরেক জন ফ্রেঞ্চ আর্মি মেজর। তখন ফরাসি আর্মির উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তত দিনে সংবাদমাধ্যমে গোটা ব্যাপারটা নিয়ে বেশ শোরগোল পড়ে গেছে।

হার্জেল প্রথম দিকে ভেবেছিলেন যে, ড্রেফাসই আসল অপরাধী। কিন্তু যখন তিনি

নিশ্চিত হলেন ড্রেফাস নির্দোষ, তখন তিনি ড্রেফাসের সমর্থনে কোমর বেঁধে নামলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯০৬ সালে ড্রেফাসের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ খারিজ করে দেওয়া হল এবং তাঁকে ফ্রেঞ্চ আর্মিতে মেজর পদে পুনর্বহাল করার সিদ্ধান্ত নিল ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্ট।

এই ঘটনা হার্জেলের জীবনে গভীর দাগ কেটে যায়। ইহুদি-বিদ্বেষের যে রূপ তিনি দেখলেন, তাতে তিনি বুঝলেন যে এই বিদ্বেষের শেকড় সমাজের অনেক

গভীর পর্যন্ত ঢুকে আছে। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন, 'একে উপড়ে ফেলা কি অসম্ভব?' তাঁর কানে বাজতে থাকল উন্মত্ত ফরাসি জনতার চিৎকার— 'ইহুদিদের মেরে ফেলো! ইহুদিদের মেরে ফেলো!'

তিনি লিখলেন একটি বিখ্যাত বই— 'দ্য জিউয়িস স্টেট'। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে। রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হল। জায়নিজম পরিণত হল একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে। বইটি ইংরেজি, হিব্রু, য়িদ্দিশ, রোমানিয়ান, বুলগেরিয়ান, রাশিয়ান ও ফরাসি ভাষায় অনূদিত হল। ইহুদিরা এবার ভাবতে শুরু করলেন যে, এবার তাঁদের একটা দেশ দরকার এবং তা বাস্তবেও করে দেখানো সম্ভব। এই বই প্রকাশিত হবার পরই কেউ হার্জেলকে প্রথম জায়নিস্ট কংগ্রেসের প্রস্তাব দেন এবং তিনি সেই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণও করেন। প্রায় আঠেরো মাসের পরিকল্পনার পর তিনি এই জায়নিস্ট কংগ্রেস বাস্তবায়িত করে দেখালেন। ১৮৯৭ সালে সুইৎজারল্যান্ডের বেসেল শহরে আয়োজিত হল প্রথম জায়নিস্ট কংগ্রেস। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অংশগ্রহণকারীরা জমায়েত হয়েছিল বেসেলে। ব্রিটেন, আমেরিকা, প্যালেস্টাইন, আরব, রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স ও আরো অনেক দেশ থেকে অংশগ্রহণকারীরা এসেছিল। মোট ১৮৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। কয়েক দিনের দীর্ঘ আলোচনা ও বাগবিতণ্ডার পর ইহুদিদের জন্য প্যালেস্টাইনে স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি ধাপ স্থির করা হয়—

-প্যালেস্টাইনে কৃষক, শ্রমিক ও মিস্ত্রিদের বাস করার জন্য উৎসাহিত করা হবে।

-এমন একটা আইনব্যবস্থা তৈরি করা হবে, যার সঙ্গে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ইহুদিদের আইনের সামঞ্জস্য থাকবে।

-ইহুদি ভাবাবেগ ও জাতীয়তাবাদকে আরও শক্তিশালী করে তোলা হবে।

-ইহুদিদের এই দেশের জন্য একটা সরকারী স্বীকৃতি জোগাড় করাই হবে প্রাথমিক লক্ষ্য।

—শিক্ষাদীক্ষার মান বজায় রাখার জন্য একটা হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাখা হয়।

-ইহুদিদের জাতীয় তহবিল তৈরি করা হবে, যার উদ্দেশ্য অটোমান শাসিত প্যালেস্টাইনে জমি কিনে তাকে বসবাসের উপযোগী করে তোলা।

হার্জেল পরে নিজের ডায়রিতে লিখেছিলেন— 'বেসেলে আমি ইহুদি রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলাম, কিন্তু যদি আজ আমি এই এই কথাটি চিৎকার করে সবাইকে শোনাই তাহলে আমি হাসির খোরাক হব। আজ থেকে পাঁচ বছর পর না হোক, ৫০ বছর পর সবাই আমার কথার সত্যতা স্বীকার করে নেবে।'

হার্জেল জানতেন যে, ইহুদি-রাষ্ট্র গঠন করাটা মোটেও সহজ হবে না। কারণ ধনী

ইহুদিরা ছিল হার্জেলের মতবাদের বিরোধী। অনেক রাবাইও তাঁর মতবাদকে সমর্থন করেননি। তবু ভবিষ্যতের ইহুদি-রাষ্ট্র নিয়ে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। কারণ সাধারণ নিম্নবিত্ত ইহুদিরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করছিলেন। তাঁরা হার্জেলের নাম দিয়েছিলেন— 'হার্জেল দ্য কিং'।

কিন্তু রাজারও ভুল হয়। আর হার্জেলও এই সময় একটা মারাত্মক ভুল করে বসেন। জায়নিস্টদের মধ্যে তখন দুটো দল ছিল। এক দল মনে করত যে কেবল কূটনীতির মাধ্যমেই ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আরেকটা দল মনে করত যে, স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র তৈরি করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা নেই। একদম ভারতের স্বাধীনতা-পূর্ব নরমপন্থী ও চরমপন্থী আন্দোলনের মতোই। ১৯০৩ সালে জায়নিস্ট কংগ্রেসে হার্জেল প্রস্তাব রাখেন প্যালেস্টাইনের পরিবর্তে উগান্ডাতে ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হোক, কারণ ব্রিটিশরা তাঁকে ওখানে জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই প্রস্তাবে এক চরম বিশৃঙ্খলা জন্ম নিল। ক্রুদ্ধ জায়নিস্টরা তাঁকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলল। এই ঘটনার প্রায় এক বছর পর মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সেই হার্জেলের মৃত্যু হয়।

জায়নিস্টরা প্যালেস্টাইনে 'জায়নিস্ট ন্যাশনাল ফান্ড' ব্যবহার করে জমি কিনতে আরম্ভ করে দেয়। জমির মালিক তো ছিল আরব ও তুর্কিরা। তারা অত্যন্ত চড়া দামে জমি বিক্রি করছিল। ১৮৮০ সাল নাগাদ মাত্র ১২,০০০ ইহুদির বাস ছিল প্যালেস্টাইনে। ১৯৮০ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত আরো ১,১৫,০০০ জন ইহুদি এই মাটিতে ডেরা জমায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। জায়নিস্ট মুভমেন্ট একটা বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেল। এই সময় অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল প্যালেস্টাইন। অটোমানরা জার্মানির পক্ষ নেওয়ায় ইহুদিদের জন্য পরিস্থিতি হয়ে উঠল বিপজ্জনক। কারণ অটোমানরা সব ইহুদিকেই সন্দেহের চোখে দেখছিল। সামান্য ইংরেজি জানা ইহুদিদেরকেও ব্রিটিশদের সমর্থক সন্দেহে ফাঁসিতে ঝোলানো হতে থাকে। ১২,০০০ ইহুদিকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। জায়নিজমকে সম্পূর্ণরূপে বেআইনি ঘোষণা করা হয়।

১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর ব্রিটিশ বিদেশ সচিব আর্থার জেমস ব্যালফোর বিশিষ্ট ব্রিটিশ জায়নিস্ট লর্ড ওয়াল্টার রথসচাইল্ডকে একটি খোলা চিঠিতে জানান যে, ব্রিটিশ সরকার মনে করে যে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জন্য একটা আলাদা রাজ্য তৈরি হওয়া দরকার। এটাই 'ব্যালফোর ডিক্লারেশন' নামে খ্যাত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবহ। ব্রিটিশ ও অস্ট্রেলিয়ার সৈন্য তখন প্যালেস্টাইনের ভেতর লড়ছে অটোমানদের বিরুদ্ধে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে এমন একটা খোলা চিঠি ইহুদিদের পক্ষে কতটা মঙ্গলকারী আর কতটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, তা নিয়ে অবশ্য বিতর্কের শেষ নেই। কারো কারো মতে ইহুদিদের যুদ্ধে অবদানের কথা মাথায় রেখেই এই ডিক্লারেশন করা হয়। এদের মধ্যে একজনের নাম উল্লেখ না করলেই নয়— কেম উইজম্যান। উইজম্যান ছিলেন একজন ইহুদি কেমিস্ট। তিনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফারমেন্টেশনের জনকও বটে। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সিন্থেটিক কর্ডাইট তৈরি করার দায়িত্ব দেয়। এটার ব্যবহার হত বিস্ফোরক তৈরি করার জন্য। আগে কর্ডাইট তৈরি করার জন্য জার্মানি থেকে আমদানি করা অ্যাসিটোন ব্যবহার করা হত। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এর একটা বিকল্পের দরকার হয় ব্রিটিশদের। উইজম্যান ব্রিটিশদের দেওয়া দায়িত্ব পালন করেন ও তিনি সিন্থেটিক কর্ডাইট তৈরির কৌশল তাদের হাতে তুলে দেন এবং এই কাজের সুবাদে তিনি ব্রিটেনের সিনিয়র ক্যাবিনেট সদস্যদের ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন।

উইজম্যান তাদের কাছে ইহুদিদের সমস্যাগুলো তুলে ধরলেন। যদিও তিনি ছিলেন

ব্রিটিশ নাগরিক, কিন্তু স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের জন্য নিজের চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। পরবর্তীতে তিনি ইসরায়েলের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা আরেকটা ছলনা করল। তারা আরবদের প্রতিশ্রুতি দিল যে, যদি আরবরা অটোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাহলে আরবদের স্বাধীন দেশ গড়ার অধিকার দেওয়া হবে। ফলস্বরূপ তৈরি হল সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্সজর্ডন, ইরাক ও সৌদি আরবের মতো দেশ। এবার প্যালেস্টাইন কার দখলে থাকবে এই নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এই সময় সামনে আসে 'কিং অফ হেজাজ' ও মিশরের ব্রিটিশ হাই কমিশনার স্যর আর্থার হেনরি ম্যাকমোহনের মধ্যে আদানপ্রদান হওয়া চিঠিপত্র। এতে ব্রিটিশদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট হয়। আরবরা দাবি করে যে, প্যালেস্টাইনও এই প্রতিশ্রুতির অংশ। যদিও প্যালেস্টাইনের স্পষ্ট উল্লেখ তাতে ছিল না। এবার শুরু হয় বেলফর ডিক্লারেশন ও ম্যাকমোহনের চিঠিপত্র নিয়ে টানাহেঁচড়া।

আরবরা দাবি করল সপ্তম শতক থেকে তারাই এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাদেরই এই এলাকা প্রাপ্য। আর ইহুদিদের দাবি ছিল যে, খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ লে হুদিরাই এই অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং সেই সুবাদে তাদেরই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

এদিকে ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছিল। ১৯১৮ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে প্রায় ১.৫ লক্ষ ইহুদি প্যালেস্টাইনে এসে বসবাস করতে শুরু করে।

মরুভূমি এলাকার মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল গ্রাম, শহর, কলকারখানা ও চাষের খামার। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে থাকল। আর এর সুফল পেল আরবরাও। সেই সময় প্রায় ১ লক্ষ আরব ছিল ভূমিহীন। তাদের জীবনযাপন ছিল যাযাবরের মতোই। আরবরা ইহুদিদের খেতখামার ও কলকারখানায় কাজ করা শুরু করে দিল। আরব জমিদারদের থেকেও বেশি মজুরি তারা পেতে লাগল ইহুদিদের কাছে।

ক্ষেপে গেল আরব জমিদাররা। তারা ছক কষতে লাগল— ইহুদিদের ধ্বংস করার ছক। ব্রিটিশরা সব দেখে-বুঝেও চুপই রইল। কারণ তারা কোনো পক্ষকেই ঘাঁটাতে চাইছিল না। আরব ও ইহুদিদের বিবাদ মেটানোর চেয়ে সাম্রাজ্য রক্ষা করাটাই ছিল তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আরবরা ইহুদিদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। আরব-আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ইহুদিরা গড়ে তুলল এক সশস্ত্র বাহিনী 'হেগানা'। আর এই হেগানাই পরবর্তীতে পরিণত হল ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফ-এ।

জার্মানিতে হিটলার ক্ষমতায় আসার পর সেখানে ইহুদিদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়। জার্মান ইহুদিরা দলে দলে প্যালেস্টাইনে আসতে থাকে। ১৯৩৬ সাল নাগাদ প্যালেস্টাইনে কেবল জার্মান ইহুদির সংখ্যাই ছিল প্রায় ৬০ হাজার। বিজ্ঞানী, কেমিস্ট, রিসার্চার— সবাই প্যালেস্টাইনে আসতে লাগল আশ্রয়ের খোঁজে। আর এদের আগমনের ফলে প্যালেস্টাইনে শিক্ষা, অর্থব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হল। ব্রিটিশ শাসনে থেকেও এই ইহুদিরা গড়ে তুললেন প্রায় এক স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল।

আরবরা কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছিল যে ইহুদিরা কোন পথে এগোচ্ছে। তারাও স্থির করে যে ইহুদিদের ধ্বংস করতে হবে এবং তা করতে হবে অতি শীঘ্রই। আরবরা নাৎসিদের সঙ্গে একটা গোপন আঁতাত তৈরি করল। জার্মানির অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়ে তারা জার্মানি ও ব্রিটেনের মধ্যে ভবিষ্যতের সংঘর্ষে জার্মানিকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে

দিল। আর ওদিকে ব্রিটিশরা চুপচাপ নজর রাখছিল। তারা চাইছিল আরব ও ইহুদিরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরুক, আর কায়েম হোক একচ্ছত্র ইংরেজ আধিপত্য। কিন্তু বাস্তব যে গল্পের চেয়েও বর্ণাঢ্য হয়। তা-ই হল।

১৯৩৬ সালেই আরবরা নাৎসি বাহিনীর সরবরাহ করা অস্ত্র নিয়ে ইহুদিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শহরে, গ্রামে, রাস্তায় ইহুদিদের সঙ্গে শুরু হল আরবদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। হেগানার অতি রক্ষণাত্মক নীতির বিরোধিতা করে জবোটিনস্কি গড়ে তুললেন 'ইরগুন', যার আক্রমণের নিশানায় ছিল আরব ও ব্রিটিশরা। আরবদের লক্ষ্য ছিল প্যালেস্টাইনে ইহুদি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা এবং সমস্ত শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখা। তারা চাইছিল ইহুদিরা কেবল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবেই প্যালেস্টাইনে থাকুক। আর ইহুদিদের লক্ষ্য ছিল প্যালেস্টাইনে ইহুদি-অনুপ্রবেশ চালিয়ে যাওয়া। যখন নাৎসিদের অত্যাচারে ইহুদিরা জার্মানি থেকে পালাচ্ছিল, তখন বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশ ইহুদিদের জন্য দরজা বন্ধ করে দেয়। তাঁদের একমাত্র ভরসা তখন প্যালেস্টাইন।

হিংসাত্মক ঘটনা যখন মাত্রা ছাড়াতে শুরু করল, তখন ব্রিটিশরা ছয় সদস্যের একটা দল গঠন করে এবং রিপোর্ট দেওয়ার আদেশ দেয়। তার নাম ছিল 'পিল কমিশন'। পিল কমিশনের সদস্যরা সব বিচার করে প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করে আলাদা আরব ও ইহুদি-রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে মত দিয়ে তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। এমনটা যে ঘটতে পারে তা ব্রিটিশরা ভাবেইনি। ইহুদিরা সন্দিগ্ধ মনে এই প্রস্তাব মেনে নিলেও আরবরা তা প্রত্যাখ্যান করল।

প্যালেস্টাইনের পার্টিশন আটকানোর জন্য এবার ব্রিটিশরা একটা নতুন উপায় বের করে। তারা ১৯৩৯ সালে একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করল, যাতে আরবরা নিমরাজি হয়। কিন্তু ইহুদিরা তা প্রত্যাখ্যান করে দিল। এই প্রস্তাবে ইহুদি-অনুপ্রবেশ বছরে পনেরো হাজার করে পাঁচ বছর পর্যন্ত চালু রাখার কথা বলা হয় এবং পাঁচ বছর পর তা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলা হয়।

শ্বেতপত্র প্রকাশিত হতেই ইহুদিরা বলল, 'মানছি না, মানব না!' অতিসক্রিয় হয়ে উঠল ইরগুনের সদস্যরা। ব্রিটিশদের ওপর হামলা চালাতে লাগল ইরগুন বাহিনী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলে এল। তখন ব্রিটিশদের প্রচুর সৈন্যের প্রয়োজন। প্রায় ১.৩ লক্ষ ইহুদি ব্রিটিশ সেনাদলে নাম লেখানোর জন্য আবেদন করল। ব্রিটিশরা এত বেশি সংখ্যক ইহুদির হাতে অস্ত্র তুলে দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু কী আর করা যাবে? তাদের যে তখন সৈন্যেরও প্রয়োজন। তাই তারা আবেদন করা প্রার্থীদের মধ্যে থেকে ৩০ হাজার জনকে বেছে নিল। পরে এই ইহুদি সৈন্যদের সাহসিকতার জন্য ব্রিটিশরা তাদের প্রশংসা করতেও বাধ্য হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লড়াই ইহুদিদের জন্য কেবল নাৎসিদের খতম করার লড়াই ছিল না, এই যুদ্ধের মাধ্যমে তারা নিজেদের তৈরি করছিল, যাতে ইহুদি- রাষ্ট্রের জন্যও তারা লড়তে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইহুদিরা আশা করেছিল যে, এবার হয়তো ব্রিটিশরা ইহুদি-রাষ্ট্র স্থাপন করার জন্য কোনো সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কিন্তু তাদের কপাল পোড়া! ব্রিটিশরা তাদের শ্বেতপত্রের ঘোষণা করা নীতি থেকে এক চুলও সরতে রাজি হল না।

১৯৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হ্যারি এস. ট্রুম্যান ১ লক্ষ ইহুদিকে জার্মানি থেকে সরিয়ে প্যালেস্টাইনে পাঠানোর প্রস্তাব দেন। কিন্তু ব্রিটেন সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেয়। এই ঘটনা ইহুদিদের আরও ক্ষিপ্ত করে তোলে। ইরগুনের সদস্যরা নাশকতার প্রস্তুতি শুরু

করে। তারা কিং ডেভিড হোটেলে বম্ব চার্জ করল। ব্রিটিশ আধিকারিক ও ব্রিটিশ নাগরিক মিলে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়াল দেড়শো।

সব ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া থাকে। মিললও। ব্রিটিশরা সমস্ত ইহুদি দোকানগুলোকে বয়কট করার আদেশ দিল। এই ঘটনায় ইহুদিদের ব্রিটিশ-বিদ্বেষ আরও তীব্র হল এবং বাড়ল ইহুদি ঐক্য।

ব্রিটিশরা ইহুদিদের আটকানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। কেউ কোনো ইহুদি অনুপ্রবেশকারীকে সাহায্য করলেই তাকে জরিমানা করতে লাগল তারা। এসব সত্ত্বেও ১.১৩ লক্ষ ইহুদি সেই সময় প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করে। ব্রিটিশরা ইহুদিদের অস্ত্র বাজেয়াপ্ত শুরু করতে লাগল, গ্রেফতার করতে আরম্ভ করল অনেককে। বহু ইহুদি নেতাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হল। এর ফলে ইহুদি জনতা উন্মত্ত হয়ে উঠল। প্রত্যেক ইহুদির ফাঁসির বদলা হিসাবে ইরগুন একজন করে ব্রিটিশ আধিকারিককে ফাঁসিতে ঝোলানো শুরু করে। গোটা প্যালেস্টাইন জুড়ে এই হত্যালীলা চলতে থাকে।

১৯৪৭ সালে তিতিবিরক্ত ব্রিটেন প্যালস্টাইনের ভাগ্য ইউনাইটেড নেশনের হাতে ছেড়ে দেয়। ইউনাইটেড নেশন প্যালেস্টাইনে একটা প্রতিনিধি দল পাঠায়। এই প্রতিনিধি দল যে রিপোর্ট দেয় তা ছিল অনেকটা পিল কমিশনের রিপোর্টের মতোই। এই কমিশন বলে যে, ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্যালেস্টাইনকে ভাগ করে আলাদা আরব ও ইহুদি-রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর ইউনাইটেড নেশনের জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে ভোটাভুটি হয়। পার্টিশনের পক্ষে ৩৩ টি ও বিপক্ষে ১৩ টি ভোট পড়ে। ইহুদিরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও আরবরা তা প্রত্যাখ্যান করে দিল।

এবার আর কোনো বাধা রইল না স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ইসরায়েলের আত্মপ্রকাশ করার। ইসরায়েল— ইহুদিদের পুণ্যভূমি, প্রমিসড ল্যান্ড!

আরবরা ইহুদি-অধ্যুষিত এলাকা থেকে পালাতে শুরু করে। আরব উদ্বাস্তু সমস্যার শুরু এখান থেকেই।

তেল আভিভ মিউজিয়ামে ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে বিকেল চারটের সময় বেন-গুরিয়ন সরকারিভাবে ইসরায়েলের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। ইসরায়েলকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রথম স্বীকৃতি দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তারপর রাশিয়া, পোল্যান্ড চেকোস্লাভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া থেকে আসে স্বীকৃতি।

স্বাধীনতা ঘোষণার পর বেন-গুরিয়ন আরব দেশগুলোর প্রতি একটি আবেদন করেন। তিনি আরব দেশগুলোকে এই নবজাত ইহুদি-রাষ্ট্রকে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর কথা বলেন। সহযোগিতা তো দূর, মিশর একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানায় যে, তারা ইসরায়েল আক্রমণ করবে এবং পৃথিবীর বুক থেকে এর অস্তিত্ব মুছে দেবে! জর্ডন, লেবানন ও সিরিয়া মিশরের সঙ্গে যোগ দিল।

একটা দেশ জন্মলগ্নেই সম্মুখীন হল এক বিরাট চ্যালেঞ্জের!

তারপর কী হল?

সে আরেক গল্প। যুদ্ধের গল্প। সেই গল্পও আমরা পরে শুনব।

গোড়ার কথা

সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ সাল।

ভোর হওয়ার ঠিক পূর্ব-মুহূর্ত। বিশ্বের সবথেকে পবিত্র দেওয়ালের সামনে ইহুদিরা সমবেত হয়েছে। পাহাড়কাটা, হলদেটে চুনাপাথরের এই দীর্ঘ দেওয়ালটাই ইহুদিদের রাজা হেরড নির্মিত জেরুসালেমের দ্বিতীয় মন্দিরের একমাত্র অবশিষ্ট ধ্বংসাবশেষ। হিব্রুতে দেওয়ালকে বলে 'কোটেল'। এই কোটেল এক সময়ে ছিল রাজা হেরডের তৈরি মন্দিরের বেষ্টনী। আবার রাজা হেরডের দ্বারা নির্মিত মন্দিরটা কিন্তু আদি মন্দির নয়, সেটা কিং সোলোমানের তৈরি মন্দিরের সংস্কারকৃত রূপ। বয়স্ক, তরুণ, রোগা, মোটা, দাড়িওয়ালা ও দাড়িবিহীন — সব ধরনের মানুষ জেরুসালেমের গলিপথ ধরে এই দেওয়ালের কাছে পৌঁছেছিল।

তরুণেরা অফিসের করণিক আর জেরুসালেমের বাইরের পাহাড়ি এলাকা থেকে আসা মেষপালকদের সঙ্গে সগর্বে পায়ে পা মিলিয়ে চলেছিল। শহরের ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা হাইফা, তেল আভিভ এবং গ্যালিলি সাগরের আশেপাশের গ্রাম থেকে আসা দোকানিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছিল।

তাদের প্রত্যেকের পোশাক ছিল কালো এবং হাতে ছিল প্রার্থনার বই। সবাই দাঁড়িয়ে ছিল সুউচ্চ দেওয়ালটার সামনে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই বিশেষ দিনটির উদযাপনের পরম্পরা চলে আসছে। কিন্তু এবারে, মানে সেপ্টেম্বর মাসের শুক্রবারের 'শাপাথ' ছিল অন্য বারের তুলনায় আলাদা। ইহুদি ধর্মগুরুরা সবাইকে আহ্বান করেছিলেন এই প্রার্থনাতে সামিল হওয়ার জন্য। বলা হয়েছিল যে, ইহুদিদের ঐক্য ও দৃঢ়তা গোটা বিশ্বকে দেখিয়ে দেওয়ার সময় এসে গেছে। আরবরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ইহুদিরা যে তাদের ভয়ে ভীত নয়— এটা বোঝানোর জন্য এবং জায়নিজমের প্রতি তারা কতখানি দায়বদ্ধ, সেটা প্রকাশ করার জন্যই ছিল এই প্রার্থনা।

কিন্তু কী ছিল এই জমায়েতের প্রেক্ষাপট?

জায়নিজমের প্রসারের বিরুদ্ধে আরবদের ক্ষোভ ক্রমশ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, আর এই খবর বিগত কয়েক মাস ধরে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯১৭ সালের বেলফোর ডিক্লেয়ারেশনের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনের মধ্যে একটি আলাদা ইহুদি-রাষ্ট্র গঠন করার কথা বলা হয়। ইহুদিদের প্রতি আরবদের ক্ষোভের সূত্রপাত সেখান থেকেই। যে জমিতে তারা তাদের নবি, মহম্মদের সময় থেকে বাস করে আসছিল, সেই জমি তারা ইহুদিদের ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না।

কিন্তু প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ শাসন চলছিল এবং ব্রিটিশরা কোনো পক্ষকেই ঘাঁটাতে চাইছিল না। তারা দু' পক্ষকেই তুষ্ট রাখতে চাইছিল। আর এতেই সমস্যা বাড়ছিল। আরব ও ইহুদিদের মধ্যে সংঘাত ক্রমশ বেড়েই চলল। যেখানেই ইহুদিরা উপাসনার জন্য সিনাগগ বানাতে চাইল, সেখানেই দাঙ্গা আর খুনোখুনি শুরু হল। কিন্তু ইহুদিরাও ছাড়বার পাত্র নয়। তারাও জেরুসালেমের ওয়েস্টার্ন ওয়ালের সামনে প্রার্থনা করার অধিকার প্রয়োগ করতে বদ্ধপরিকর। ইহুদিরা এই দেওয়ালটাকে কিং সোলোমানের পবিত্র মন্দিরের অংশ বলেই গণ্য করে। এখানেই নাকি বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হত। ইতিহাস বলছে, আজ যেখানে ১,৬০০ ফুটের দীর্ঘ দেওয়াল, এক সময়ে

সেখানেই ছিল ৪,০০০ ফুটের সুদীর্ঘ প্রাচীর। রোমান আক্রমণে তা বিধ্বস্ত হয়। তারপর জেরুসালেমের ওল্ড সিটিকে ঘিরে এই পাঁচিলকে কত বার যে ভাঙা এবং গড়া হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু ইহুদি আস্থায় অটুট রয়ে গেছে এই দেওয়াল।

দুপুরবেলা: শেমা প্রেয়ারের সময় ওয়েস্টার্ন ওয়ালের সামনে হাজার হাজার কণ্ঠে প্রার্থনার ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছিল। সমবেত ছন্দের ওঠানামায় তৈরি হয়েছিল এক অনির্বচনীয় পরিবেশ।

আর ঠিক তখনই সমবেত জনতার ওপর ভাঙা বোতল, পাথরভর্তি টিন এসব এসে পড়তে লাগল। আরবরা দেয়ালের আশেপাশে সুবিধাজনক অবস্থান থেকে আক্রমণ চালাচ্ছিল। মুসলিম বন্দুকবাজরা গাদা বন্দুক থেকে গুলি ছুড়ছিল সমানে। ভয়ার্ত ইহুদিরা প্রাণ বাঁচাতে ছুটতে শুরু করে দিল। আশ্চর্যজনকভাবে সেদিন কারও প্রাণহানি হয়নি, যদিও আহতের সংখ্যাটা কম ছিল না।

সেই রাতেই য়িশুভের নেতারা একটি সভা ডাকলেন।

'য়িশুভ' কী জিনিস?

ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্মের আগে জেরুসালেমের পুণ্যভূমিতে বসবাসকারী ইহুদিদের সমিতিকেই 'য়িশুভ' বলা হত।

তা কী বললেন য়িশুভের নেতৃবৃন্দ?

একজন নেতা বললেন, 'আরব-আক্রমণের দিকটা কেউ ভেবে দেখেনি। ভাই সব, আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না। রাজা ডেভিডের সময় থেকেই আমরা গুপ্তচরবৃত্তিকে গুরুত্ব দিয়ে আসছি।'

এই দিনই, হ্যাঁ এই দিনই বিশ্বের সবথেকে দুর্ধর্ষ গুপ্তচর সংস্থা মোসাদ-এর বীজ উপ্ত হয়েছিল। আর তার প্রথম ধাপ ছিল অর্থ জোগাড় করা। কারণ এই অর্থই পরে ব্যবহার করা হবে আরবদের ঘুষ দেওয়ার জন্য— যারা টাকার বিনিময়ে আরবদের আক্রমণের আগাম খবর দেবে।

এদিকে ইহুদিরা ওয়েস্টার্ন ওয়ালের সামনে প্রার্থনা চালিয়ে যেতে থাকল। এই কাজটা তারা হাজার হাজার বছর ধরে করে আসছে। লম্বা কাতারে মানুষ ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর দেওয়াল স্পর্শ করে কাঁদে। কান্নার লাইনে একজনের পালা শেষ হলে পরের জন সুযোগ পায়। ডুকরে কাঁদে, ফুঁপিয়ে কাঁদে। কান্না শেষ করে নিজের পাতলুন কিংবা ঢোলা জামার পকেট থেকে এক খণ্ড কাগজ বের করে ভরে দেয় দেওয়ালের খাঁজে।

কী থাকে তাতে?

ইচ্ছে। ওগুলো ইচ্ছে-লেখা কাগজ।

কাঁদতে কাঁদতে ছুঁয়ে থাকা দেওয়ালটার নাম তাই ওয়েলিং ওয়াল। কথায় বলে না, দেওয়ালেরও কান আছে? এই প্রবাদের উৎপত্তি এখান থেকেই।

যাইহোক, ইহুদিরা তাদের সুরক্ষার জন্য আর ব্রিটিশদের ভরসায় বসে রইল না। তারা তৈরি করল তাদের নিজস্ব সামরিক বাহিনী— 'হেগানা'। পরের ক' মাসে আগাম সতর্কবার্তা

পাওয়ার ফলে এবং হেগানার মাধ্যমে ইহুদিরা বেশ কয়েকটি আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হল। পরবর্তী পাঁচ বছরে সংঘর্ষ অনেকটাই কমে এল। ইহুদিরা আগে থেকেই আক্রমণের খবর পেয়ে যাচ্ছিল যে!

এদিকে ইহুদিরা অত্যন্ত গোপনে নিজেদের চরবৃত্তি বাড়িয়ে চলেছিল। প্রথম দিকে তাদের এই গুপ্তচর বাহিনীর কিন্তু কোনো নাম ছিল না, ছিল না কোনো নির্দিষ্ট নেতাও। এক একজন আরবকে বেছে বেছে নির্দিষ্ট কাজের জন্য ব্যবহার করা হত। জেরুসালেমের আরব-অধ্যুষিত এলাকায় বসবাসকারী ফেরিওয়ালা, জুতো পালিশের লোকদের মাসিক বেতনের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হল। কখনো কখনো ছাত্র, শিক্ষক এবং ব্যবসায়ীদেরও এই কাজে লাগানো হতে থাকল। ধীরে ধীরে এর সুফলও পেল ইহুদিরা। আরবদের গতিবিধির খবর ছাড়াও ইংরেজদের মতিগতির খবরও তারা পাচ্ছিল।

১৯৩৩ সালে হিটলার জার্মানিতে ক্ষমতায় আসার পর জার্মান ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে পালিয়ে আসতে শুরু করে। ১৯৩৬ সালের মধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ ইহুদি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে পালিয়ে আসে। তাদের অধিকাংশই সর্বস্বান্ত অবস্থায় জেরুসালেমের পবিত্র ভূমিতে পৌঁছায়। য়িশুভ এদের জন্য কোনো রকমে খাবার ও থাকার জায়গার বন্দোবস্ত করেছিল। কয়েক মাসের মধ্যে ইহুদিদের জনসংখ্যা প্যালেস্টাইনের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশে পরিণত হল। আরবরাও কিন্তু ওদিকে চুপচাপ বসে রইল না। শত শত মসজিদের উঁচু মিনার থেকে কট্টর মুসলমানদের ক্রুদ্ধ চিৎকার ভেসে আসতে থাকল—ইহুদিরা ফেরত যাও, ইহুদিরা ফেরত যাও!

যে জমিগুলো ইহুদিরা আরবদের কাছ থেকে আইনানুগভাবে কিনে নিয়েছিল, সেই জমি আরবরা আবার জবরদখল করতে শুরু করে দেয়, আর এই কাজে ইংরেজরা আরবদের প্রচ্ছন্নভাবে প্ররোচিত করতে থাকে।

ব্রিটিশরা দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হলেও সেই প্রয়াস বিফলে গেল। আরবরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। শুরু হল ব্রিটিশ ও ইহুদিদের সঙ্গে আরবদের লড়াই। ব্রিটিশরা শক্ত হাতে সেই বিদ্রোহ দমন করল। তবে ব্রিটিশরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে, আরবরা আবার শক্তি সঞ্চয় করে আঘাত হানবে।

এদিকে ইহুদি যুবকরা দলে দলে হেগানাতে যোগ দিতে লাগল। ধীরে ধীরে তারা এক গোপন দুর্ধর্ষ বাহিনীর অঙ্গ হয়ে উঠল। তারা ছিল শারীরিকভাবে অসম্ভব সক্ষম আর ইসরায়েলের নেগেভ মরুভূমির শেয়ালের মতো ধূর্ত। আরব চরদের জাল তত দিনে আরও ছড়িয়ে পড়েছিল। হেগানার পক্ষ থেকে একটি রাজনৈতিক বিভাগ খোলা হল, যার কাজ হল নানারকম গুজব ও প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে আরবদের মধ্যে অশান্তি ছড়ানো।

হিব্রুতে ‘হেগানা’ শব্দের অর্থ হল ‘প্রতিরক্ষা’। হেগানা কিন্তু প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠেছিল পবিত্র ভূমির শ্রেষ্ঠ প্রতিরক্ষা শক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে অনেকেরই গুপ্তচর হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল। এরাই পরবর্তীতে ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স সংস্থার কিংবদন্তি ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্যালেস্টাইনে এক নতুন অস্বস্তিকর পরিবেশের জন্ম দেয়। নাৎসিরা যুদ্ধে জয়ী হলে তাদের কপালে কী ঘটবে সেটা ভেবে ইহুদি ও আরব দু’ পক্ষই বিশেষ চিন্তিত ছিল। আসলে ইউরোপের ডেথ ক্যাম্পের ঘটনাগুলোর খবর সেখানেও এসে পৌঁছেছিল যে।

১৯৪২ সাল। হাইফা শহরে একটা গুরুত্বপূর্ণ সভা ডাকা হল। সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন ডেভিড বেন গুরিয়ন ও য়িত্জাক রাবিন। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, হলোকাস্টে বেঁচে যাওয়া ইহুদিদের ইসরায়েলের পবিত্র ভূমিতে ফিরিয়ে আনা হবে। এভাবে বেঁচে যাওয়া ইহুদিদের সংখ্যা সম্পর্কে কারো কোনো ধারণা তখন ছিল না। তবে এটা পরিষ্কার ছিল যে, এর ফলে আরবদের সঙ্গে সংঘাত একটা নতুন মাত্রা নেবে। হয়তো ব্রিটিশরাও তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। ব্রিটিশদের যুক্তি ছিল— এর ফলে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হবে।

বেন-গুরিয়ন হেগানার চরবৃত্তির ক্ষমতা আরও বাড়াবার প্রস্তাব দিলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে সেই প্রস্তাব গৃহীত হল। একটি কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ইউনিট গঠন করা হল, যার কাজ ছিল যে সমস্ত ইহুদিদের সঙ্গে ব্রিটিশদের দহরম মহরম আছে, তাদের ওপর নজর রাখা। এই ইউনিটের নাম রাখা হল 'রেকুল হেজদি'। রেকুল হেজদি ইউনিটের প্রধান হলেন একজন ফ্রেঞ্চ ফরেন লিজিনেয়ার। সাধারণ মানুষের চোখে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ ট্রাভেলিং সেলসম্যান।

অনেক ইহুদি মহিলা ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশা করত। তাদের দিকে নজর রাখতে আরম্ভ করলেন লিজিনেয়ার। যেসব দোকানদাররা ইংরেজদের মালপত্র সরবরাহ করত এবং এবং যে সমস্ত কাফেতে ইংরেজদের ওঠা-বসা ছিল, তাদের মালিকদের ওপর নজরদারি শুরু হল।

সন্দেহভাজনদের ধরে মাঝরাতে হেগানার সামনে কোর্ট-মার্শালের জন্য আনা হত। দোষীদের শাস্তি হিসাবে হয় নির্দয়ভাবে প্রহার করা হত নয়তো জুডিয়েন পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে মাথার পিছনে গুলি করে হত্যা করে দিত হেগানার সদস্যরা। আজকের মোসাদ যেভাবে ইসরায়েলের শত্রুকে সরিয়ে দেয়, সেই নৃশংসতার প্রাথমিক পরিচয় এখান থেকেই মেলে।

১৯৪৫ সালে হেগানার একটি ইউনিটকে অস্ত্র সংগ্রহ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু বললেই তো আর অস্ত্র জোগাড় হয় না রে বাবা!

কিন্তু অস্ত্র এল।

কীভাবে?

উত্তর আফ্রিকাতে মিত্রশক্তির সামনে পরাস্ত হল হিটলারের প্রতিনিধি রোমেল। অনেক জার্মান অস্ত্র আটক করল মিত্রশক্তি। এই মিত্রবাহিনীতে ইহুদি সৈন্যরাও ছিল। তারা সেই অস্ত্রশস্ত্র মিশরের সিনাই মরুভূমির ভেতর দিয়ে প্যালেস্টাইনে পাচার করল। অস্ত্রগুলো লঝঝরে ট্রাকে চাপিয়ে আর উটের পিঠে বোঝাই করে জনহীন মরুভূমির গুহায় এনে রাখা হয়েছিল।

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে জাপান আত্মসমর্পণ করার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। মিত্রশক্তিতে ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে কাজ করা ইহুদিরা হেগানাতে যোগ দিতে শুরু করল দলে দলে। এভাবেই বেন-গুরিয়নের স্বপ্ন ধীরে ধীরে সাকার হতে শুরু করে। ইসরায়েলের স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল।

হলোকাস্ট সারভাইভারদের ইউরোপ থেকে আনা শুরু করে দিল প্যালেস্টাইনের মাটিতে থাকা ইহুদিরা। এই অপারেশনের হিব্রু নাম দেওয়া হল 'ব্রিচা'। প্রথমে শ'য়ে শ'য়ে ও পরে হাজারে হাজারে মানুষ আসতে থাকল। তাদের অনেকেরই পরনে ছিল

কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের পোশাক। প্রত্যেকের শরীরে ছিল নাৎসি ট্যাটু, যাতে শনাক্তকরণ সংখ্যা লেখা থাকত। তারা সড়কপথে বা রেলপথে বাল্কান পেরিয়ে এবং তারপর ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে ইসরায়েলের সৈকতে এসে নামছিল। ইহুদি রিলিফ এজেন্সিগুলো জাহাজ, স্টিমার, নৌকো এই সমস্ত মাধ্যমের সাহায্যেই উদ্ধারকাজ চালাচ্ছিল। এই জাহাজ ও বোটগুলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে চড়া দামে কিনতে হয়েছিল; কিছু অবশ্য ভাড়াতেও নেওয়া হয়েছিল। ১৯৪০ সালে ডানকার্ক ইভ্যাকুয়েশনের পর এটাই ছিল এত বড় মাপের ইভ্যাকুয়েশন।

হাইফা ও তেল আভিভের মাঝের সৈকতে অপেক্ষা করছিল ব্রিটিশ সৈন্যরা যাদের মধ্যে ডানকার্ক থেকে লন্ডনে পাঠানো কিছু সৈন্যও ছিল। তাদের নির্দেশ দেওয়া ছিল যেন হলোকাস্ট সারভাইভাররা কোনোভাবেই সেখানে নামতে না পারে। কিন্তু তারা নামল। শুরু হল বিশ্রী ধ্বস্তাধ্বস্তি। কিন্তু একটা সময়ে সম্ভবত ব্রিটিশদের মনে পড়ে গেল নিজেদের ইতিহাস— ডানকার্কের কথা— তারা পথ ছেড়ে দিল।

এদিকে বেন-গুরিয়ন দেখলেন যে, কেবল কারো দয়ার ওপর নির্ভর করে স্বাধীন ইহুদি-রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয় এবং তাঁর এই ভাবনাকে সশক্ত করার জন্য ব্রিটিশ ও আরবদের বিরুদ্ধে গেরিলা আক্রমণ শুরু করে দিল ইহুদিরা।

প্রত্যেক ইহুদি কমান্ডার এই কথা জানত যে, প্রতিটা অপারেশনই অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার ছিল খুবই সীমিত। ভুল পদক্ষেপ মানে মৃত্যু। ব্যর্থতা মানে মৃত্যু। দু' পক্ষই এক ভয়ানক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল। হেগানার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে ইহুদিদের গুলি করে মারা হচ্ছিল। এদিকে ব্রিটিশ সৈন্যরাও মারা পড়ছিল ইহুদিদের হাতে। তাদের সেনানিবাসগুলো বোমা মেরে উড়িয়ে দিচ্ছিল হেগানার অপারেটিভরা। আরবদের গ্রামগুলোকে তছনছ করে দিতে লাগল হেগানা। মধ্যযুগীয় বর্বরতা যেন আবার ফিরে আসছিল মধ্যপ্রাচ্যে।

এবার হেগানা একটা অসাধারণ চাল চালল। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ফেসবুকের ফেক নিউজ তো রোজ পড়েন, অনেকে খবর যাচাই না করেই ফরোয়ার্ড করে বেকুবও বনে যান। ঠিক এই কৌশল নিয়েই ইহুদিরা ভুয়ো খবর ছড়াতে লাগল।

গুজবে কী বলা হল?

ইহুদিদের সামরিক শক্তি নাকি ব্রিটিশ ও আরবদের তুলনায় অনেক বেশি।

ব্রিটিশ সৈন্যরা শত্রুর ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তাদের মনোবল ভাঙতে লাগল। হেগানা ঠিক এটাই তো চেয়েছিল।

১৯৪৬ সালের বসন্তকাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে ব্রিটেনের কাছে অনুরোধ এল ১ লক্ষ হলোকাস্ট সারভাইভরকে প্যালেস্টাইনে জায়গা করে দিতে হবে। তাদের এই অনুরোধ ব্রিটেন নাকচ করে দিল। আর এসব ডামাডোলের মধ্যেই ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটেন প্যালেস্টাইন অধিকার ছেড়ে দেবে বলে জানায়। সিদ্ধান্ত হল যে, ১৯৪৮ সালের মে মাস নাগাদ তারা প্যালেস্টাইন ত্যাগ করবে। আর এরপর প্যালেস্টাইন সমস্যার দেখভাল করবে ইউনাইটেড নেশনস।

অবশেষে ইসরায়েল স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করল। বেন-গুরিয়ন আর তার কমান্ডাররা জানতেন আরবদের সঙ্গে চলা দীর্ঘকালীন সংঘর্ষের একটা হেস্তনেস্ত করা খুব

জরুরি বিষয়। তা নাহলে ইসরায়েল নামে আলাদা দেশের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই মুশকিল হবে। আরবদের সামরিক কার্যকলাপের গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য সংগ্রহ করা হতে থাকল।

স্বাধীনতার কয়েক মাস পরেই কায়রো আর আম্মান থেকে ইহুদি গুপ্তচরেরা খবর পাঠাল— মিশর ও জর্ডনের সেনাবাহিনী ইসরায়েল আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আরব দেশগুলি সম্মিলিতভাবে ইসরায়েলকে আক্রমণ করল। ইসরায়েলের অস্তিত্ব তখন বিপন্ন। তারা জানত যুদ্ধে পরাজয় মানে ইহুদিরা পৃথিবী থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সব প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে যুদ্ধে জয়ী হল ইসরায়েল। সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে ইসরায়েলের পুনর্জন্ম হল বলতে পারেন।

বেন-গুরিয়ন ছিলেন ইসরায়েলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তিনি পাঁচটি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস তৈরি করলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তারা দেশে এবং দেশের বাইরে অপারেট করতে শুরু করে দিল। দেশের বাইরের চরেরা ব্রিটেন, ফ্রান্স ও

যুক্তরাষ্ট্রের সুরক্ষা এজেন্সিগুলোর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করল। সব কিছু পরিকল্পনামতোই এগোচ্ছিল। বেন-গুরিয়ন চেয়েছিলেন একটা পরিপূর্ণ ইন্টেলিজেন্স সংস্থা জন্ম নিক, আর সেই স্বপ্নই মূর্ত রূপ ধারণ করছিল। কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন সুখ কোনো মানুষেরই সহ্য হয় না। বাধ সাধল তার নিজের দেশের লোকেরাই। ক্ষমতার লোভ বড় বালাই, আর তখন নেতা, মন্ত্রী ও আধিকারিকদের পেয়ে বসেছিল ক্ষমতার লোভেই। ফলে যা হওয়ার তা-ই হল – কলহ।

ইন্টেলিজেন্স স্ট্র্যাটেজির নেতৃত্ব কে দেবে?

কে তথ্য বিশ্লেষণ করবে?

কে গুপ্তচর নিয়োগ করবে?

রিপোর্ট প্রথমে কার হাতে যাবে?

রাজনৈতিক নেতাদের কাছে কে সমস্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করবে?

বলা বাহুল্য, এসব প্রশ্নের উত্তর কারো কাছে ছিল না।

দেশের বাইরে অপারেট করার দায়িত্ব কার হাতে থাকবে তা নিয়ে বিদেশ মন্ত্রক ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মধ্যে শুরু হল টানাপোড়েন। ওদিকে আরব সন্ত্রাসবাদীদের হাতে রোজ লোক মরছিল। সিরিয়া, মিশর, জর্ডন ও লেবাননের সেনাদল তখনও ইসরায়েলের কাছে বিপজ্জনক। তার ওপরে আবার লক্ষ লক্ষ মৌলবাদী আরব জেহাদের জন্য তৈরি হচ্ছিল। জন্মলগ্ন থেকেই এমন শত্রু- পরিবেষ্টিত দেশ হয়তো পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। আছে কি? আপনারাই বলুন না সুধী পাঠক!

বেন-গুরিয়নকে লোকে মসীহার মতো শ্রদ্ধা করত। ইহুদিরা বিশ্বাস করত যে, মোজেসের মতো বেন-গুরিয়নও বিপদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবেন। আর বেন-গুরিয়ন জানতেন যে, তিনি কোনো মসীহা নন

সর্বহারা এক জাতির সামান্য এক প্রতিনিধি, যে আরব-শত্রুর হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। এই আরব-শত্রুরা ছিল ইহুদিদের তুলনায় সংখ্যায় প্রায় কুড়ি গুণ। মেষপালক বালক ডেভিডের কথা মনে আছে? ডেভিড আর গোলিয়াথের গল্পের ডেভিডের

কথা বলছি বন্ধুরা। মনে পড়ছে সে কীভাবে দানব গোলিয়াথকে পরাজিত করে বধ করেছিল। অগুনতি আরবদের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় ইহুদিদের জয় আসলে ডেভিড-গোলিয়াথের লড়াইতে ডেভিডের জয়লাভের মতোই একটা মিরাকল, একটি অভাবনীয় ঘটনা।

এদিকে আরবরা নতুন নতুন উপায়ে ইহুদিদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছিল। তারা রাতের বেলায় চোরের মতো হানা দিত। নির্দয়ভাবে ইহুদিদের হত্যা করার পর অন্ধকারে গা-ঢাকা দিত আরব আততায়ীর দল।

২ মার্চ, ১৯৫১। পাঁচটি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির প্রধানদের ডাকা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে। বেন গুরিয়ন বিদেশে কাজ করার জন্য Ha Mossad le Teum নামে একটি নতুন এজেন্সির পরিকল্পনা সবার সামনে আনলেন। বললেন, বরাদ্দ হবে ২০ হাজার ইসরায়েলি পাউন্ড। তার মধ্যে ৫ হাজার পাউন্ড বিশেষ অপারেশনের জন্য সংরক্ষিত থাকবে; তবে সেই অর্থের ব্যবহারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নেওয়া হবে বাধ্যতামূলক। এই নতুন এজেন্সিতে পুরোনো এজেন্সিগুলো থেকেই লোক নির্বাচন করা হবে বলে ঠিক হল। প্রাত্যহিক ব্যবহারের সুবিধার জন্য নামটা ছোট করে ফেলা হল— জন্ম নিল মোসাদ।

মোসাদকে রাখা হল বিদেশ মন্ত্রকের আওতায়। অন্যান্য সব ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোতে মোসাদের একজন করে সিনিয়র অফিসারকে নিযুক্ত করা হল। তাদের কাজ ছিল ক্লায়েন্টের কী প্রয়োজন সেটা সম্পর্কে মোসাদকে অবহিত করা। যে কোনো মতানৈক্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হবে।

মোসাদের প্রথম চিফ হিসাবে নিয়োগ করা হল রিভেন শিলোয়াহকে। তিনি ১৯৫৩ সাল অবধি মোসাদের ডিরেক্টর পদে ছিলেন। বেন-গুরিয়নের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল— 'মোসাদ আমার অধীনে কাজ করবে, আমার নির্দেশ অনুযায়ী চলবে এবং আমাকেই রিপোর্ট করবে।' ইত্যবসরে ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শাপাথের সেই রাতের গোপন সভার পর ২৮ বছর কেটে গেছে। এতগুলো বছর পরে এমন একটা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি ইহুদিরা তৈরি করল, যা পরবর্তীতে হয়ে উঠল পৃথিবীর সবথেকে দুর্ধর্ষ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি।

মোসাদকে এবার ইরাকে গুপ্তচর চক্র সামলানোর ভার দেওয়া হল। এই কাজটা তার আগে অবধি করে এসেছিল ইসরায়েলি সুরক্ষা বাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগ।

কাজটা কী ছিল?

ইরাকি সেনার উচ্চ পদগুলি ব্যবহার করে গোপনে ইরাকি ইহুদিদের ইসরায়েলে নিয়ে আসা।

১৯৫১ সালের মে মাস। মোসাদের বয়স তখন মাত্র কয়েক সপ্তাহ। একটা খারাপ খবর এল ইরাক থেকে। দুজন মোসাদ এজেন্ট এবং মোসাদের হয়ে অর্থের বিনিময়ে খবর দেওয়ার কাজ করা বেশ কিছু ইরাকি ইহুদি ও আরবদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২৮ জনের বিরুদ্ধে চরবৃত্তির অভিযোগ আনল ইরাক। দুজন এজেন্টকেই মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনানো হল। ১৭ জনের আজীবন কারাবাসের সাজা হল। আর বাকিরা ছাড়া পেল। ইরাকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্যুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে মোটা অঙ্কের অর্থ দিয়ে মৃত্যুদণ্ডে সাজা শোনানো ওই দুই এজেন্টকে ইরাকের জেল থেকে ছাড়ানো হল।

এরপর আরেকটা দুঃসংবাদ এল এর পরপরই। থিওডোর গ্রস নামের এক এজেন্ট দীর্ঘ দিন ধরে রোমে ইসরায়েলের রাজনৈতিক বিভাগের হয়ে চরবৃত্তি করছিল। ১৯৫২

সালের জানুয়ারিতে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, গ্রস ইসরায়েলের সঙ্গে বেইমানি করছে। সে একজন ডাবল এজেন্ট। গ্রস মিশরের হয়েও চরবৃত্তি করছিল। আইজার হ্যারেল তখন শিন বেটের প্রধান। তিনি ছুটলেন রোমে। গ্রসকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ইসরায়েলে ফিরিয়ে আনলেন। তাকে বলা হয়েছিল যে, তাকে শিন বেটে একটি উচ্চ পদ দেওয়া হবে। আসলে তাকে আনা হয়েছিল শাস্তি দেওয়ার জন্য। পাকড়াও করে গোপনে তার বিচার শুরু হল। শাস্তি মিলল ১৫ বছরের জেল। জেলেই গ্রসের মৃত্যু হয়।

এসব ঘটনার ফলে শিলোয়াহ খুব মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি পদত্যাগও করে দিলেন। তাঁর জায়গায় এলেন হ্যারেল। টানা ১১ বছর তিনি মোসাদের চিফ ছিলেন, যেটা আজও রেকর্ড।

হ্যারেলকে দেখে কিন্তু মোসাদের প্রধান কার্যালয়ের কর্মীরা একদমই খুশি হয়নি। সাদামাটা চেহারা, উচ্চতা মাত্র ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি। হিব্রু উচ্চারণে ছিল ইউরোপীয় টান। হ্যারেলের পরিবার ১৯৩০ সালে লাটভিয়া থেকে প্যালেস্টাইনে আসে। ভদ্রলোকের জামাকাপড় দেখলে মনে হত যেন এখনই ঘুম থেকে উঠে এলেন। এ হেন মোসাদ চিফকে দেখে কার শ্রদ্ধা-ভক্তি হবে ভাই?

সবাইকে প্রথম সম্বোধনেই তিনি বললেন, ‘ইতিহাসের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা এগোব। একজোট হয়ে কাজ করব। আর হ্যাঁ, এখানে আমার কথাই হবে শেষ কথা!’

হ্যারেল যে নিজের কথায় আর কাজে এক তার প্রমাণ দিলেন পরদিনই। লাঞ্চের পর ড্রাইভারকে ডেকে পাঠালেন। ড্রাইভার বলল, ‘কোথায় যাব সার?’

‘বলা যাবে না,’ কাটা কাটা ভাবে বলে দিলেন হ্যারেল। তারপর তিনি নিজেই গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আর ফিরলেন এক বাক্স ব্যাগেল নিয়ে। পয়েন্ট ক্লিয়ারড। প্রশ্ন করবে একজনই— মিস্টার হ্যারেল! তিনি যা বলতেন, সেটা নিজেও করতেন। মোসাদকে পুনরুজ্জীবিত করে তুললেন হ্যারেল। এই মোসাদ চিফ নিজে গোপনে আরব দেশগুলোতে যেতেন মোসাদের নেটওয়ার্ক বাড়াবার জন্য। যারা মোসাদে যোগ দিতে চাইত, তাদের ইন্টারভিউ তিনিই নিতেন। যারা কিবুটজে বড় হয়েছে তাদেরকেই ফার্স্ট প্রেফারেন্স দিতে হ্যারেল বেশি পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁর এই পছন্দ আবার অনেকেরই অপছন্দ ছিল। একজন

সিনিয়র আধিকারিক তো হ্যারেলের এই পলিসি সম্পর্কে সরাসরি প্রশ্ন তুলে বসলেন। হ্যারেল তখন বললেন, ‘কিবুটজের লোকেরা আরবদের কাছাকাছি থাকে। তাই তারা আরব-শত্রুদের খুব ভালো ভাবে চেনে জানে। আর সে কারণেই আমি ওদের প্রেফার করি।’

হ্যারেলের কথা বলছি, আগে একটু ‘কিবুটজ’ ব্যাপারটাকে বুঝে নেওয়া যাক। হিব্রুর ভাষায় ‘কিবুজ্’ শব্দের অর্থ ‘কম্যুনাল সেটলমেন্ট’। এ হল এমন এক সংস্থা বা সমাজব্যবস্থা, যার উদ্দেশ্য একটি নির্দিষ্ট জাতির মানুষকে সংগঠিত করে একসঙ্গে চাষবাস করা তথা কলকারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি চালানো। যখন ইহুদিরা বিভিন্ন দেশ থেকে প্যালেস্টাইনে আসতে শুরু করে, তখন প্যালেস্টাইনের বেশিরভাগটাই ছিল অনুর্বর মরুভূমি। বেঁচে থাকার তাগিদেই তারা একজোট হয়ে কাজে নেমেছিল।

প্রতিটি কিবুটজে তারা গড়ে তুলেছিল থাকার ঘর, বাগান, বাচ্চাদের জন্য আলাদা ঘর, খেলার মাঠ, কমন ডাইনিং হল, অডিটোরিয়াম, গ্রন্থাগার, হাসপাতাল, সুইমিং পুল ও আরও অনেক কিছু। আর তার পাশেই থাকত খেতখামার, ডেয়ারি, গবাদি পশুপালন কেন্দ্র,

কলকারখানা, মাছ চাষের জন্য পুকুর ইত্যাদি।

এই ব্যবস্থায় সবকিছুর মালিকানা থাকে যৌথভাবে সকল সদস্যের নামে। আর প্রত্যেকের থাকে সমান অধিকার। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে।

কিবুটজের ব্যবস্থা হল গণতান্ত্রিক। সব সদস্যদের নিয়ে সাধারণ সভায় পলিসি, বাজেট এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য কিছু নির্বাচিত সদস্য থাকেন। এখানে বাচ্চাদের পড়াশোনার পাশাপাশি ছোট ছোট দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে তারা ছোটবেলা থেকেই কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠে।

প্রথম 'কিবুটজ্' ডেগানিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ১৯০৯ সালে। আজ ইসরায়েলে কিবুটজের সংখ্যা প্রায় ২৭০। এক একটি কিবুটজের সদস্য সংখ্যা ৪০ থেকে ১,০০০ বা তারও বেশি। ইসরায়েলি জনতার প্রায় ২.৫% এখনও কিবুটজেই থাকে।

ফিরে আসি হ্যারেল সাহেবের কথায়। তিনি কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারগুলোকে মানতেন না। তাই প্রাচীনপন্থী বা অর্থোডক্স ইহুদিদের ভারী অপছন্দ করতেন। এখানে এই কট্টর ইহুদিদের নিয়ে কিছু শব্দ বলার দরকার আছে বলেই মনে করি।

এদের চালচলন, রীতি-রেওয়াজ ভারী অদ্ভুত! এরা মাথার দু' ধারের চুল কাটে না। জুলপি বরাবর নেমে আসে লম্বা সাইডলকস্। গোঁড়া জিউসদের মধ্যে মেয়েরা বিয়ের আগের দিন নিজের সব চুল কেটে ফেলে। উইগ পরে তারা বিয়ে করে। এর কারণ, তারা চায় বিয়ের আগে যে চুল সকলে দেখেছে তা স্বামীকে দেখাবে না। নতুন যে চুল বেরোবে, সেটাই স্বামী প্রথম দেখবে। অর্থোডক্স ইহুদিরা সবসময়ে কালো কাপড় পরে। সোলোমানের হুকুমত না ফেরা অবধি শোকে থাকতে চায় যে। বেশ জোরে জোরে হাঁটে। এই জোরে হাঁটার কারণটা শুনলে অবাকই লাগে। তাদের মতে এই দুনিয়ার সকল অ- ইহুদিই গুণাহগার। তাদের স্পর্শদোষ এড়িয়ে চলতে চায় অর্থোডক্সরা। চমকপ্রদ ব্যাপার হল এদের কোনো ট্যাক্সই দিতে হয় না। শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদন করাই এদের কাজ। শুক্রবারের সন্ধ্যার প্রার্থনা থেকে শনিবারের সন্ধ্যার প্রার্থনার সময়টাকে এরা বলে 'শাপাথ'। আর এই 'শাপাথ' পর্বে কিছু অদ্ভুত নিয়ম মানে অর্থোডক্সের দল। যেমন: কোনো ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস ব্যবহার করে না, পারফিউম ব্যবহার করে না। এই সময়ে এরা রান্না করে খায় না, আগে থেকেই রান্না করে রাখে। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সঙ্গে কোনো কথা বলে না। এমনকী নির্দিষ্ট দূরত্বের বেশি হাঁটাহাঁটিও করে না।

আশা করি, অল্পবিস্তর হলেও অর্থোডক্সদের সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া গেল। তা এই অর্থোডক্স ইহুদিরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করলেন আইজার হ্যারেলকে মোসাদ চিফের পদ থেকে সরাতে হবে। কিন্তু হ্যারেল নিজের পদে বহাল রইলেন। প্রধানমন্ত্রী নিজেও যে কিবুটজে বড় হয়েছিলেন!

আর হ্যারেল বেশ ভালো কাজও করেছিলেন। মিশরের বিরুদ্ধে সিনাইয়ের যুদ্ধে সাফল্যের পিছনে মোসাদের এজেন্টদের বিরাট অবদান ছিল। আরব লিগের প্রতিটা দেশের রাজধানীতে তাঁর গুপ্তচরেরা ছড়িয়ে ছিল। ফলে গুরুত্বপূর্ণ সব খবরই ঠিক সময়ে ইসরায়েলে পৌঁছে যেত। ১৯৫৪ সালে তিনি ওয়াশিংটন গেলেন। তার লক্ষ্য ছিল সদ্য সিআইএ-এর ভার গ্রহণ করা অ্যালেন ডুলসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। তিনি ডুলসকে একটা ছুরি উপহার দিলেন। ছুরিটার ওপর খোদাই করা ছিল— 'ইসরায়েলের রক্ষকেরা কখনো

ঘুমোয় না।'

ডুলস্ জবাবে বলেছিলেন, 'ভরসা করতে পারো, তোমার সঙ্গে আমিও জেগে থাকতে পারি।'

সিআইএ আর মোসাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া তৈরি হল। ডুলস্ মোসাদের জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করলেন। ট্র্যাকিং ডিভাইস, রিমোট চালিত ক্যামেরা এবং আরো অনেক কিছু মোসাদের হাতে এল। বস্তুত, এমন অনেক যন্ত্র মোসাদ পেল, যেগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কেই হ্যারেল জানতেন না। দুজনে মিলে একটা ব্যাক চ্যানেল সার্ভিসও চালু করলেন, যাতে জরুরি সময়ে তাঁরা ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন।

১৯৬১ সালে হ্যারেল মরক্কোয় থাকা কয়েক হাজার ইহুদিকে ইসরায়েলে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা বানালেন। এক বছর বাদে হ্যারেল সাউথ সুদানে গেলেন বিদ্রোহী ইহুদিদের সাহায্য করার জন্য। ওই বছরই তিনি ইথিয়োপিয়ার রাজা হাইলে সেলাসিকে একটা বিদ্রোহ দমন করতে সাহায্য করেছিলেন। সেলাসি ছিলেন ইসরায়েলের দীর্ঘ দিনের বন্ধু।

এদিকে তাঁর নিজের দেশে অর্থোডক্স ইহুদিরা তাঁকে সরানোর জন্য উঠে- পড়ে লেগেছিল। হ্যারেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি স্বৈরাচারী এবং ইহুদিদের ধর্মীয় অনুভূতির ধার ধারেন না। তিনি নিজে যা ভালো মনে করেন, তা-ই করেন। তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগও ছিল যে, তিনি তলে তলে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ছক কষছেন। আর এখানেই নড়েচড়ে বসলেন বেন-গুরিয়ন। রাজা যে কান দিয়ে দেখেন। একটা সময়ে তিনি হ্যারেলের ওপরই সবকিছু ছেড়ে দিয়েছিলেন। এবার তিনি প্রত্যেকটা অপারেশনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে হ্যারেলের কাছে কৈফিয়ত চাইতে আরম্ভ করলেন। হ্যারেলও আঁচ করলেন যে, কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। তবে তিনি এ ব্যাপারে কারো কাছে কোনো উচ্চবাচ্য করেননি।

১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। একটা সাংঘাতিক ঘটনা ইসরায়েলের গোটা ইহুদি সমাজে আলোড়ন ফেলে দিল। ইয়োসেলি শ্যমাখার নামের এক বালক বিগত দু' বছর ধরে নিখোঁজ ছিল। সবার ধারণা ছিল— ইয়োসেলিকে আলট্রা- অর্থোডক্স ইহুদিরা অপহরণ করেছে। তার দাদুর নাম ছিল নাহমান স্টাকস। তিনি ছিলেন 'গার্ডিয়ান অব দ্য ওয়ালস অব জেরুসালেম' দলের সদস্য। সন্দেহের তির ছিল তাঁর দিকেই। ওই দু' বছরে পুলিশ অনেক চেষ্টাতেও ইয়োসেলির কোনো খবর পায়নি। তদন্তে অসহযোগিতা করার জন্য নাহমানকে কিছু দিনের জন্য গ্রেফতারও করা হয়েছিল। কিন্তু হিতে বিপরীত ঘটল। রাতারাতি অর্থোডক্স ইহুদিদের কাছে তিনি নায়কে পরিণত হলেন। হাজার হাজার মানুষ ব্যানার নিয়ে রাস্তায় নামল। ব্যানারে লেখা ছিল— একজন বৃদ্ধকে কয়েদ করার জন্য ধিক্কার! বেন-গুরিয়ন আর নাৎসিদের মধ্যে কোনো ফারাক নেই।' বৃদ্ধের শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রতিবাদ ও মিছিল কিন্তু চলতেই থাকল।

বেন-গুরিয়নের রাজনৈতিক পরামর্শদাতারা তাঁকে সতর্ক করলেন যে, এভাবে চলতে থাকলে পরবর্তী নির্বাচনে তাঁর ভরাডুবি নিশ্চিত। আরেকটা বিপদের সম্ভাবনাও উঁকি দিচ্ছিল। আরবদের সঙ্গে যদি আবার যুদ্ধ বাধে, আর তাতে যদি অর্থোডক্সরা আরবদের সমর্থন করে? বেন-গুরিয়ন বড় চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি মোসাদকে আদেশ দিলেন, ইয়োসেলিকে খুঁজে বের করো! হ্যারেল প্রথমে এই কাজটা নিতে রাজি হননি। তাঁর মনে হয়েছিল মশা মারতে কামান দাগা হচ্ছে।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'দিস ইজ মাই অর্ডার!'

অগত্যা হ্যারেল পুলিশ ফাইল চাইলেন।

বেন-গুরিয়ন বললেন, 'তোমার হাতে মাত্র এক ঘণ্টা আছে, যা দেখার দেখে নাও।'

ফাইলটা বেশ মোটা। হ্যারেল উলটে পালটে দেখতে লাগলেন। ইয়োসেলির জন্ম ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে। বাবা আর্থার ও মা ইদা শ্যমাখার। পরিবারের আর্থিক সমস্যার কারণে ইয়োসেলিকে জেরুসালেমে তার দাদুর কাছে পাঠানো হয়। ইয়োসেলি সেখানে একটা গোঁড়া ধর্মীয় পরিবেশে বড় হচ্ছিল। ওদিকে ইয়োসেলির বাবা-মা কেউই অর্থোডক্স ছিলেন না। যখনই তাঁরা ইয়োসেলিকে দেখতে জেরুসালেম যেতেন, তখনই তাঁদের পাঁচ-কথা শুনিয়ে দিত ইয়োসেলির দাদু। একদিন এই কটুকাটব্য আর সহ্য করতে না পেরে তারা ইয়োসেলিকে নিজেদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাবেন বলে মনস্থির করলেন। রীতিমতো ঝগড়া হয়ে গেল বুড়োর সঙ্গে। ইয়োসেলিকে ছাড়তে রাজি হলেন না ওর দাদু। সে যাত্রায় আর ওকে নিয়ে ফিরতে পারেননি ওর বাবা-মা। পরের বার যখন আবার তাঁরা ইয়োসেলিকে দেখতে গেলেন, তখন ইয়োসেলির টিকিটিরও দেখা মিলল না।

আর এখান থেকেই ঝামেলাটা বড় আকার নিল। গোঁড়া ও ধর্মনিরপেক্ষ এই দুই দলে গোটা দেশ ভাগ হয়ে গেল। ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেটেও এই নিয়ে ঝামেলা শুরু হল। ধর্মনিরপেক্ষরা চাইছিল, ইয়োসেলিকে খুঁজে বের করে তার বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

ফাইল দেখার পর হ্যারেল দ্রুত মোসাদের ৪০ জন সদস্যকে নিয়ে একটা দল গঠন করলেন। ওই দলের অনেকেই আপত্তি তুলেছিলেন যে, এত সামান্য একটা কাজের জন্য এত আয়োজনের কী প্রয়োজন? কারণ মোসাদ সবসময় দুরূহ অপারেশনগুলোই করত। হ্যারেল সবাইকে বোঝালেন যে, এই কাজটিও অন্যান্য অপারেশনের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সরাসরি এর প্রভাব পড়ছে ইসরায়েলের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে। এতে সরকারের কর্তৃত্ব ও মানসম্মানের প্রশ্নও জড়িয়ে আছে। অনুসন্ধান শুরু হল। প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই গোটা দল চমকে উঠল— কারণ তাঁরা কেসটাকে যতখানি সরল ভেবেছিলেন, তা মোটেও ততটা সরল ছিল না।

একজন মোসাদ এজেন্ট আলট্রা অর্থোডক্সদের বলয়ে ঢোকার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। অন্য একজন একটা স্কুলের বাইরে নজরদারি চালাচ্ছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই সেটা লোক জানাজানি হতেই তাকে পিছু হটতে হল। একজন আবার হাসিডিক কমিউনিটির একটা শবযাত্রার দলের সঙ্গ নিল। সেও ধরা পড়ে গেল। সে আবার এক কেলোর কীর্তি— প্রার্থনার সময় সঠিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেনি।

একের পর এক ব্যর্থতা! আর এই ব্যর্থতাগুলোই হ্যারেলের চোয়াল আরো শক্ত করে দিল। তিনি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, ইয়োসেলি আর ইসরায়েলে নেই; তাকে হয় ইউরোপে বা তার বাইরে কোথাও পাঠানো হয়েছে। তিনি ওই অপারেশনের হেডকোয়ার্টার প্যারিসে স্থানান্তরিত করিয়ে দিলেন। সেখান থেকে হ্যারেল তাঁর লোকেদের ইতালি, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিভিন্ন জায়গায় পাঠালেন। কিন্তু ওই জায়গাগুলোকেই বাছা হল কেন? কারণ ওই দেশগুলোতেই গোঁড়া ইহুদিরা থাকত। যখন সেখানেও কোনো খবর পাওয়া গেল না, তখন তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় এজেন্ট পাঠালেন।

লন্ডনের কাছে-পিঠেই একটা ছোট শহর হেন্ডন। ইয়োসেলির খোঁজে ১০ জন মোসাদ এজেন্ট সেখানকার একটা সিনাগগে শনিবারের প্রার্থনায় হাজির হয়েছিলেন।

সেখানকার সমবেত ভক্তদের সন্দেহ হল তাঁদের হাবভাবে। শুরু হল কথা কাটাকাটি, যা সামান্য সময় পরেই ধস্তাধস্তিতে পরিণত হল। এজেন্টদের নকল দাড়ি-গোঁফ খুলে গেল। পুলিশ ডাকা হল এবং ১০ জন এজেন্টই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড! শেষমেষ সেখানে ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতের মধ্যস্থতায় তাঁরা ছাড়া পেলেন। এদিকে আরেকটা ঘটনায় আসি। একজন গণ্যমান্য গোঁড়া ইহুদি ধর্মগুরুকে প্যারিসে আমন্ত্রণ করা হল। তাকে জানানো হল যে, এক ধনী পরিবারের খৎনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই আমন্ত্রণ। তিনি বিমানবন্দরে পৌঁছলে তাঁকে রিসিভ করার জন্য কালো কোট ও অর্থোডক্স ইহুদিদের ট্রেডমার্কড হ্যাট পরা দুজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এরা ছিলেন মোসাদের এজেন্ট।

ধর্মগুরু বা রাবাইকে তুলে নিয়ে পিগালেতে একটি বেশ্যালয়ে চলে যান ওই দুই এজেন্ট। দুজন বেশ্যা ধর্মগুরুকে ধরে জাপটাজাপটি করতে থাকে। এই কাজটা করার জন্য আগে থেকেই টাকা দেওয়া হয়েছিল। পোলারয়েড ক্যামেরায় সেই মুহূর্তের ছবিও তোলা হয়। এবার সেই ছবি দেখিয়ে ধর্মগুরুকে ভয় দেখানো হল, যদি ইয়োসেলি কোথায় আছে না বলেন, তাহলে এই ছবি ভাইরাল করে দেওয়া হবে।

ভদ্রলোক অনেক কষ্টে তাদের বোঝালেন যে, ইয়োসেলির ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে এজেন্টরা তাঁর সামনেই ছবিগুলো নষ্ট করলেন।

আরেক জন রাবাইকে মোসাদ এজেন্টরা পাকড়াও করেছিল। তার নাম সাই ফেয়ার। প্যারিস থেকে জেনিভা যাওয়ার পথে ভদ্রলোককে আটক করা হয়। এবারেও এজেন্টদের বিফল হতে হল। তবে ধর্মগুরুকে ছাড়া হয়নি। হ্যারেলের নির্দেশে তাঁকে সুইৎজারল্যান্ডের একটা গোপন ঠিকানায় আটকে রাখা হল। মোসাদ চিফের ভয় ছিল, ওই ভদ্রলোক ছাড়া পেলে কট্টরপন্থীদের মধ্যে একটা শোরগোল তৈরি করতে পারেন।

এরই মধ্যে আর একজনকে পাওয়া গেল, যার জন্য একটু হলেও আশার আলো জেগে উঠল। তিনি ম্যাডেলিন ফ্রেই। ফ্রান্সের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের এই মেয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি অনেক ইহুদি শিশুকে নাৎসি ডেথ ক্যাম্পে যাওয়ার আগে উদ্ধার করেছিলেন। যুদ্ধের পর তিনি ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেন।

ইসরায়েলে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। বেশ কয়েক বার তিনি ইয়োসেলির দাদুর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। শেষ বার তিনি ইসরায়েল গিয়েছিলেন ঠিক সেই সময়েই, যখন ইয়োসেলি নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপর আর তিনি ওমুখো হননি। দুইয়ে দুইয়ে চার যেন মিলে যাচ্ছিল।

মোসাদের এজেন্টরা ফ্রেইকে প্যারিসেরই সীমান্ত-ঘেঁষা একটা এলাকা থেকে খুঁজে বের করল। এজেন্টরা নিজেদের পরিচয় দিলে ক্ষিপ্ত ম্যাডেলিন তাঁদের আক্রমণ করে বসলেন। এজেন্টরা তখন বাধ্য হয়েই হ্যারেলকে সেখানে ডাকলেন।

হ্যারেল এলেন। তিনি বোঝালেন ম্যাডেলিনকে— 'জোসেলের বাবা-মায়ের সঙ্গে কিন্তু চরম অন্যায় হচ্ছে! প্রত্যেক বাবা-মায়েরই নিজের সন্তানকে তাঁদের ইচ্ছেমতো লালন-পালন করার অধিকার আছে। আর এই অধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না।'

ম্যাডেলিন কিন্তু সমানে বলে চললেন, 'আমি কিস্যু জানি না।'

হ্যারেল দেখলেন যে, তাঁর লোকেরা ম্যাডেলিনের কথা বিশ্বাসও করে নিয়েছে। কিন্তু

হ্যারেল বুঝে গিয়েছিলেন ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। তিনিও নাছোড়বান্দা। তিনি ম্যাডেলিনকে বললেন, ‘শো মি ইয়োর পাসপোর্ট।’

পাসপোর্টে ম্যাডেলিনের ছবির নীচে তাঁর এক মেয়ের ছবি লাগানো ছিল। হ্যারেল সেটা দেখেই নির্দেশ দিলেন, ‘কেউ একজন ইয়োসেলির একটা ছবি নিয়ে এসো।’

দুটো ছবির মুখ হুবহু মিলে গেল। এবার আর কোনো সন্দেহ রইল না। তৎক্ষণাৎ হ্যারেল তেল আভিভে ফোন করলেন।

এই ইন্টারোগেশন দীর্ঘ সময় ধরে চলেছিল। তবে অতি অল্পে বলি, স্বীকারোক্তি ছাড়া ম্যাডেলিনের কাছে দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা ছিল না। ম্যাডেলিন এবার নিজের কাহিনি বলতে শুরু করলেন। শিশুকন্যার রূপ ধরিয়ে ইয়োসেলিকে পাচার করা হয়। তাঁরা যখন হাইফার ইমিগ্রেশন অফিসে পৌঁছলেন, তখন মেয়েরূপী ইয়োসেলি তাঁর হাত ধরে ছিল। ইমিগ্রেশন অফিসার বাচ্চাটিকে ম্যাডেলিনের মেয়ে বলেই ভেবেছিলেন। সরকারি কাগজে সেটাই নোট হয়। আর তার এক সপ্তাহ পরেই ইসরায়েলি পুলিশের নাকের ডগার সামনে দিয়ে ম্যাডেলিন ‘মেয়ে’কে নিয়ে জুরিখের বিমানে চেপে বসেন। তার আগে অবশ্য ইয়োসেলির চুলে রঙ করে দেওয়া হয়েছিল, আর তাকে মেয়েদের পোশাক পরানো হয়েছিল।

কিছু দিন ইয়োসেলিকে সুইজারল্যান্ডের একটা অর্থোডক্স স্কুলে রাখা হয়েছিল। ওই স্কুলেই ধর্মগুরু সাই ফ্রেয়ার একজন শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ফ্রেয়ার পাকড়াও হওয়ার পর ম্যাডেলিন ইয়োসেলিকে নিয়ে নিউ ইয়র্কে চলে আসেন। সেখানে তিনি ইয়োসেলিকে অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের এক পরিবারের কাছে রেখে আসেন।

হ্যারেলের শেষ প্রশ্ন ছিল, ‘আপনি আমাকে ওই পরিবারের নাম ও ঠিকানা দিতে পারেন?’

দীর্ঘ স্তব্ধতার পর ম্যাডেলিন উত্তর দিয়েছিলেন, ‘১২৬ পেন স্ট্রিট, ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক। ওখানে ইয়োসেলির নাম য়াঙ্কালে গার্টনার।’

প্রথম বার হ্যারেলের মুখে হাসি ফুটল, ‘ধন্যবাদ, ম্যাডেলিন! আমি আপনাকে মোসাদের হয়ে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনার মতো প্রতিভা ইসরায়েলের বড় দরকার।’

ম্যাডেলিন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

মোসাদ এজেন্টরা নিউ ইয়র্ক পৌঁছলেন। সেখানে এফবিআই এজেন্টরা আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল রবার্ট কেনেডির নির্দেশ ছিল যে, মোসাদ এজেন্টদের সমস্ত রকম সহযোগিতা করতে হবে। বেন- গুরিয়নের কাছ থেকে এর জন্য ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ এসেছিল। এজেন্টরা ১২৬ পেন স্ট্রিটের সেই অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছলেন। গৃহকর্ত্রী দরজা খুললেন। এজেন্টরা তাঁকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। ভেতরে ভদ্রমহিলার স্বামী প্রার্থনা করছিলেন। আর তার পাশে ছিল পাংশুটে চেহারার এক বালক, যার মাথায় ‘য়ামিকা’ টুপি

‘হ্যালো ইয়োসেলি, আমরা তোমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি,’ এজেন্টরা তাকে মৃদু স্বরে বললেন।

আট মাস ধরে চলা অপারেশেনে ইতি পড়ল। এর পিছনে খরচ হয়ে গিয়েছিল প্রায় এক মিলিয়ন ইউএস ডলার।

ইয়োসেলি নিরাপদে ঘরে ফেরার পরও ইসরায়েলে চলা পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হল না। নেসেটে নির্বাচিত অল্পসংখ্যক কট্টরপন্থী সদস্যদের জন্য সরকার টলোমলো অবস্থায় থাকত, অধিবেশন প্রায় দিনই ভেস্তে যেত।

ইয়োসেলিকে উদ্ধার করে দেশে ফেরার পর হ্যারেলকে জেনারেল মির অমিতের প্রখর সমালোচনার মুখে পড়তে হল।

কে এই মির অমিত?

মিলিটারি ইনটেলিজেন্স সংস্থা আমানের নব নির্বাচিত চিফ। ঠিক যেভাবে হ্যারেল তাঁর পূর্বতন মোসাদ প্রধানের সমালোচনা করেছিলেন, এবার তিনি নিজে সেটা ফেরত পেলেন। পাপ যে তার বাপকে ছাড়ে না।

মির অমিত ছিলেন একজন দুর্দান্ত ফিল্ড কমান্ডার! ইসরায়েলের টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি বেন গুরিয়নের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বেন-গুরিয়নকে বোঝালেন যে, হ্যারেল এই অপারেশনে অর্থের অপচয় করেছেন। পুরো অপারেশনটা যেভাবে চলেছে তা দেখলে বোঝা যায় যে, তাঁর অবসর নেওয়ার সময় এসে গেছে। বেন-গুরিয়নও ভুলে গেলেন যে তাঁর কথাতেই হ্যারেল ওই অপারেশনে নেমেছিলেন। তিনি মিরকে বললেন, ‘তুমি ঠিক বলছ।’

১৯৬৩ সালের মার্চের ২৫ তারিখ অপমানিত হ্যারেল পদত্যাগ করলেন। তাঁর সহকর্মীরা চোখের জলে তাঁকে বিদায় দিলেন। হ্যারেল সবার সঙ্গে করমর্দন করে মোসাদ হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মোসাদের ইতিহাসে একটি যুগের অবসান হল।

কয়েক ঘণ্টা পর লম্বা, ছিপছিপে, সুদর্শন এক ব্যক্তি দ্রুত পদে মোসাদের হেডকোয়ার্টারে প্রবেশ করলেন। মির অমিত, হ্যাঁ মির অমিতই মোসাদের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সবাই বুঝতে পেরেছিল এবার অনেক রদবদল হবে।

নিজের ডেস্কে পনেরো মিনিটের মতো কাটানোর পর তিনি সকল বিভাগীয় প্রধানদের ডেকে পাঠালেন। সবাই তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ তিনি সবাইকে পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর নিজস্ব ভঙ্গীতে বললেন, ‘হারানো শিশুদের খুঁজে বের করার কাজ মোসাদ আর কখনো করবে না। কোনো রাজনৈতিক প্রভাব এখানে আর কাজ করবে না। বাইরের সমস্তরকম সমালোচনা সামলানোর দায়িত্ব আমার, কারোর ওপর কোনো আঁচ আসতে দেব না আমি। কিন্তু যাকে যে দায়িত্ব দেব, সেটাতে ব্যর্থ হলে তার চাকরিও কেউ বাঁচাতে পারবে না। আমি প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করব, যাতে মোসাদের হাতে উন্নত যন্ত্রপাতি এবং ব্যাকআপ রিসোর্স থাকে। কিন্তু সবার ওপরে হল হিউম্যান ইনটেলিজেন্স। আমি চাই এদিক থেকে মোসাদ হয়ে উঠুক সবার সেরা।’

মির অমিতের কেরিয়ারে সবথেকে বড় অধ্যায় ছিল ইরাক থেকে একটা আস্ত মিগ ২১ তুলিয়ে আনা। সেই কাহিনিও আমরা জানব। পরে। ইসরায়েলের ইনটেলিজেন্স সিস্টেমের জন্মকথায় এখানেই ইতি টানলাম।

অ্যাটাক ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স

একটা প্রশ্ন এখানে উঠতেই পারে— ঠিক কবে থেকে ইহুদিরা নিজেদের আত্মরক্ষার কথা ভাবতে শুরু করল? ১৯২৯ সালে ওয়েলিং ওয়ালের সামনে আক্রমণের ঘটনার আগে আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টাই কি তারা করেনি?

উনবিংশ শতকের সিকি ভাগ বাকি থাকতে ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে দলবদ্ধ ভাবে চাষবাস শুরু করে। তাদের ফসল ও ঘরবাড়ি রক্ষা করবার জন্য আরবদের সঙ্গে সংগ্রাম করেই বাঁচতে হত। জলের জন্যও লড়তে হত অনেক সময়। তাদের সামনে মাত্র দুটো রাস্তাই খোলা ছিল। এক, লড়াই করো; দুই, প্রতিবেশীর দয়ার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকো। ইহুদিরা প্রথম রাস্তাটাই বেছে নিয়েছিল। এই সময় কিছু প্রহরী নিয়োগ করা হয় ইহুদিদের রক্ষার জন্য। প্রথম দিকে স্থানীয় আরবদেরই এই কাজে নেওয়া হত। তরুণরা সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। ধীরে ধীরে ইহুদিরাই নিজেদের কাঁধে তুলে নেয় এই দায়িত্ব। কারণ আরবরা আক্রমণ করলে আরব প্রহরীরা কতটা সাহায্য করবে সেটা নিয়ে ইহুদিদের মনে একটা ধন্দ ছিল।

১৯০৭ সালে ইসরায়েল সোহাতের উদ্যোগে য়িত্জাক বেন জভি, জভি বেকার, ইসরায়েল গিলাডি, য়েহেজকিয়েল হানকিন, য়েহেজকিয়েল নিসানভ, আলেকজান্ডার জিদ জাফাতে এক গুপ্ত সংস্থা তৈরি করেন, যার নাম দেওয়া হয় বার-গিওরা।

কিন্তু এমন নাম কেন?

৬৬-৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইহুদিদের সেনাদলের নেতা ছিলেন সিমন বার-গিওরা। তাঁর নামেই এই নামকরণ। বার-গিওরার কাজ ছিল ইহুদিদের বাসস্থানগুলোকে রক্ষা করা। তাদের পতাকায় লেখা থাকত— 'রক্ত আর আগুনের মধ্যে দিয়ে ইহুদির পতন হয়েছিল, রক্ত আর আগুন থেকেই ইহুদির উত্থান হবে!'

প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে আসছিল। দিনে দিনে লোক বাড়ায় প্রয়োজন হচ্ছিল আরও শক্তিশালী একটা সংগঠনের। ১৯০৯ সালে বার-গিওরা থেকে তৈরি হল 'হাসোমার', যা মূলত বার-গিওরারই এক পরিবর্ধিত রূপ। সেজেরা, লোয়ার গ্যালিলি ও অন্যান্য ইহুদি গ্রামগুলোতে সশস্ত্র পাহারা মোতায়েন করে হাসোমার। এর জন্য বার্ষিক খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। জেজরিল উপত্যকায় যখন জিউস ন্যাশনাল ফান্ডের সাহায্যে জমি কেনা হয়, তখন আরব আক্রমণ ঠেকাতে হাসোমারের সদস্যদের পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় হাসোমারের সদস্য সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট কম। এবার একটা পুরোদস্তুর সৈন্যদল গঠন করা খুব দরকারি হয়ে ওঠে। ১৯২০ সালে 'হেগানা' গঠন হওয়ার পর হাসোমারের অস্তিত্ব লোপ পায়। হেগানার কথা যদিও আগেই বলা হয়েছে, তবুও এই সূত্রে আরও কিছু জিনিস ছুঁয়ে যেতেই হয়।

১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে আরব-দাঙ্গার পর ইহুদিরা নিজেদের সুরক্ষার জন্য ব্রিটিশদের ওপর ভরসা করা পুরোপুরি ভাবে ছেড়ে দেয়। জেরুসালেমের এই দাঙ্গায় নিহত হয় ৫ জন ইহুদি ও ৪ জন আরব। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২০ সালের জুন মাসে তৈরি করা হয় আন্ডারগ্রাউন্ড মিলিটারি অর্গানাইজেশন–হেগানা, যা স্বাধীন ইসরায়েল গঠনের পরে পরিণত হয় আইডিএফ-এ। প্রথম ন' বছর হেগানার সংগঠন ছিল নড়বড়ে। ১৯২৯ সালের আরব-দাঙ্গার পর হেগানাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়—

সমস্ত যুবক এবং প্রাপ্তবয়স্কদের হেগানার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার ফলে প্রতিটি শহরে

কয়েক হাজার করে হেগানার সদস্য তৈরি হয়।

সদস্যদের জন্য ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়।

কয়েকটা অস্ত্রাগার তৈরি করা হয় যেখানে ইউরোপ থেকে আনা অস্ত্রাদি মজুত করা হয়।

আন্ডারগ্রাউন্ড অস্ত্র তৈরির কারখানা তৈরির পরিকল্পনা করা হয়।

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে হেগানা রীতিমতো এক সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়। যদিও ব্রিটিশদের কাছে হেগানা সরকারিভাবে স্বীকৃত কোনো সংস্থা ছিল না। কিন্তু হেগানার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন সমর্থন তাদের ছিল।

দাঙ্গার সময় প্রায় ৫০টি ইহুদি-অধ্যুষিত গ্রামকে সুরক্ষা দিয়েছিল হেগানার সদস্যরা।

১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ সরকার এক হোয়াইট পেপার বা শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। এতে পার্টিশনের প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়া হয়। আরব ও ইহুদিদের সম্মিলিত সরকার গঠন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ইহুদি জনসংখ্যা প্যালেস্টাইনের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে রাখার কথা বলা হয় এবং তার বেশি সংখ্যক ইহুদিদের জায়গা দিতে হলে তা হবে আরবদের অনুমতি সাপেক্ষ।

এতে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জায়গা কেনার ক্ষেত্রেও রাশ টানার কথা বলা হয়।

বলা বাহুল্য, এটা ইহুদিদের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না এবং তারা হতাশ হয়েছিল। ১৯৩৯ সালের হোয়াইট পেপার সামনে আসার পর হেগানা ইহুদিদের অবৈধ অনুপ্রবেশে সাহায্য করা শুরু করে। কারণ, তাদের লক্ষ্য ছিল ইহুদি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ব্রিটিশ নীতির বিরুদ্ধে তারা জায়গায় জায়গায় প্রদর্শন শুরু করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হেগানার সদস্যরা ব্রিটিশদের হয়ে লড়াই করে। মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি কম্যান্ডো মিশনে তারা অংশ নেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হেগানা নিজেকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। তরুণদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১৯৪১ সালে হেগানার আন্ডারগ্রাউন্ড এলিট ইউনিট 'পালমাখ' গঠন করা হয়। পালমাখের সদস্যদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিল তাদের সাহস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদিরা আশা করেছিল যে, এবার হয়তো তাদের আশা পূরণ হবে। ব্রিটিশরা নিশ্চয়ই এবার ইহুদি-রাষ্ট্রের ব্যাপারে উদ্যোগী হবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি মিলল। ব্রিটিশরা এ ব্যাপারে কোনা আগ্রহই দেখাচ্ছিল না। এবার হেগানার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তারা সরাসরি ব্রিটিশদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু করে দিল।

হেগানা প্যালেস্টাইনের বাইরেও তাদের জাল বিস্তার করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যান্ড, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, মরক্কো প্রভৃতি দেশে তাদের শাখা খোলা হয়েছিল। এদের মধ্যে হলোকাস্ট থেকে বেঁচে ফেরা অনেক সদস্যও ছিল।

হেগানার শাখা মোসাদ লালিয়াহ বেটর দায়িত্ব ছিল অবৈধ অনুপ্রবেশ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা। পালমাখের শাখা 'পালয়ম'-এর দায়িত্ব ছিল জলপথে অনুপ্রবেশকারীদের প্যালেস্টাইনে নিয়ে আসা। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে ৬৬টা জাহাজে করে

গোপনে ৭০,০০০ ইহুদিকে প্যালেস্টাইনে নিয়ে আসা হয়।

হেগানার সক্রিয় সদস্যরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপ চেকোস্লোভাকিয়া থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র কিনে প্যালেস্টাইনে পাঠায়। এরা অস্ত্র তৈরির কারখানাও চালু করে যার হিব্রু নাম 'তা'স' যার মানে, মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রি। ইসরায়েল যখন স্বাধীন হয়, তখন তা'স-এর কাছে ছিল মোট ৪৬টি অস্ত্র কারখানা। সেখানে তৈরি হত সাব মেশিনগান, মর্টার, গ্রেনেড, বুলেট ও বিস্ফোরক।

এখানে বিশ্ব ইতিহাসের একটা তুলনামূলক অনালোচিত অধ্যায়ের কথা না বললে পাঠকদের সঙ্গে বঞ্চনা করা হবে। এত বোরিং ইতিহাস বর্ণনার মধ্যে এটুকুই তো অক্সিজেন।

কী সেই কথা?

ক্লিমেন্টিসের নাম পড়েছেন বন্ধু? মানে, ভ্লাদিমির ক্লিমেন্টিস? বিগত শতাব্দীর বহুলচর্চিত চেকোস্লোভাকিয়ান নেতা, ক্লিমেন্টিস ছিলেন চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ক্লিমা গোটবাল্ডের দক্ষিণ হস্ত।

ভদ্রলোকের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল— ওঁর মাথায় সবসময় একটা ইউরোপিয়ান ফার-ক্যাপ থাকত। অল দ্য টাইম! আর এই ক্যাপটাই হয়ে ওঠে ওঁর পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, অনেকটা চার্চিলের টুপির মতো, ইয়াসের আরাফাতের কাফিয়ার মতো। ঊনবিংশ শতকের চারের দশকে চেকোস্লোভাকিয়াতে কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লব চলছিল। তা সফলও হল। গোটা দেশ ক্লিমা গোটবাল্ডকে নেতা হিসাবে বেছে নিল।

গোটবাল্ড হলেন নতুন সরকারের মুখ। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পথের জুলুসের দিকে মুখ করে গোটবাল্ড জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। ওঁর সঙ্গে ছিলেন পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং ছিলেন ভ্লাদিমির ক্লিমেন্টিস।

হঠাৎ বরফ পড়তে শুরু করল। গোটবাল্ডের মাথায় কোনো টুপি ছিল না। ব্যাপারটা দেখে ক্লিমেন্টিসের ভালো লাগেনি— 'আরে, আমাদের নেতা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে সেটা যে আমাদেরই অসম্মান!'

নিজের মাথা থেকে ফার-ক্যাপটা খুলে গোটবাল্ডের মাথায় সসম্মানে পরিয়ে দিলেন ক্লিমেন্টিস। ক্যামেরার ফ্ল্যাশবাল্বের ঝলকানিতে চিরদিনের মতো কয়েদ হয়ে গেল সেই মুহূর্ত।

বন্ধুরা ধৈর্য হারাচ্ছেন কি? ভাবছেন ইসরায়েলের ডিফেন্সের কথা বলতে গিয়ে কোথাকার কোন ভ্লাদ ক্লিমেন্টিস নামক বুড়োর গল্প ফাঁদল রে বাবা! বলি, একটু সবুর করুন।

১৯৪৮ সাল। ইসরায়েল তখন সদ্য স্বাধীন হয়েছে। ইসরায়েলের স্বাধীনতা পাওয়ার পরদিনই ইসরায়েলের ওপর আরব দেশগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর এই আক্রমণের কথা আগে থেকেই আঁচ করে নিয়ে ইসরায়েলিরা লড়াই করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করে রেখে দিয়েছিল। আর সেই মোক্ষম সময়পর্বে ইসরায়েলকে সাহায্য করেছিলেন এই ক্লিমেন্টিস। ১৯৪৮ সালের ৩১মার্চ থেকে আরম্ভ করে আগস্ট মাসের ১২ তারিখ অবধি চেকোস্লোভাকিয়া থেকে ইসরায়েলে অস্ত্র পাচার চলে। এই অপারেশনের নাম ছিল 'অপারেশন বালাক'। কিন্তু পরবর্তী কালে আমেরিকান গভর্নমেন্টের চাপের মুখে পড়ে

চেকোস্লোভাকিয়া এই মদত বন্ধ করে দেয়। আর এরপরই ক্লিমেন্টিস পড়েন গোটবাল্ডের কোপে। কমিউনিস্ট পার্টি ওঁর বিপক্ষে চলে যায়। ফাঁসি দেওয়া হয় ভ্লাদিমির ক্লিমেন্টিসকে।

ক্লিমেন্টিসের ফাঁসির পর অদ্ভুত ভাবেই ইতিহাস থেকে তাঁর উপস্থিতির যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ মুছে দিতে শুরু করেন কমিউনিস্টরা। প্রায় সব নথি থেকে মুছে যায় তাঁর নাম। কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই মোছা গেল না। বিপ্লবের সাফল্যের পরপরই গোটবাল্ডের মাথায় টুপি পরানোর ঐতিহাসিক চিত্র থেকে ক্লিমেন্টিসকে মুছে ফেলা গেলেও লুকোনো গেল না গোটবাল্ডের মাথার ফার- ক্যাপ। শাশ্বত রয়ে গেল তাঁর টুপি!

১৯৪৭ সালে ডেভিড বেন গুরিয়নের নেতৃত্বে হেগানার এক সাধারণ নীতি তৈরি করা হয়। আরব আক্রমণ ঠেকানোর জন্যই ছিল মূলত এই নীতি। ১৯৪৮ সালের ২৬ মে হেগানাকে দেশের সামরিক বাহিনীতে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং এর নাম দেওয়া হয় ‘জিভা হেগানা লে-য়িসরায়েল’ বা ‘ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস’, যার সংক্ষিপ্ত নাম ‘আইডিএফ’।

১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত হেগানার ৫,১৫১ জন সদস্য নিহত হয়েছে যার মধ্যে ১৯৪৮ সালের যুদ্ধেই নিহত হয়েছে ৩,৯৫২ জন।

একটা অবৈধ আন্ডারগ্রাউন্ড সশস্ত্র সংগঠনের একটা দেশের সেনাবাহিনী হয়ে ওঠা এক বিরল ঘটনা। ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের পথে এবং ইহুদিদের অস্তিত্ব রক্ষার চরম সংকটে হেগানা এক অসামান্য অবদান রেখেছে।

ইসরায়েল এবং ইহুদিরা চিরদিন হেগানার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

কিন্তু আরও কিছু কথা বাকি রয়ে যায় যে!

১৯৩১ সালে হেগানার কয়েক জন কমান্ডার মতবিরোধের জেরে হেগানা পরিত্যাগ করে ‘ইরগুন’ প্রতিষ্ঠা করে। হেগানার যে নীতি অনুসরণ করত তা ছিল রক্ষণাত্মক, যার নাম ছিল ‘হভলাগাহ’। আক্রমণ হওয়ার পরে ইহুদিদের রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল হেগানার যোদ্ধাদের। কিন্তু কোনো আক্রমণের আগাম খবর পেলেও কোনো কিছু করার অধিকার তাদের ছিল না। এদিকে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের ওপর আক্রমণ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছিল।

এই সময় হেগানার রক্ষণাত্মক নীতির যথেষ্ট সমালোচনা হয়। ইরগুন প্রতিষ্ঠার নেতা ছিলেন ভ্লাদিমির জবোটিনস্কি। হিংসাকে একমাত্র হিংসার মাধ্যমেই আটকানো যায়— এই ছিল তাঁর মূল বক্তব্য। ধীরে ধীরে হেগানার সদস্যরা তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল। এরাই ১৯৩১ সালে হেগানা থেকে আলাদা হয়ে গঠন করে ইরগুন। আক্রান্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে শত্রুকে আক্রমণ করাই ছিল তাদের নীতি। এই দলের প্রথম দিকে নাম ছিল ‘হেগানা বেট’ এবং পরে এর নাম হয় ‘ইরগুন’। ইরগুনের আরেকটা নামও ছিল— ‘এটজাল’। জবোটিনস্কিই ছিলেন এই দলের সুপ্রিম কমান্ডার। ১৯৪০ সালে তার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি এই দলকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন।

ইরগুনের সদস্যরা আরবদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সশস্ত্র হামলা চালায়। অনেককে গ্রেফতার করে ব্রিটিশরা। একটা আরব বাসে গুলি চালানোর অপরাধে শ্লোমো বেন যোসেফ নামে এক সদস্যকে ফাঁসিতে ঝোলায় ব্রিটিশরা। ১৯৩৯ সালের মে মাসে ইহুদিদের স্বার্থবিরোধী হোয়াইট পেপার পাবলিশ হওয়ার পর ইরগুন ব্রিটিশদের তাদের

শত্রুর তালিকায় যোগ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর ইরগুনের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়। বেশ কিছু সদস্য ব্রিটিশ আর্মির প্যালেস্টাইন ইউনিটে ও পরে জিউস ব্রিগেডে যোগ দেয়।

১৯৪৩ সালে ইরগুনের প্রধান হলেন মেনাকেম বিগিন যিনি পরবর্তীতে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইরগুন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তারা সরকারি দপ্তর, মিলিটারি ইনস্টলেশন ও পুলিশ স্টেশনগুলোয় হানা দিয়ে সেগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া শুরু করল। হেগানা ইরগুনের এই কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট ছিল এবং তারা এর বিরুদ্ধে প্রচার চালায় যার চলতি নাম ছিল 'সেজোন'।

ব্রিটিশরা বহু ইরগুন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে ও জেলে পাঠায়। ১৯৪৭ সালের মে মাসে ইরগুনের ৪ জনকে আকোর জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়। এ বছরেরই মে মাসে ইরগুন আকোর জেলে হামলা চালিয়ে ৪১ জন বন্দিকে মুক্ত করে। জুলাই মাসে আরো ৩ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

১৯৪৮ সালে ইসরায়েল স্বাধীন হওয়ার পর আগস্ট মাসে ইসরায়েলের ক্যাবিনেট ইরগুনের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করে যে, ইরগুনের সদস্যরা আইডিএফে যোগ দিক আর তা না হলে তাদের বিরুদ্ধে সেনা নামানো হবে। ক্যাবিনেটের এই সিদ্ধান্তে সাড়া দিয়ে ইরগুনের সদস্যরা ইসরায়েলের সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে গোটা ইরগুন আইডিএফে মিশে যায়। আর এভাবেই ইরগুনের অস্তিত্ব লোপ পায়।

ইফ উইন্টার কামস, ক্যান স্প্রিং বি ফার বাহাইন্ড? এই অমোঘ সত্যের মতো বার-গিওরা বা ইরগুনের কথা তুললে এসে যায় 'লেহি'র আলাপও।

কী ব্যাপার দেখে নেওয়া যাক।

ইরগুন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সরাসরি হিংসার রাস্তা বেছে নিয়েছিল। এদের থেকেও বেশি চরমপন্থী আরেকটা দল গড়ে উঠেছিল। ইরগুনের কিছু সদস্য মিলে ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে তৈরি করেছিল 'লেহি'। এই দলের নেতা ছিলেন আব্রাহাম স্টার্ন। ভদ্রলোক নিজে একজন প্রতিভাবান লেখকও ছিলেন। এক সময়ে তিনি ভেবেছিলেন ইতালিতে গিয়ে ডক্টরেট করবেন, গবেষণা নিয়ে সময় কাটাবেন। কিন্তু তিনি অনুভব করেন যে, ব্রিটিশদের হাত থেকে প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করার জন্য যথেষ্ট প্রতিরোধ কেউ গড়ে তুলতে পারছে না। তাই তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য ত্যাগ করে এক উগ্রপন্থী দল গড়ে তোলেন। লেহির বিরুদ্ধপক্ষের লোকেরা এর নাম দিয়েছিল 'স্টার্ন গ্যাং'।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ব্রিটিশরা লড়ছিল নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে। ইহুদিদের ওপর করা নাৎসিদের নারকীয় অত্যাচারের স্মৃতি তখন দগদগে। ইরগুন তাই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কারণ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধ লড়াই করা মানে পরোক্ষভাবে নাৎসিদেরই সাহায্য করা। কিন্তু লেহির সদস্যরা নাৎসিদের থেকেও বড় শত্রু ভাবত ব্রিটিশদের। তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। তাদের টার্গেট ছিল ব্রিটিশ মিলিটারি ও সরকারি আধিকারিকরা।

লেহির স্বপ্ন ছিল প্যালেস্টাইন থেকে ব্রিটিশদের উৎখাত করে ইউফ্রেটিস ও নীল নদের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় ইহুদি রাষ্ট্র গড়ে তোলা। কিন্তু লেহির লোকবল ও অস্ত্রবল ছিল যথেষ্ট সীমিত। লেহির এই কার্যকলাপ সাধারণ ইহুদি জনগণের সমর্থন পায়নি। কারণ

সাধারণ মানুষের চোখে তারা ছিল কেবল একটা সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। ফলে তারা একটা বিচ্ছিন্ন দলে পরিণত হয়। ব্রিটিশ পুলিশের কাছে লেহির সদস্যরা ছিল মোস্ট ওয়ান্টেড। ১৯৪২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি স্টার্ন ব্রিটিশ সেনার হাতে নিহত হন। লেহির বাকি সদস্যরা কিন্তু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, একদিন ঠিক তারা ব্রিটিশদের তাড়াতে সক্ষম হবে।

১৯৪৪ সালের ৬ নভেম্বর এলিয়াহু বেট-জুরি এবং এলিয়াহু হাকিম নামে দুই লেহির সদস্য মধ্য-প্রাচ্যের ব্রিটিশ মিনিস্টার লর্ড ময়েনকে কায়রোতে তাঁর বাড়ির সামনে হত্যা করে। অপরাধীরা ধরা পড়ে। মিলিটারি কোর্টে তাদের বিচার হয় ও ১৯৪৫ সালের ২৩ মার্চ তাদের ফাঁসি হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা যখন ইহুদি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছিল না, তখন বেন-গুরিয়ন সম্মিলিত সংগ্রামের ডাক দেন। হেগানা, ইরগুন ও লেহি গড়ে তোলে ইউনাইটেড রেসিস্টেন্স মুভমেন্ট, যার অগ্রভাগে থাকবেন বেন-গুরিয়ন। ঠিক করা হয় যে, তারা একত্রে ব্রিটিশদের ওপর হামলা চালাবে। হেগানার হাতে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়। তাদের সবচেয়ে সফল আক্রমণ ছিল হাইফাতে রেল সেতু উড়িয়ে দেওয়া ও গোটা রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা তছনছ করে দেওয়া। ১৯৪৬ সালের জুন মাসের ১৬ ও ১৭ তারিখ এই আক্রমণ করা হয়েছিল।

১৯৪৮ সালের ৩১ মে যখন আইডিএফ সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন লেহির অস্তিত্ব বিলোপ করা হয়, আর লেহির সদস্যরা আইডিএফে নাম লেখায়। কেবল জেরুসালেমে লেহির সদস্যরা স্বতন্ত্রভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। তাদের দাবি ছিল যে, এখনও জেরুসালেমের ভাগ্য নির্ধারণ বাকি কারণ এখনও কেউ জানে না, জেরুসালেম কার দিকে থাকবে।

১৯৪৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ইউএন মিডিয়েটর ফোক বার্নাডোট জেরুসালেমে খুন হয়ে যান। অভিযোগের আঙুল ওঠে লেহির সদস্যদের দিকে। সরকার লেহিকে নিষিদ্ধ সংগঠন বলে ঘোষণা করে এবং এর মুখপত্র হামিভরাকের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। নাটান য়েলিন-মোর, মাটিটয়াহু শমুয়েলভিটজ নামের লেহি নেতাদের জেলে পোরা হয়। অবশ্য পরে তারা মুক্তি পায়।

যারা বেঁচে ফেরেনি

‘হলোকাস্ট’ বললেই ফিরে ফিরে আসে কয়েকটা শব্দ। ইহুদি, নাৎসি, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, গ্যাস চেম্বার...

হলোকাস্ট এক বিভীষিকার সমনাম। এই শব্দের মানে হল আগুনে উৎসর্গ করা। প্রাচীন গ্রিসে দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য পশুকে আগুনে উৎসর্গ করা হত। ইহুদিদের কাছে হলোকাস্ট মানে ‘সোয়াহ’। বাংলা অর্থ ‘বিপর্যয়’।

কিন্তু বিপর্যয় কেন?

খ্রিস্টধর্ম শুরুর দিক থেকেই একটা প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে যে, ইহুদিরাই যিশু খ্রিস্টের বিরোধী তথা হত্যাকারী।

কারণ কী?

এক, রাজা হেরড। হ্যাঁ, এই রাজাই শিশু যিশুকে হত্যা করার জন্য ছল, বল এবং কৌশলের সার্বিক প্রয়াস করেছিলেন। সফল হননি সে কথা অবশ্য আলাদা।

দুই, যে রোমান কর্তৃপক্ষ যিশুর ক্রুশিফিকেশনের জন্য দায়ী ছিলেন, তাঁরা ইহুদি ছিলেন বলেই জানা যায়।

এরপর থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক বা মহামারী সব ক্ষেত্রেই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হত ‘ক্রাইস্ট কিলার’ ইহুদিদেরই। মোদ্দা কথা এই জাতিটাই হয়ে গিয়েছিল বলির পাঁঠা।

একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যাক পাঠক-বন্ধুরা। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব ঘটল। পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের ইহুদিদের সবার মতো সমান অধিকার দেওয়া হল। কিন্তু উনবিংশ শতকের পরে শিল্পায়নের খারাপ দিকগুলোর জন্য ইহুদিদের দায়ী করা হয়। গোটা ইহুদি জাতিকেই একটা সমস্যা হিসাবে দেখা হতে থাকে।

যুগে যুগে ইহুদিদের ওপর চরম অত্যাচার হয়েছে সারা বিশ্ব জুড়ে। কখনো ক্রুসেডে, কখনো স্প্যানিশ আক্রমণের সময়ে, আবার কখনো হলোকাস্টে।

হলোকাস্টের কথা বলতে গেলে যে ব্যক্তির নাম না করলে এগোনোই যাবে না সে হল অ্যাডলফ হিটলার। হিটলার মানেই ইহুদিদের ত্রাস। হিটলার মানেই ইহুদিদের যম।

কিন্তু এমন কী ঘটেছিল যার জন্য ইহুদি জাতিকে ধ্বংস করতে উঠে-পড়ে লাগল হিটলার?

দক্ষিণ জার্মানির অস্ট্রিয়া সীমান্তের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্রোনাউ গ্রামে হিটলারের জন্ম। বালক হিটলারের দারুণ ইচ্ছা ছিল ভিয়েনাতে আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার। দু’ বার চেষ্টা করেও সে আর্ট কলেজে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়েছিল। ঘটনাচক্রে সেই সময়ে আর্ট কলেজের শিক্ষকরা ছিলেন ইহুদি। ইতিহাসবিদেরা বলছেন, হিটলারের ইহুদি বিদ্বেষের সূত্রপাত সম্ভবত এখান থেকেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী করা হয়। জার্মানিকে ভার্সাই-এর চুক্তি সাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানির যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের

সীমা ও সৈন্যবাহিনীতে সেনার সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। শুধু কি এটুকুই? স্থির হয়েছিল যে, জার্মানি ক্ষতিপূরণ হিসাবে ফ্রান্সকে প্রতি বছর দেবে ৮০ লক্ষ পাউন্ড। এই চুক্তি জার্মানির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙে দিয়েছিল।

১৯৩৩ সালে জার্মানিতে হিটলারের নাৎসি পার্টি ক্ষমতায় এল। জার্মান রাষ্ট্রপতি পল ভন হিন্ডেনবুর্গ হিটলারকে জার্মানির চ্যান্সেলর পদে বসালেন। আর হিটলার ক্ষমতায় এসেই শুরু করে দিল ইহুদিদের প্রতি বিষোদগার।

ঠিক কী বলেছিল হিটলার?

জার্মানির দুরবস্থার জন্য ইহুদিরাই দায়ী।

হিটলার জার্মানির সবকিছু হতে চেয়েছিল। তাই চ্যান্সেলর হওয়ায় পরপরই সে নতুন করে নির্বাচনের ডাক দেয়- যাতে জার্মান পার্লামেন্ট রাইখস্ট্যাগকে পুরোপুরি কবজা করতে পারে। অন্য পার্টির নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। বিরোধীদের সমস্ত মিটিং, মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন ১৯৩৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি রাইখস্ট্যাগ বিল্ডিংয়ে আগুন লাগে। অনেকেই এই আগুনের জন্য নাৎসি পার্টিকেই দায়ী করে। নাৎসিরা অবশ্য বলেছিল, এই ঘটনা কমিউনিস্টদের কাজ। এই ঘটনার পর জার্মানির গণতন্ত্রের পতন ঘটে। রাইখস্ট্যাগের অগ্নিকাণ্ডের পরের দিনই নাগরিকদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয় ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়। ৫ মার্চের ভোটে ৪৪% ভোট পায় নাৎসি পার্টি। কনজারভেটিভদের সাহায্য নিয়ে তারা সরকার গঠন করে। ২৩ মার্চ আইন পাশ করে হিটলারকে ডিক্টেটরশিপ চালানোর বৈধতা দেওয়া হয়।

জার্মানিতে সিগমন্ড ফ্রয়েড, ম্যাক্সিম গোর্কি, আঁরি বারবুস, হাইনরিখ হাইনে, আইনস্টাইন, বের্টোল্ট ব্রেখট, টমাস মান, জ্যাক লন্ডনের বই নিষিদ্ধ ঘোষণা

করা হয়। এই সময় জার্মানির প্রথম সারির লেখক, বিজ্ঞানী ও শিল্পীরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। প্রাণ বাঁচাতে আইনস্টাইন ও ব্রেখটের মতো অনেকেই জার্মানি থেকে বেরিয়ে আসেন।

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে গঠন করা হয় গেস্টাপো বাহিনী বা এসএস পুলিশ (সেক্রেট স্টেট পুলিশ)। ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এসএস বাহিনী যে কোনো ব্যক্তিকে যে কোনো মুহূর্তে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা পায়।

পুলিশবাহিনীর সাহায্যে হিটলার বিরোধীদের শাসাত, মারধোর করত, এমনকী কনসেনট্রেশন ক্যাম্পেও পাঠাত। মিউনিখের বাইরে ডাখাউ নামক স্থানে রাজনৈতিক বন্দিদের রাখার জন্য এই কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বানানো হয়েছিল। পরবর্তীতে এরকম কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলো ইহুদিদের গণহত্যা বা মাস কিলিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৯৩৪ সালের শেষের দিকে হিটলার ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করল। নাৎসিরা অভিযোগ তুলল যে, ইহুদিরা নাকি জার্মান জাতিকে কলুষিত করেছে। জিগির উঠল, 'ইহুদিরা শয়তান! ওরা কাপুরুষ!' জার্মানরা প্রোপাগান্ডা ছড়াতে আরম্ভ করে দিল যে তারা কর্মঠ, সাহসী ও সৎ।

সেই সময় জার্মানিতে প্রথম সারির সাংবাদিক, লেখক, অভিনেতা, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানীরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন ইহুদি। খুব স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা হয়ে উঠলেন

নাৎসিদের চক্ষুশূল।

এরপর এল হিটলারের 'আর্য তত্ত্ব'। নাৎসিরা জোর গলায় প্রচার চালাতে থাকল যে, জার্মানরা হল আর্য। জার্মানরা হল শ্রেষ্ঠ। আর যেহেতু জার্মানরা উন্নত একটি জাতি তাই জার্মানিকে শাসন করবে একমাত্র জার্মানরাই। ডারউইনের তত্ত্বকে সামনে রেখে তারা বলতে আরম্ভ করল, শক্তিশালী জার্মানরাই একমাত্র টিকে থাকবে, আর দুর্বল ও মিশ্র ইহুদি নামক জাতিটি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে ইহুদিরা সবসময় একটা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। ইহুদিদের লেখা সমস্ত বই পুড়িয়ে দিতে লাগল নাৎসিরা।

দেশের যুবসমাজের কাছে জনপ্রিয় হওয়ার জন্য হিটলার একটা নতুন পদক্ষেপ নিল। ইহুদিদের সরকারি চাকরি থেকে বিতাড়িত করে বেকার জার্মান যুবকদের নিয়োগ করা শুরু হল। ইহুদি আইনজীবীদের আদালতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হল। ইহুদি ডাক্তারদের হাসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দিল জার্মানরা। বন্ধ করা হল তাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসও। স্কুল ও কলেজগুলো থেকে ইহুদি ছাত্র-ছাত্রীদের তাড়ানো হল। ইহুদিদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল জার্মান গভর্নমেন্ট। সমস্তরকম পাবলিক ইভেন্ট থেকে ইহুদিদের বহিষ্কার করল জার্মান সমাজ।

১৯৩৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ন্যুরেমবার্গ আইন পাশ করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে জার্মান সংস্কৃতি থেকেই ইহুদিদের বাদই দিয়ে দেওয়া হয়। অনেক দোকানে, হোটেলে সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখা গেল— 'কুকুর ও ইহুদিদের প্রবেশ নিষেধ।' এভাবেই হিটলার নিরন্ন, বেকার 'আর্য' জার্মানদের চিন্তাশক্তিকে বিপথে চালিত করে তাদের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে।

পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের হিন্দুদের বিতাড়ন মনে পড়ে কি?

সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানুষকে রাষ্ট্রশক্তি বাধা দেয়নি। সেইরকম ভাবেই সারা জার্মানির এই কর্মকাণ্ডকে হিটলার নীরবে অনুমোদন দিয়েছিল। আর হিটলার তা করেছিল কেবল ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থে। আর এসবের ওপরে ছিল নাৎসিদের নৃশংস দমননীতি। কেউ প্রতিবাদ করলেই তাকে হত্যা করা হত। ইহুদিদের এত দিনের প্রতিবেশী জার্মান পরিবার নির্লজ্জভাবে ইহুদিদের সম্পত্তি গ্রাস করতে আরম্ভ করে দিল। ঠিক যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানুষ বিতাড়িত হিন্দুদের জমি-বাড়ি আত্মসাৎ করে নিয়েছে কিংবা এই ভারতভূমিতেই কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ঘরবাড়ির দখল নিয়েছিল সেখানকার সংখ্যাগুরুরা।

এখানে একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। সেই সময় জার্মানিতে দু' থেকে আড়াই লক্ষ ইহুদি ছিল অত্যন্ত ধনী। ইহুদিরা জার্মানি ও পোল্যান্ডে বসবাস করছে স্মরণাতীত কাল থেকে। নিজেদের নিষ্ঠা, বিদ্যা ও বুদ্ধির দ্বারা তারা এই ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছে। নাৎসিরা বুঝেছিল যে, ওদের খতম করতে পারলেই সব সম্পদ চলে যাবে তাদের হাতে। আর জার্মানির অর্থনীতির যা হাল ছিল, তাতে এই সম্পদের জন্য মরিয়া ছিল নাৎসি পার্টি।

ভয়ভীত ইহুদিদের পলায়ন আরম্ভ হল জার্মানি থেকে। কয়েক হাজার ইহুদি পালিয়ে গেল বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও হল্যান্ডে। জার্মানির বাইরে বেরোনো কিন্তু খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। যা কাগজপত্র জোগাড় করতে হত, তাতেই লেগে যেত কয়েক মাস।

জার্মানির অন্দরমহলের এই খবর জানাজানি হতেই চাপানউতোর শুরু হয় বাইরের

বিশ্বে। ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে ফ্রান্সের এভিয়ান শহরে ৩২টি দেশের প্রতিনিধি সম্মিলিত হলেন জার্মানির নাৎসি পার্টির কারণে তৈরি হওয়া উদ্বাস্তু-সমস্যার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য।

কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে কোনো সমাধান বেরোল না। আর ওদিকে হিটলারও বুঝে গিয়েছিল যে, ইহুদিদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই এবং ইহুদিদের নিকেশ করার পথ একদম মসৃণ। ১৯৪১ সালের মধ্যে ইউরোপের দেশগুলো ইহুদিদের জন্য তাদের দরজা বন্ধ করে দেয়। খাঁচায় আটকানো ইঁদুরের মতোই অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইহুদিদের। না পারছিল জার্মানিতে থাকতে, না পারছিল সেখান থেকে বেরোতে।

১৯৩৮ সালের ৭ নভেম্বর প্যারিসে এক ইহুদি বালকের হাতে গুলিবিদ্ধ হন জার্মান দূতাবাসের কর্তা আর্নেস্ট ভম রথ। ৯ নভেম্বর তার মৃত্যু হয়। আগুনে যেন ঘি পড়ল! জার্মানিতে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ামাত্র হিংসা ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। এরপর নাৎসি বাহিনী বার্লিন শহর ও অন্যত্র সুপরিকল্পিতভাবে ইহুদিদের ৭,৫০০টি দোকান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর ও লুঠপাট চালায়। ইহুদিদের ১০১টি উপাসনাস্থল পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ৭৬টি উপাসনাস্থল গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। অনেক ইহুদিকে হত্যা করা হয়। ৩০,০০০ ইহুদিকে গ্রেপ্তার করে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। সারা রাত ধরে এই ধ্বংসলীলা চলে। এই ধ্বংসলীলার পরে শহরের রাজপথে যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই ছড়িয়ে রয়েছিল শুধু ভাঙা কাচের টুকরো। এই ঘটনা বার্লিনের ইতিহাসে 'আ নাইট অব ব্রোকেন গ্লাস' নামে কুখ্যাত হয়ে আছে।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস। জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করল। আরম্ভ হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সেই সময় পোল্যান্ডের জনসংখ্যার প্রায় ১০% ছিল ইহুদি, সংখ্যায় প্রায় ৩০ লক্ষ। ১৯৪০ সালে নাৎসিরা পোল্যান্ডের ইহুদিদের জন্য তৈরি করল 'ঘেটো'।

এই ঘেটো জিনিসটা কী?

'ঘেটো' হল কাঁটাতার ঘেরা এমন এক একটা মহল্লা যেখানে গাদাগাদিভাবে ইহুদিদের থাকতে বাধ্য করা হত। ঘেটোর কোনো বাসিন্দা যদি জার্মান জাতির তথাকথিত আর্য পুণ্যভূমিতে আসতে চাইত, তবে তাকে ঘেটো কাউন্সিল জুডেনরাটের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে হত। সারা দিনমানে বাইরে যে যেখানেই থাকুক না কেন সূর্যাস্তের আগেই ফিরে যেতে হত তাদের ঘেটোতে। এই ঘেটোগুলোতে না ছিল পর্যাপ্ত খাবার, না ছিল পান করার মতো জল কিংবা শৌচাগারের ব্যবস্থা। কত ইহুদি যে এই ঘেটোতে অনাহারেই মরেছে তার ইয়ত্তা নেই।

কিন্তু সব পাত্রের মতোই ঘেটোর ধারণ ক্ষমতাও তো ছিল নির্দিষ্ট। তাহলে ঘেটো উপচে পড়লে ইহুদিদের কী হত?

সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে নাৎসিরা তাদের পাঠিয়ে দিত ডেথ ক্যাম্পে। ডেথ ক্যাম্পের কথায় পরে আসছি সুধী পাঠক।

হিটলার চারটি ঘাতক দল তৈরি করে।

১. আইনজাটসগ্রুপেন এ
২. আইনজাটসগ্রুপেন বি
৩. আইনজাটসগ্রুপেন সি

৪. আইনজাটসগ্রুপেন ডি

প্রত্যেকটা দলে কয়েকটা করে কমান্ডো ইউনিট থাকত। এরা এক একটা শহর থেকে ইহুদিদের ধরে ধরে আনত। তারপর আগে থেকে খুঁড়ে রাখা গর্তের সামনে তাদেরকে বিবস্ত্র করে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে পরপর গুলি করে হত্যা করা হত। হত্যার পর তাদের সেই গর্তেই পুঁতে দেওয়া হত।

পোল্যান্ড আক্রমণের আগে হিটলার রাশিয়ান রাষ্ট্রনায়ক স্ট্যালিনের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করে। ১৯৪০ সালে জার্মানি পদানত করে ডেনমার্ককে। তারপরে তাদের আক্রমণের অভিমুখ হয় নরওয়ে। একে একে জার্মানি গিয়ে দখল করে নিল হল্যান্ড ও বেলজিয়াম। জার্মানির আক্রমণের মুখে পড়ল ফ্রান্স। হিটলারের দুর্ধর্ষ পানজার বাহিনীর হাতে ফ্রান্স পদানত হল ২২ জুন। এরপর হিটলারের নিশানায় এল ব্রিটেন। দীর্ঘ এক বছর ধরে যুদ্ধ চলার পরও হিটলার ব্রিটিশদের পরাজিত করতে পারল না। লন্ডনে নিরবচ্ছিন্ন কার্পেট বম্বিং করেও হিটলার চার্চিলকে নতজানু করতে পারেনি।

১৯৪১ সালের জুন মাস। অনাক্রমণ চুক্তিকে ছুড়ে ফেলে দিল হিটলার। আক্রমণ করল সোভিয়েত ইউনিয়নকে। ঐতিহাসিকরা একে হিটলারের চরমতম মূর্খতা বলে বর্ণনা করেন। রাশিয়া ভূমির শীতের প্রবল দাপটের কথা সম্ভবত হিটলার বুঝতে পারেনি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে জার্মানির আক্রমণের পাশাপাশি আইনজাটসগ্রুপেন পূর্ব পোল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং লাটভিয়াতে ইহুদি গণহত্যা চালাতে থাকে। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত এরা প্রায় ১৩ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করে।

১৯৪২ সালের ২০ জানুয়ারি জার্মান সরকারের উচ্চ আধিকারিকরা বার্লিনের অদূরে ওয়ানসি নামক স্থানে একটা বৈঠক করে। এই বৈঠক করার জন্য ১৯৪১ সালের ৩১ জুলাই নাৎসি নেতা হারমান গোয়েরিং এসএস আধিকারিক রাইনহার্ড হেডরিখকে আদেশ দিয়েছিল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ১৫ জন উচ্চপদস্থ নাৎসি আমলা, যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল রাইনহার্ড হেডরিখ ও অ্যাডলফ আইখম্যান। আইখম্যান ছিলেন রাইখ সেন্ট্রাল সিকিউরিটি অফিসের 'চিফ অফ জিউস অ্যাফেয়ার্স'। এই ওয়ানসি কনফারেন্সে ইহুদিদের পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। আর এই পরিকল্পনা দেখাশোনার দায়িত্ব নিল হেনরিখ হিমলার।

১৯৪২ সালের মধ্যেই নাৎসিরা পোল্যান্ডে ছ'টা ডেথ ক্যাম্প তৈরি করে চেলমুনো, বেলজেক, সবিবর, ট্রেব্লিঙ্কা, মাজদানেক ও আউসভিৎস। সব ক'টা ডেথ ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছিল রেললাইনের ধারে যাতে ইহুদিদের রোজ রেলগাড়ি বোঝাই করে আনা যায়। একটা নির্দিষ্ট বিন্দু পর্যন্ত ইহুদিদের পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। সেখানে জড়ো হওয়া ইহুদিদের ঠেসে ঠেসে ঢোকানো হত মালগাড়ির কামরায়। যে বিন্দু অবধি আনার পর ইহুদিদের মাথাটাকা ক্যাটল-ওয়াগনে তোলা হত, তাকে জার্মানরা নিজেদের ভাষায় বলত 'উমশ্লাগপলাজ'— যার অর্থ 'কালেকশন পয়েন্ট'। দু-তিন দিন টানা চলত মালগাড়িগুলো। বিভীষিকাময় এই যাত্রায় অনেকেই দমবন্ধ হয়ে মারা যেত। আর যারা বেঁচে থাকত, তাদের পাঠানো হত গ্যাস চেম্বারে।

এই ক্যাম্পগুলোর মধ্যেও ভাগ ছিল। কিছু ছিল ইহুদিদের বেগার খাটানোর ক্যাম্প, কিছু ছিল ট্রানজিট ক্যাম্প; আর ছিল কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ও তার শাখা। তবে যতরকম ভাগই থাকুক না কেন, প্রত্যেকটি ক্যাম্পই ছিল নৃশংস। জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার মূল কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলোর মধ্যে ছিল রাভেনসব্রুক, নয়ে গামে, বেরগেন-বেলসেন,

জাকসেন-হাউসেন, গ্রসরোজেন, বুখেনভাল্ড, থেরেজিয়েনস্টাট, ফ্লোর্সেনবুর্গ, নাসভাইলার, দাখাউ, মাউটহাউজেন, টুটহফ ও নর্ডহাউসেন।

নাৎসিদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সমস্ত দেশগুলির ইহুদিদের বাহুতে ধারণ করতে হত বিশেষ শনাক্তিকরণ চিহ্ন। হলুদ রঙের চওড়া ফেট্টি— তার মাঝখানে কালো কালিতে আঁকা আদি পুরুষ ডেভিডের ঢাল। দুটি সমবাহু ত্রিভুজ, একে অপরের গায়ে উলটো ভাবে চাপানো। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু সব্বাইকে এই ফেট্টি পরতে হত যাতে দূর থেকেই 'আর্য' নাৎসি জার্মানরা বুঝতে পারে ওটা মানুষ নয়, জিউ বা ইহুদি!

নাৎসি শাসন তো কেবল জার্মানিতে আবদ্ধ ছিল না, ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ইউরোপে। একটা রোগের মতোই। তারা গড়ে তুলেছিল একটা সুবিশাল ক্রীতদাস-সাম্রাজ্য। বেগার খাটাত ইহুদিদের। খাটলে খিদেও যে পায়! খেতে চাইত ইহুদিরা, দুই হাত পেতে। 'রুটি দাও! জল দাও!' প্রার্থনায় মুখর হয়ে উঠত দাসভূমি।

বদলে কী মিলত?

জলের মতো পাতলা স্যুপ আর এক খণ্ড পাঁউরুটি।

ওতে কি আর খিদে মেটে? তৃষ্ণা কমে? তবুও, প্রাণরক্ষার জন্য খেতেই হত। জার্মানরা দুটো বিকল্প তুলে ধরেছিল ইহুদিদের সামনে—

১. হয় জার্মানির দ্বারা বিজিত ভূমির বাইরে পালাও অথবা
২. এখানেই থাকো। ক্রীতদাস হয়ে থাকো। আমৃত্যু!

প্রথম পন্থা বাছলে নিজের ভিটেমাটি, টাকাপয়সার মায়া ত্যাগ করে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো শুধু একটাই বস্তু— পিতৃপ্রদত্ত প্রাণটুকু। এর অন্যথা করলে পাসপোর্ট পাবে না। লুকিয়ে কিছু নিয়ে পালাবার রাস্তাই ছিল না, শহরে সেসব জিনিস নাৎসিদের চোখ এড়িয়ে গেলেও সীমান্তের ছাঁকনিতে ধরা পড়তই।

আর যারা গেল না? দ্বিতীয় পথের লোকেরা? তাদের কী হল?

তাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে আরম্ভ করে দিল গেস্টাপোর কুকুরেরা। নাৎসি পশুর দল সেই অভিযানগুলোকে বলত— অ্যাকটিয়ন। জিউদের গায়ে ছেড়ে দেওয়া হত পুলিশের কুকুর। চালানো হত বন্দুকের বাট। উফ! সে কী অত্যাচার বন্ধুরা! ভাষায় বর্ণনা দেওয়া কঠিন।

শুধু যে জিউদের পাড়ায় গেস্টাপোরা অ্যাকটিয়ন চালাত তা-ই নয়। এই অভিযান চলত ঘেটোতেও। হঠাৎ করে সশস্ত্র বাহিনী এসে ঘেটো থেকে কয়েকশো ইহুদিকে কোথায় যেন তুলে নিয়ে চলে যেত। যারা রয়ে যেত, তারা জিজ্ঞেস করত, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ওদের?'

বাহিনীর পক্ষ থেকে মুখ খোলা হত না। উত্তর দিত আধিকারিকেরা। এদের মধ্যে আবার কিছু বিশ্বাসঘাতক তথা নাৎসিদের পা-চাটা জিউও ছিল। তারা বলত, 'পোল্যান্ডের পূর্ব দিকটাতে ইহুদিদের জন্য মহল্লা বসাচ্ছেন হিটলার।'

'ইহুদিদের মহল্লা? শুধু ইহুদিদের? কেন?'

‘ওই যে, যার সন্ধানে হাজার হাজার বছর আগে আফ্রিকা থেকে সিনাই পর্বতের দিকে রওনা দিয়েছিলেন আব্রাহাম, মোজেস— প্রমিসড ল্যান্ড অব জিউস!’

ধর্মপ্রাণ জিউদের মাথা নুউয়ে আসত এসব পবিত্র নাম শুনে। আশ্বস্ত চোখগুলো বুজে তারা বলত, ‘হিটলার তাহলে ভালোই করছেন। আমাদের হিল্লে হবে।’

কেউ কেউ বলত, ‘তা অমন গুঁতিয়ে, পিটিয়ে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার বাপু? ভালো করে বুঝিয়ে বললেই তো পারে। আমরা কি আর যাব না?’

নিয়ে যাওয়া হত বটে, কিন্তু তারা আর ফিরত না।

ডেথ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার পরে কী হত?

সেখানে তাদের হাতে একটা উলকি চিহ্ন এঁকে দেওয়া হত, যা আদপে ছিল একটা সংখ্যা। তারা নিজেদের নাম ভুলে গিয়ে এক একটা সংখ্যায় পরিণত হত। ডেথ ক্যাম্পে তাদের জামাকাপড় ও জিনিসপত্র সব কেড়ে নিত নাৎসি সৈন্যরা। ন্যাড়া করে দেওয়া হত মাথা। এসএস আধিকারিকেরা মাইকে ঘোষণা করত: ‘পাশের কক্ষে প্রবেশ করুন। আপনাদের কোনো ভয় নেই। কারো, কোনো ক্ষতি হবে না। ওই কক্ষে প্রবেশ করার পর দরজা বন্ধ হলে গভীর ভাবে শ্বাস নেবেন। এতে আপনাদের ফুসফুস পরিষ্কার হবে। বাড়বে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা। যান, যান, ঢুকে পড়ুন!’

প্রত্যেক ইহুদিই বুঝতে পারত কী ঘটতে চলেছে। কারণ ‘কক্ষ’ নামক গ্যাস চেম্বারের পাশেই বিশেষ চুল্লিতে নিহত ইহুদিদের পোড়াবার ব্যবস্থা থাকত। সেই ঘর থেকে চামড়াপোড়ার কটু গন্ধ এসে ঝাপটা দিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর নাকে-মুখে। কিন্তু নিয়তির লেখা কে খণ্ডাতে পারে? শেষে গ্যাস চেম্বারে পাঠিয়ে তাদেরকে হত্যা করা হত। প্রায় ৩৫ লক্ষ ইহুদিকে এভাবে এই ডেথ ক্যাম্পগুলিতে হত্যা করা হয়েছিল।

কর্মক্ষম ইহুদিদের অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হত না। যুদ্ধের বাজারে তখন জার্মানদের প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল। তাদেরকে জার্মানির অস্ত্র তথা অন্যান্য কারখানায় খাটাত নাৎসির দল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদেরকে দিয়ে আমানুষিক পরিশ্রম করানো হত। বিনিময়ে পর্যাপ্ত খাবার বা আশ্রয় কোনোটাই দেওয়া হত না। কয়েক হাজার ইহুদি অনাহারে ও অর্ধাহারে এই পরিশ্রমের ধকল সহ্য করতে না পেরে মারা যায়।

একদা রাশিয়ার শীতের কথা বুঝতে পারেননি নেপোলিয়ান। পোড়ামাটির নীতির সামনে নতজানু হতে হয়েছিল তাঁকে। আর হিটলার তো মন দিয়ে পড়াশোনা করেনি, তাই নেপোলিয়ানের এই ঐতিহাসিক ভুল সে জানতেও পারেনি। আগেই বলা হয়েছে প্রবল শৈত্য হারিয়ে দিয়েছিল হিটলারের বাহিনীকে। যুদ্ধের শেষের দিকে হিটলারের বাহিনী সোভিয়েত লাল ফৌজের কাছে পিছু হটতে থাকে। এবার নাৎসিদের টনক নড়ল। তারা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছিল যে, তাদের এই কুকীর্তিগুলো দুনিয়ার সামনে চলে এলে কী হতে পারে। তারা চাইছিল ইহুদিদের সমাধিগুলো যেন কোনো ভাবেই বাইরের দুনিয়া না দেখে। তারা সমাধি থেকে দেহগুলোকে বের করে আনে। তারপর সেগুলোকে আগুনে ভস্মীভূত করে। ডেথ ক্যাম্পগুলোকে মানচিত্র থেকে মুছে দেয়। তবুও শেষ রক্ষা হল না। ১৯৪৫ সালের ২৭ জানুয়ারি লাল ফৌজ আউসভিৎসকে মুক্ত করে। এই আউসভিৎস এত কুখ্যাত ছিল যে হলোকাস্ট আর আউসভিৎস প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় যখন অবশ্যম্ভাবী তখন জার্মান এসএস বাহিনী ও

পুলিশের অত্যাচার চরম সীমা অতিক্রম করে। তারা বন্দিদের নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বাকি বন্দিদের তারা পশ্চিম দিকে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদেরকে পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। কয়েকশো মাইল পর্যন্ত হাঁটতে হত বন্দিদের। ধকল সহ্য করতে না পেরে অনেকে পথেই মারা পড়ে। যারা পালানোর চেষ্টা করে, এসএস বাহিনী তাদের কুকুরের মতো গুলি করে হত্যা করে। এই যাত্রা খুব স্বাভাবিকভাবেই 'ডেথ মার্চ' নামে পরিচিত হয়। পশ্চিমে তখন পর্যন্ত জার্মানির দখলে থাকা এলাকার ক্যাম্পে পৌঁছায় বেঁচে থাকা ইহুদিরা। এখানে পৌঁছানোর পরেও বহু বন্দি কেবল ধকল সইতে না পেরেই মারা যায়।

ডেথ ক্যাম্পগুলোকে ধীরে ধীরে মিত্রশক্তির বাহিনী মুক্ত করতে থাকে। ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল হিটলার আত্মহত্যা করে। ওই বছরই মে মাসের গোড়ার দিকে জার্মানি আত্মসমর্পণ করল। বেঁচে থাকা ইহুদিদের জন্য তৈরি হয় ডিসপ্লেসড পার্সন্স ক্যাম্প। ইহুদিরা তখন এতটাই আতঙ্কিত যে কেউই আর নিজেদের বাড়িতে ফিরতে রাজি হয়নি। ইহুদিবিদ্বেষী প্রতিবেশীদের ভয়ে তারা ওমুখো হতে নারাজ ছিল। তারা ওই ক্যাম্পেই দিন কাটাতে থাকে। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা ধীরে ধীরে সেখানে চলে যায়। এভাবে শেষ ক্যাম্পটি বন্ধ হয় ১৯৫৭ সালে।

একদা জার্মানির অধীনস্থ এই দেশগুলোতে ইহুদিদের হত্যা করা হয়েছিল—- আলবানিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, এস্তোনিয়া, ফ্রান্স, গ্রিস, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, ইতালি, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পোল্যান্ড ও রোমানিয়া। জার্মানি, জার্মানির অধীনে থাকা দেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মিলিয়ে মোট ৬২,৫৮,৬৭৩ জন ইহুদিকে হত্যা করা হয় বলে একটা আন্দাজ পাওয়া গেছে। এই সংখ্যাটি কিন্তু আনুমানিক। কারণ বহু হত্যার কোনো নথিই নেই এবং তাদের দেহও উদ্ধার হয়নি। তাই মৃতদের সঠিক সংখ্যা আর কোনোদিনই জানতে পারা যাবে না।

যুদ্ধ শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্স নাৎসিদের বিচারের উদ্যোগ নেয়। রাষ্ট্রসংঘের ১৯টি প্রধান দেশ এই উদ্যোগকে সমর্থন করে। জার্মানির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর ন্যুরেমবার্গের ঐতিহ্যমণ্ডিত বিচারালয় ভবনে বিচারের কাজ শুরু হয় ১৯৪৫ সালের ২০ নভেম্বর থেকে। এই বিচার 'ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল' হিসাবে পরিচিত এবং সেটাও নজির তৈরি করেছে।

জার্মানির নাৎসি দলের এবং সরকারের ২২ জন কর্মকর্তার বিচার শুরু হয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি ছিল—

১) সমস্ত ধরনের অপরাধে জড়িত থাকা
২) শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ ৩) যুদ্ধাপরাধ
৪) মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

১৯৪৬ সালের ১৬ অক্টোবর রায় ঘোষণা করা হয়। ১৪ জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

আলাদা করে বলার মতো বিষয় হল ১৯৬১ সালে অ্যাডলফ আইখম্যানের বিচার হয় জেরুসালেমে। আর্জেন্টিনাতে বসবাসরত অবস্থায় ইসরায়েলি সিক্রেট এজেন্টরা তাকে অপহরণ করে জেরুসালেমে নিয়ে যায়। বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। আর এই বিচার চলাকালীনই গোটা বিশ্বের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় হলোকাস্ট।

ইউনাইটেড নেশন ২৭ জানুয়ারিকে ‘হলোকাস্ট মেমোরিয়াল ডে’ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইসরায়েল হলোকাস্ট ভিকটিমদের স্মৃতিরক্ষার্থে তৈরি করেছে ‘য়াদ ভাসেম’।

পৃথিবীতে গণহত্যার বিষয় নতুন কিছু নয়। কিন্তু একটা জাতিকে পুরোপুরি পৃথিবী থেকে মুছে দেওয়ার এই পৈশাচিক প্রয়াস সম্ভবত আগে কখনো হয়নি আর ভবিষ্যতেও হয়তো হবে না। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ ইহুদি চিরতরে হারিয়ে গেছে এই নারকীয় হত্যালীলায়। ইতিহাসে হলোকাস্ট এক কলঙ্কিত অধ্যায়। হলোকাস্টের দোষীদের আদালতে শাস্তি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মানবজাতি কখনোই তাদের ক্ষমা করতে পারবে না। আর ইসরায়েলিরা তাদের ভুলবে না। কারণ তারা বলে, ‘আমরা কক্ষনো ভুলি না!’

এ লড়াই বাঁচার লড়াই

সারি সারি গাড়ি এগিয়ে চলেছিল জেরুসালেমের দিকে। মুহুর্মুহু উঠছিল আনন্দধ্বনি। অনেক গাড়ি আবার ফুল দিয়ে সাজানো। ঘাবড়াবেন না সুধী পাঠক! এটা কোনো বরযাত্রীর দলের কথা নয়। যুদ্ধে যাচ্ছিল আরবদের বিরাট বাহিনী।

কাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ?

অবশ্যই ইসরায়েল। ইউনাইটেড নেশনসের সমর্থনে সদ্য গঠিত দেশ ইসরায়েল তখন আরবদের সামনে নেহাতই এক শিশু। যুদ্ধে যাওয়ার আগেই তাই আরবরা ধরে নিয়েছিল যে, তারা হেলায় হারিয়ে দেবে ইহুদিদের। তাই এত আনন্দ, এত আয়োজন।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল ৫টি আরব দেশ- মিশর, জর্ডন, ইরাক, লেবানন ও সিরিয়া। মিশর আগেই ইসরায়েলকে ধ্বংস করার হুমকি দিয়ে রেখেছিল। ইসরায়েলের পাশে কেউ নেই তখন। ইউনাইটেড নেশনস নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করাটাকেই বেশি শ্রেয় মনে করল। জর্ডনের আরব বাহিনীর প্রধান তখন ব্রিটিশ লেফটেন্যান্ট জেনারেল— স্যর জন বাগট গ্লুব। সুতরাং ব্রিটিশরা এতে নাক গলাবে না এটাই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। জেনারেল জর্জ ক্যাটলেট মার্শাল জুনিয়র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানকে পরিস্থিতির খতিয়ান দিলেন। তাঁর মতে ইসরায়েলের উচিত স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন ভুলে আরবদের সঙ্গে সমঝোতা করা। কারণ আরবদের বিরাট সেনাবাহিনী ও উন্নত সমরাস্ত্রের সম্মুখে ইসরায়েল খুব সহজেই পরাস্ত হবে। আর তারপর আরবরা ইহুদিদের মেরেকেটে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে। ইসরায়য়েলের প্রধানমন্ত্রী তখন ডেভিড বেন-গুরিয়ন। আরবদের কাছে তিনি কিছুতেই মাথা নত করবেন না। সবরকম বিপদের কথা জেনেও তিনি আরবদের সঙ্গে সংঘর্ষে যাওয়ার সিদ্ধান্তেই অটল রইলেন।

ব্রিটিশরা প্যালেস্টাইন থেকে বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে আরব বাহিনী ইসরায়েলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জেনারেল জন গ্লুব, পদাধিকারবলে যিনি তখন গ্লুব পাশা, ঘোষণা করলেন— 'এই যুদ্ধ এক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে এবং তারপর আমরা ইহুদিদের তুলে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে সলিলসমাধি দেব।'

এই কথার মধ্যে যে কেবল অহংকার ছিল তা কিন্তু নয়। সত্যিই পরিস্থিতি এমনটাই ছিল তখন। আরবদের ঠেকানোর জন্য মাত্র ১৯ হাজার সেনা ছিল ইসরায়েলের হাতে। কী হবে ১৯ হাজারের বাহিনী দিয়ে? এদের মধ্যে আবার অনেক এমন সৈন্যও ছিল, যারা এর আগে কোনোদিন বন্দুক ছুঁয়েও দেখেনি। আর ওদিকে আরবদের কাছে কেবলমাত্র খাতায়-কলমেই ছিল ১,৬৫,০০০ জন সেনা।

ফারাকটা বুঝুন বন্ধু!

আরবদের আধুনিক অস্ত্রের কাছে ইহুদিরা পিছু হটতে থাকে। ২০ মে আরবরা ওল্ড জেরুসালেম দখল করে। ২৬ মে আরব বাহিনী দখল করে হুর্ভা স্কোয়ার। আর তারপর ডায়নামাইট লাগিয়ে তারা সেখানকার সিনাগগগুলোকে উড়িয়ে দেয়। য়িৎজাক রাবিন তখন একজন মিলিটারি অফিসার (হ্যাঁ, ইনিই পরে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হন)। তাঁর কথায়, '২১৩ জন ইহুদি রক্ষীর মধ্যে ৩৯ জন নিহত আর ১৩৪ জন আহত হয়েছিল। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। ওয়েস্টার্ন ওয়াল ইহুদিদের হাতছাড়া হল।'

ল্যাটরানের দুর্গ অবরোধ করে আরবরা পশ্চিম জেরুসালেমের সঙ্গে যোগাযোগের

সমস্ত পথ বন্ধ করে দিল। বেন-গুরিয়নের নির্দেশে ইহুদিরা চেষ্টা করেও ল্যাটরান নিজেদের দখলে আনতে পারল না। জেরুসালেমে অবরুদ্ধ ইহুদিরা তখন অনাহারে মরতে বসেছে। ল্যাটরানের দক্ষিণে জেরুসালেমকে সংযুক্ত করার জন্য একটা বাইপাস বানানো হল, পরে যার নাম দেওয়া হয় বার্মা রোড।

এরকম পরিস্থিতিতে ইউনাইটেড নেশনস মধ্যস্থতা করার একটা প্রয়াস করল। ইউনাইটেড নেশনসের মধ্যস্থতাকারী ফোক বার্নার্ডট একটা প্রস্তাব দিলেন। এই প্রস্তাবে জর্ডনের কিং আবদুল্লাকে গোটা জেরুসালেম সমর্পণ করার কথা বলা হয়। বলা বাহুল্য, বেন-গুরিয়নের ইসরায়েল এই প্রস্তাব পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করে দিল। এই সময় পশ্চিমের দেশগুলি নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করার জন্য আরব এবং ইসরায়েল দু' পক্ষকেই অস্ত্র বিক্রি করা বন্ধ রাখে। ইসরায়েল কিন্তু ব্যাপারটা আগে থেকেই আঁচ করে নিয়েছিল। তাই তারা চেকোস্লোভাকিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র কেনার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। চেকোস্লোভাকিয়া থেকে ইসরায়েলে অস্ত্র আনার কায়দাটিও ছিল অভিনব। তারা এর নাম দিয়েছিল 'অপারেশন বালাক'। ইসরায়েলি পাইলটরা রাতে বিমানে করে রাইফেল, মেশিন গান, ৭৫ মিমি আর্টিলারি ও ট্যাঙ্ক পরিবহন করে আনে। এই অপারেশনের কথা অবশ্য এই বইতেই অন্যত্র বিস্তারে করা হয়েছে।

ইউনাইটেড নেশনসের মধ্যস্থতার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর আবার শুরু হল যুদ্ধ। এর পরদিনই একটি মিশরীয় স্পিটফায়ার যুদ্ধবিমান পশ্চিম জেরুসালেমে বোমাবর্ষণ করল। আরব বাহিনী নরেডামের দিকে এগোল। তারা সেখান থেকে 'ডোম অফ রক' ও 'আল আকসা মসজিদ' দেখতে পাচ্ছিল।

কিং আবদুল্লা গ্লবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা জেরুসালেমকে ধরে রাখতে পারব তো?'

গ্লুব উত্তর দিলেন, 'ইহুদিরা আর কোনোদিনই জেরুসালেম ফেরত পাবে না।'

এবার খানিকটা চিন্তিত স্বরেই কিং আবদুল্লা বললেন, 'যদি তোমার মনে হয় ইহুদিরা জেরুসালেম দখল করতে পারে, তাহলে সেটা বলে ফেলো। তাহলে আমি নিজেই সেখানে যাব, আর দরকার পড়লে জেরুসালেম আয়ত্তে রাখার জন্য সেখানেই নিজের প্রাণ দিয়ে দেব!'

এদিকে ইসরায়েল যুদ্ধ চলাকালীনই নিজের সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে চলেছিল তাদের সৈন্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৮৮,০০০। তখন যুদ্ধরত আরব সৈন্যসংখ্যা প্রায় ৬৮,০০০। ইহুদিরা আরবদের দখলে থাকা লিড্ডা ও রামলা পুনর্দখল করল।

ইউএন-এর মধ্যস্থতাকারী বার্নার্ডট এবার আরেকটা প্রস্তাব রাখলেন জেরুসালেমকে আন্তর্জাতিক শহর করে দেওয়া হোক। ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি জেরুসালেম আসেন। জেরুসালেমকে আন্তর্জাতিক করার প্রয়াস জায়নিস্টদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার করে। লেহির সদস্যরা বার্নার্ডটকে চরম শিক্ষা দেওয়ার ছক কষল। বার্নাডট যখন ইসরায়েলের গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল, একটা চেকপয়েন্টে তাকে গুলি করে লেহির তিন সদস্যের একটা টিম। পরে হাসপাতালে বার্নার্ডট মারা যান। এই ঘটনার পর লেহিকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেওয়া হয়। কিন্তু রহস্যজনকভাবে, আততায়ীদের মধ্যে কেউই ধরা পড়েনি।

১৯১৮ সালে ব্রিটিশরা ও ইহুদিরা আরব জাতীয়তাবাদের শক্তিকে গুরুত্ব দেয়নি।

আর এবার আরবরা ইহুদিদের জাতীয়তাবাদের শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সেই একই ভুল করল। ইহুদিরা তাদের দেশ ও জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য মরণপণ লড়াইয়ে নেমেছিল। ইতিহাস সাক্ষী আছে, ইহুদিরা এই ভূমি রক্ষা করার জন্য অ্যাসিরীয়, মিশরীয়, স্যাসিনীয়, ব্যাবিলনীয়দের বিরুদ্ধে লড়েছে। তারা তিন বার বিদ্রোহ করেছে রোমানদের বিরুদ্ধে। সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটানোর সময় উপস্থিত হয়েছিল। নিজেদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করার মন্ত্র নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে নামা ইহুদি সেপাইদের উত্তেজনা তখন তুঙ্গে। আর এই মানসিকতা তাদের মধ্যে এনে দিয়েছিল এক অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস। এক ইঞ্চি জমি তারা ছাড়বে না! তারা কেবল এগোবে সামনের দিকেই, পিছিয়ে আসার কোনো প্রশ্নই ছিল না।

ইহুদিদের এই আত্মবিশ্বাস আরবদের বিস্মিত করল। তখন ওল্ড জেরুসালেমের প্রতিটি গলিতে চলছে লড়াই। ইহুদিরা ওল্ড জেরুসালেম দখল করার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। আরব বাহিনীর অগ্রগতিকেও তারা আটকে রেখে দিয়েছিল।

এরপর ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। সেপ্টেম্বর মাসেই ইসরায়েলি সেনা মিশরীয় সেনাকে পরাস্ত করে নেগেভ মরুভূমির এলাকা দখল করল। তারা মিশরীয় সেনাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরেও ফেলল। ইসরায়েলের কাছে এই পরাজয় মিশরের কাছে ছিল অত্যন্ত অপমানজনক। কারণ মিশরই প্রথমে হুমকি দিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিল। মিশরের পরাজয়ে বাকি আরব দেশগুলোও হতোদ্যম হয়ে পড়ে। যে যুদ্ধ এক সপ্তাহে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল তা কয়েক মাস চলার পরও শেষ হল না।

১৯৪৮ সালের নভেম্বরের শেষের দিকে জেরুসালেমের মিলিটারি কমান্ডার মোসে দয়ান জর্ডনের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতির চুক্তি করেন। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ইসরায়েল ৫টি আরব দেশের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই যুদ্ধবিরতির পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে ছিল ইউনাইটেড নেশনস। চুক্তি অনুসারে জেরুসালেমকে দু’ ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। ইসরায়েল পেল পশ্চিম দিকের অংশ আর আবদুল্লার কাছে রইল ওল্ড সিটি, জেরুসালেমের পূর্ব অংশ ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক। এই চুক্তিতে ইহুদিদের ওয়েস্টার্ন ওয়াল, দ্য মাউন্ট অফ অলিভস সিমেটেরি, কিদরন ভ্যালি টুমে আসার অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে এটা রয়ে যায় শুধু খাতায়-কলমেই। এই চুক্তির ১৯ বছর পর অবধি একজন ইহুদিকেও ওয়েস্টার্ন ওয়ালের সামনে প্রার্থনা করতে দেওয়া হয়নি। সিমেটেরিতে স্মৃতিস্তম্ভগুলোকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।

.

১৯৪৮ সালের যুদ্ধে পরাজয়ের অপমান কিন্তু মিশর ভোলেনি। এই যুদ্ধেরই একজন আহত সৈনিক ছিল গামাল আব্দেল নাসের এবং এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে ছিল বদ্ধপরিকর। নাসের আরবদের মধ্যে খুব শীঘ্রই একজন জনপ্রিয় নেতায় পরিণত হল। আরব দুনিয়ায় সে পরিচিত হল ‘আল রইস’ বা ‘বস’ নামে। সে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে তুলল জনতার মধ্যে। ১৯৫৪ সালে মোহম্মদ নাগিবকে সরিয়ে দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হিসাবে সে মিশরের ক্ষমতায় আসে।

ক্ষমতায় এসেই নাসের প্যালেস্টাইনের মাধ্যমে ইসরায়েলের ওপর আক্রমণে মদত দিতে থাকে। আর ইসরায়েলও সেই সব হামলার জবাব দিতে আরম্ভ করে। ১৯৫৬ সালে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফিদায়ে হামলাকারীদের ইসরায়েলে প্রবেশ করানো হয়। তারা রাতের অন্ধকারে নিরীহ মানুষকে হত্যা করে গা-ঢাকা দিতে পারদর্শী ছিল। সোভিয়েত অস্ত্র হাতে আসায় তারা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। নাসেরের নেতৃত্বে মিশর, জর্ডন ও সিরিয়া

ইসরায়েলকে ধ্বংস করার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ নিল। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রেডিওতে নাসের ইসরায়েলকে উদ্দেশ্য করে হুমকি দিল।

১৯৫৬ সালে মিশর চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে অস্ত্র ক্রয় চুক্তি করে। এই চেকোস্লোভাকিয়ার অস্ত্রই ইসরায়েল ব্যবহার করেছিল ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘটনা মেনে নেওয়া ইসরায়েলের পক্ষে কষ্টকর ছিল। মিশর চেকোস্লোভাকিয়ার কাছ থেকে ৩২০ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে ট্যাঙ্ক, বম্বার ও ফাইটার প্লেন কিনে নেয়।

চেকোস্লোভাকিয়ার কাছ থেকে সোভিয়েত অস্ত্র কেনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমেরিকা মিশরকে আসওয়ান ড্যাম তৈরিতে সহায়তা করতে অস্বীকার করে। ব্রিটেনও হাত গুটিয়ে নেয়। নাসের এবার একটা মোক্ষম চাল চালল। ১৯৫৬ সালের ২৬ জুলাই সুয়েজ ক্যানেলকে সে রাষ্ট্রায়ত্ব করার কথা ঘোষণা করে। সে আরও ঘোষণা করে যে, সুয়েজ ক্যানাল থেকে যে আয় হবে তা আসওয়ান ড্যাম তৈরির কাজে ব্যবহার করা হবে। নাসেরের এই ঘোষণা আরব বিশ্বে তাকে রাতারাতি নায়ক বানিয়ে দেয়।

এই ঘোষণায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি ইডেন প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। ১৮৬৯ সালে চালু হওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই এই ক্যানেল ব্যবহার করতে হত ব্রিটিশদের। সুয়েজ ক্যানেল কোম্পানির কাছে এটা ছিল তাদের সম্পত্তি চুরি যাওয়ার সামিল। কিন্তু নাসের নিজের সিদ্ধান্তে অনড় রইল।

মিশরের সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে চিন্তিত ছিল ইসরায়েল। আর ওদিকে ফ্রান্সের উপনিবেশ আলজেরিয়াতে বিদ্রোহীদের মদত দিচ্ছিল মিশর। সুতরাং ফ্রান্সও মিশরের ওপর চটে ছিল। ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইসরায়েল একটি গোপন চুক্তি সাক্ষর করে। সেই চুক্তি অনুসারে ইসরায়েল সুয়েজ ক্যানেলের কাছাকাছি গিয়ে নাসেরের বাহিনীকে আক্রমণ করবে। আর সেই সুযোগে ব্রিটেন ও ফ্রান্স, মিশর ও ইসরায়েলকে তাদের নিজের নিজের বাহিনী সুয়েজ ক্যানেল থেকে সরিয়ে নিতে বলবে। আর তার পাশাপাশি তারা আন্তর্জাতিক শিপিংয়ের জন্য সুয়েজ খালকে উন্মুক্ত করার জন্য মিশরকে চাপ দেবে।

কিন্তু এই আক্রমণ করার জন্য ইসরায়েল কী পাবে?

ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইসরায়েলকে যুদ্ধের সময় এয়ার কভার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। ইসরায়েলকে তারা আন্তর্জাতিক মঞ্চে সমর্থনের আশ্বাস জোগায়। ফ্রান্স ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ডিরেক্টর সাইমন পেরেস এই অস্ত্র সরবরাহের দিকটা দেখছিলেন। এদিকে নাসের তখন ফিদায়ে বাহিনীকে মদত দেওয়ার জন্য গাজা ভূখণ্ডে সেনা পাঠাচ্ছে। পেরেস জানতেন, নাসের যে কোনো মুহূর্তে ইসরায়েল আক্রমণ করতে পারে।

২৯ অক্টোবর বিকেল ৫:০০টার সময় ইসরায়েলি সেনা সিনাইতে প্রবেশ করে। প্রথমেই তারা সিনাইয়ের মিশরীয় এয়ারফোর্সের সঙ্গে তাদের হেডকোয়ার্টারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তারপর অ্যারিয়েল শ্যারনের নেতৃত্বে ইসরায়েলি প্যারাট্রুপার বাহিনী সিনাইয়ের মিতলা পাসের দিকে এগোয়। ৩০ অক্টোবর মরুভূমি এলাকায় তিনটি মিশরীয় মিলিটারি বেস দখল করার পর ইসরায়েলি বাহিনী সুয়েজ ক্যানেলের ৫০ কিমি দূরত্বের মধ্যে চলে আসে।

৩০ অক্টোবরই ব্রিটিশ সরকার ইসরায়েল ও মিশরকে সেনা সরানোর জন্য আলটিমেটাম জারি করে। কিন্তু মিশর এই আলটিমেটামকে অগ্রাহ্য করে। আর ইসরায়েল পূর্ব পরিকল্পনামতো আলটিমেটামকে না শোনার ভান করে। পরের দিন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ফাইটার প্লেন মিশরের এয়ারফিল্ডগুলোতে বোমাবর্ষণ করে। টানা প্রায় ছ' দিন ইসরায়েলি ও মিশরীয় সেনা মুখোমুখি লড়াই করে। ওই ছ' দিন ব্রিটেন বা ফ্রান্স কেউই তাদের সেনা নামায়নি। ইসরায়েলকে লড়তে হচ্ছিল একাই।

পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আগেই আমেরিকা হস্তক্ষেপ করে। তারা ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইসরায়েলকে পিছু হটতে নির্দেশ দিল। সোভিয়েতরাও এতে সায় দিল। চাপে পড়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইসরায়েলকে পিছু হটতে হল। সিনাই থেকে সেনা সরানোর ব্যাপারে ইসরায়েলের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কারণ, গাজা ভূখণ্ড হয়ে উঠেছিল উগ্রপন্থীদের লঞ্চিং প্যাড। শেষে আমেরিকা সেফ প্যাসেজের গ্যারান্টি দেওয়ার পর ইসরায়েল সিনাই থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেয়। এই যুদ্ধে ইসরায়েলের তরফে ২৩১ জন নিহত হয় আর আহত হয় ৯০০ জন। মিশরের তরফে আহতের সংখ্যা ছিল ১,৫০০-৩,০০০ জন আর আহত প্রায় ৫,০০০ জন।

এই যুদ্ধের ফলে গোটা দুনিয়ার সামনে সুপ্রিম মিলিটারি পাওয়ার হিসাবে উঠে আসে আইডিএফ। মাত্র ১০০ ঘণ্টার মধ্যে সিনাই দখল করা মোটেও সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু ওই যুদ্ধ প্রকৃত অর্থে আরেকটা যুদ্ধের বীজ বপন করে দিয়ে গিয়েছিল।

জর্ডনের সেনাপ্রধান তখনও গ্লুব। যুদ্ধের পরপরই তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কারণ ওই যুদ্ধের পর আরবরা আর কোনো ব্রিটিশকে বিশ্বাস করতে রাজি ছিল না।

১৯৪৮ সালের যুদ্ধে আরবদের পক্ষে আরেক সৈনিক ছিলেন ইয়াসের আরাফাত। ১৯৫৯ সালে আরাফাত 'ফাতাহ্' নামে একটি জঙ্গি সংগঠন তৈরি করেন, যার এক ও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইসরায়েলকে ধ্বংস করা। ইসরায়েলের শত্রুর তালিকায় ফাতাহ্ ছিল নবতম সংযোজন। ১৯৬৪ সালে নাসের কায়রোতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য আরবদের সঙ্গে একটা বৈঠক করে। আহমেদ আল-শুকায়রির নেতৃত্বে তৈরি হল প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা পিএলও। ১৯৬৮ সালে ফাতাহ্ পিএলও-তে যুক্ত হয়ে যায়।

১৯৬৪ সালের মে মাসে জর্ডনের কিং হুসেইন চালু করলেন প্যালেস্টাইন কংগ্রেস। এই প্যালেস্টাইন কংগ্রেসই পিএলও-কে সামনে নিয়ে আসে। ১৯৬৫ সালে হুসেইন গোপনে ইসরায়েলি বিদেশমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ারের সঙ্গে দেখা করেন। গোল্ডা মেয়ার তাকে বলেন, 'একদিন আমরা অস্ত্র ছেড়ে জেরুসালেমে একটা মনুমেন্ট বানাব, যা আমাদের মধ্যে শান্তির স্মারক হয়ে রইবে।'

মেয়ারের এই স্বপ্ন সত্যি হয়নি। এই দুটো দেশ আবারও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। জেরুসালেমকে দ্বিখণ্ডিত করা নিয়ে ইসরায়েলিদের মনে ক্ষোভের অন্ত ছিল না। জেরুসালেমের প্রাচীন মন্দিরের একমাত্র অবশেষ ওয়েস্টার্ন ওয়াল তত দিনে চলে গেছে ইহুদিদের নাগালের বাইরে। প্রায় দু' হাজার বছর ধরে তারা সেখানে প্রার্থনা করেছে। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার যুদ্ধে পুরোনো জেরুসালেম, হেব্রন চলে গিয়েছিল জর্ডনের হাতে। প্রকৃতপক্ষে ইহুদিদের কোনো পুণ্যস্থানই ইসরায়েলের কাছে ছিল না।

ন্যাশনাল ওয়াটার ক্যারিয়ার প্রোজেক্ট ছিল ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় জল- প্রকল্প। সিরিয়া এই ওয়াটার রিসার্ভারের জলের ৩৫% ডাইভার্ট করার কথা ঘোষণা করে। ইসরায়েল

এই ডাইভার্সনের তীব্র বিরোধিতা করে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় যে, এর ফলে ইসরায়েল যুদ্ধে নামতে বাধ্য হবে। সিরিয়া কোনো কথায় কান না দিয়ে ডাইভার্সন প্রোজেক্টের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। ফলত সংঘর্ষ শুরু হয়। এদিকে সিরিয়া ইসরায়েলের গ্রামগুলোকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় তো ওদিকে ইসরায়েল সিরিয়ার প্রোজেক্টের যন্ত্রপাতির ওপর হামলা চালায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সংঘর্ষের আগুনে ঘি ঢালার কাজ করল। তারা মিশর ও সিরিয়াকে জানাল যে, ইসরায়েল উত্তরে ১২টা ব্রিগেড নিয়ে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ এই অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং তিনি সোভিয়েত অ্যাম্বাস্যাডর দেমিত্রি চুকাখিনকে আমন্ত্রণ করে বলেন, 'দেখে যান যে আসল ঘটনাটা কী।' সোভিয়েতদের কাছে এটা একরকম চ্যালেঞ্জই ছিল। অবশ্য চুকাখিন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। আমেরিকানরাও বলে, এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। কিন্তু পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত ছিল যে, এই একটা স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট ছিল দাবানল লাগানোর জন্য। সিরিয়া সোভিয়েতদের কথাই বিশ্বাস করল।

এর কয়েক সপ্তাহ পরেই ১৫ মে ইসরায়েলের ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে'র প্যারেড। অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল জেরুসালেমে। প্রতি বছরই এটা আলাদা আলাদা জায়গাতে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্যারেডে ইসরায়েলের বিপুল অস্ত্রভাণ্ডারের প্রদর্শন করা হয়। তবে সেবারে সামান্য ব্যতিক্রম হল। ১৯৪৯ সালে জর্ডনের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তিকে সম্মান জানানোর জন্য অস্ত্রের প্রদর্শন অনেকটাই সীমিত ছিল। ট্যাঙ্কের সংখ্যাও ছিল অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক কম।

আর এই ঘটনাই মিশর ও সিরিয়ার মনে সন্দেহ জাগাল। তাহলে কি বাকি ট্যাঙ্কগুলো আর অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধের জন্য পাঠানো হয়েছে?

সেদিন প্যারেড চলাকালীন একজন ইসরায়েলি আধিকারিক একটা চিরকুট পাঠালেন আইডিএফ-এর চিফ অব স্টাফ য়িত্জাক রাবিনকে। লেখা ছিল—- মিশরের বাহিনী সিনাই উপদ্বীপ এলাকাতে প্রবেশ করেছে।

রাবিন সেটা প্রধানমন্ত্রী এসকোলকে পাঠালেন। এসকোলের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। আনন্দের অনুষ্ঠানে যেন হঠাৎ কালো মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এল।

ইসরায়েলি নেতৃত্ব তখন এটা বুঝতে পারছে না যে, এমতাবস্থায় কী করা উচিত। কিছুটা আশা তখনও ছিল যে হয়তো আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধ এড়ানো যেতে পারে। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দিয়ে কায়রো রেডিওতে ঘোষণা হল– 'আমাদের সেনা যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি তৈরি।'

১৫ মে আরবরা ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে পরাজয়ের শোক পালন করে। নাসের ঘোষণা করল, 'ভাইসকল, প্যালেস্টাইনে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য তৈরি হও।' নাসের মনে মনে ইসরায়েলের ধ্বংসের ছবি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

ইসরায়েল কিন্তু তখনও অপেক্ষাই করছিল। এই অপেক্ষা ইসরায়েলে 'হামতানাহ' নামে খ্যাত, যার অর্থ— অপেক্ষার সময়। মিশরীয়রা পাঁচটা ডিভিশনে সিনাইয়ে সেনা পাঠায়। প্রত্যেকটা ডিভিশনে ছিল ১,৫০০ জন সৈন্য, ১০০টা ট্যাঙ্ক, ১৫০টা সশস্ত্র সৈন্য-পরিবাহী যান এবং সোভিয়েত আর্টিলারি। তারা তিরানের সমুদ্রপ্রণালী অবরোধ করে। এর ফলে ইসরায়েলের সঙ্গে অন্যতম বাণিজ্যিক বন্দর ঈলাটের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

১৯৫৬ সালে ইসরায়েলের সুয়েজ অভিযানের পর ১৯৫৭ সালে ইউনাইটেড নেশনসের এমারজেন্সি ফোর্স গাজাতে এবং সিনাইয়ের একেবারে দক্ষিণ প্রান্ত শারম আল-শেখে কয়েক হাজার সেনা মোতায়েন করে ও বেশ কিছু অবজারভেশন পোস্ট বসায়। এর উদ্দেশ্য ছিল মিশর থেকে ইসরায়েলে যে কোনো রকম অনুপ্রবেশ আটকানো।

তাহলে মিশরের সেনা কীভাবে সিনাইতে ঢুকল?

ইউএন-এর পাহারাদাররা কি তাদের বাধা দেয়নি?

নাকি তারা নাসেরের বাহিনীকে দেখতেই পায়নি?

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নাসের ইউনাইটেড নেশনসের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্টকে বলেন, 'ইউএন-এর সেনা সরিয়ে নিন।'

ইসরায়েলের তরফে আশা করা হয়েছিল যে, ইউএন নিশ্চয়ই এর বিরোধিতা করবে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সমস্ত ইউএন সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। ১৯ মে নাগাদ আর কোনো ইউএন বাহিনীর অস্তিত্বই রইল না ওই অঞ্চলে। এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আসন্ন যুদ্ধে ইউনাইটেড নেশনসের তরফ থেকে কোনো নিরাপত্তা পাবে না ইসরায়েল।

বিপদ বুঝে ইসরায়েলের বিদেশমন্ত্রী আব্বা এবান ফ্রান্সে ছুটলেন। এই ফ্রান্সই সিনাই তথা সুয়েজ অভিযানে ইসরায়েলকে সঙ্গ দিয়েছিল। তাই পুরোনো বন্ধুর কাছে সাহায্যের আশায় ছিল ইসরায়েল। ফ্রান্স জানিয়ে দিল, তারা এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকতে চায়। এবান তখন ফরাসি প্রেসিডেন্ট চার্লস ডি. গালেকে মনে করালেন ১৯৫৬ সালের প্রতিশ্রুতির কথা, যেখানে ফ্রান্স ইসরায়েলকে কথা দিয়েছিল যে মিশরের সঙ্গে সংঘর্ষে তারা ইসরায়েলকে সমর্থন করবে। তখন ফরাসি প্রেসিডেন্ট নির্বিকারভাবে বললেন, 'ডিয়ার এবান, ১৯৫৬ সাল আর ১৯৬৭ সাল এক নয়। তাই না?'

এবান দেখলেন এরপর আর কথা বাড়ানো চলে না। ফ্রান্স থেকে তিনি খালি হাতেই ফিরলেন। তার কানে বাজছিল একটাই কথা— ১৯৫৬ সাল আর ১৯৬৭ সাল এক নয়!

এরপর এবান ছুটলেন লন্ডনে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এবার হ্যারল্ড কিছুটা স্বস্তি পেলেন। উইলসন জানালেন যে, ব্রিটেন মিশরের এই অবরোধকে ন্যায়সঙ্গত মনে করে না।

১৯৫৭ সালে আমেরিকা ইসরায়েলকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যদি মিশর তিরান অবরোধ করে তাহলে ইসরায়েল তার সেলফ ডিফেন্সের অধিকার প্রয়োগ করতেই পারে এবং সেক্ষেত্রে আমেরিকার সম্মতি থাকবে। আমেরিকা জানত যে, মিশরের এই অবরোধ অনৈতিক কিন্তু আমেরিকা তখন নিজেই ভিয়েতনামের যুদ্ধে জেরবার। সুতরাং আমেরিকার কাছেও হতাশা ছাড়া আর কিছুই পেল না ইসরায়েল। ডি. গালের মতো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসনও ইসরায়েলকে পরামর্শ দিলেন প্রথমে আক্রমণ না করার। তিনি বললেন, 'ইসরায়েল যদি একা না এগোয়, তাহলে ইসরায়েল একা হয়ে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

তাহলে ১৯৫৭ সালে আমেরিকার দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতির কী হল? সবই কি তবে কথার কথা? এক দিকে মিশরের অবরোধ, অন্য দিকে আবার প্রথমে আক্রমণও করা যাবে না। এ তো রীতিমতো উভয়সংকট।

ইসরায়েলের জনতার মধ্যে তখন ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। ২৭ মে ক্যাবিনেট ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিল যে তারা প্রথমে আক্রমণে যাবে না। তারা অপেক্ষা করবে। প্রধানমন্ত্রী ভয়ভীত ও উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করার জন্য ২৮ মে রেডিওতে ভাষণ দিলেন। এই ভাষণ দেবার সময়টাই হয়তো এসকোলের জীবনের সবচেয়ে খারাপ মুহূর্ত। তার এই ভাষণ 'স্ট্যামারিং স্পিচ' নামে খ্যাত। তার ভাষণে জনগণের মধ্যে ভয় ও হতাশা আরো বেড়ে গেল। ইসরায়েলের অনেক নেতাও ক্যাবিনেটের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ ছিল।

১৯৪৮-এর যুদ্ধের পর ইসরায়েলের সঙ্গে জর্ডনের সম্পর্ক ছিল মোটের ওপর শান্তিপূর্ণ। ছোটখাটো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া এই প্রতিবেশী দেশটির সঙ্গে গত ১৯ বছর ধরে ইসরায়েলের সম্পর্ক বেশ ভালোই চলছিল। কিন্তু আরব দুনিয়ার চাপে পড়ে জর্ডন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে রাজি হয়। ১৯ মে জর্ডনের রাজা হুসেন কায়রোতে আসেন নাসেরের সঙ্গে দেখা করার জন্য। জর্ডন, মিশর ও সিরিয়া একজোট হয় ইসরায়েল আক্রমণ করার জন্য। এর পরের দিনই ইরাকি ফৌজ মিশরে পৌঁছায়। ১৯৪৮-এর মতো এবারেও তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আগ্রহী।

পরিস্থিতি ক্রমশ ইসরায়েলের প্রতিকূলে যেতে থাকে। আমেরিকা ইসরায়েলকে মিসাইল, ট্যাঙ্ক ও জেট সরবরাহ করা বন্ধ করে দিল। তাদের অজুহাত ছিল— এখন ভিয়েতনামের যুদ্ধ। এরপর ফ্রান্সও যখন ইসরায়েলকে অস্ত্র বিক্রি করতে অস্বীকার করল, তখন ইসরায়েলের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কারণ এরকমটা তারা কোনো ভাবেই আশা করেনি। ফরাসি প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, 'যে দেশ প্রথম আক্রমণ করবে, ফ্রান্স তাকে বয়কট করবে।' ফ্রান্সের ইসরায়েলকে অস্ত্র বিক্রি না করার কারণটা ছিল অন্যরকম। ন্যায়-নীতির চেয়ে নিজেদের দেশের ও ব্যবসার স্বার্থই এখানে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্স বিশ্বাস করত না যে, এই যুদ্ধে ইসরায়েল জিততে পারে। সুতরাং আরব দুনিয়ার সঙ্গে একটা দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তোলার এটাই সুযোগ।

আইডিএফ-এর চিফ অব স্টাফ য়িত্জাক রাবিন প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিলেন। হঠাৎই তাঁর নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়। এটাকে তখন নিকোটিন পয়জনিং বলে চালাবার চেষ্টা করা হয়, কারণ সত্যি ঘটনা জানলে মানুষের আতঙ্ক আরও বেড়ে যেত। ইসরায়েলের সামনে কেবল একটা যুদ্ধ নয়, যেন তার স্বাধীনতার অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছিল।

ওই সময়ে ইউরোপ আর আমেরিকার ইহুদিরা ইসরায়েলের সমর্থনে নামল। তারা অর্থ দিয়ে ইসরায়েলকে সাহায্য করা শুরু করল এবং ওয়াশিংটনের ওপর রাজনৈতিক চাপ তৈরি করল। নিউ ইয়র্কের রাস্তায় প্রায় ১,৫০,০০০ লোকের মিছিল বের হল ইসরায়েলের সমর্থনে।

ওদিকে আরব বিশ্বও তখন জেগে উঠেছে। নাসের ঘোষণা করছে, 'আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ইসরায়েলকে ধ্বংস করা।' পিএলও-এর চেয়ারম্যান হুংকার দিলেন, 'আগুন যখন লাগবে, একটা ইহুদিও বাঁচবে না।'

কায়রো, বাগদাদ, দামাস্কাসে লোক বিক্ষোভে সামিল হল। তাদের মুখে ছিল স্লোগান — 'ইহুদিদের মেরে ফেলো।'

ইসরায়েল নিজেকে তৈরি করছিল সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য। রামাত গান স্টেডিয়াম ৪০ হাজার লোকের সমাধির জন্য প্রস্তুত করা হয়।

হোটেলগুলোকে খালি করে দেওয়া হয় আপদকালীন পরিস্থিতিতে মেডিকাল এইড দেওয়ার জন্য। স্কুলগুলোকে বম্ব শেল্টারে পরিণত করা হল। ইসরায়েলি শিশুদের ইউরোপে পাঠিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাও তৈরি করা হয়েছিল।

এসকোল উপলব্ধি করলেন যে, এরকম পরিস্থিতিতে গোটা দেশের মানুষকে এক জোট হয়ে লড়তে হবে। তিনি বিরোধী পক্ষের নেতাদেরকেও ক্যাবিনেটের অন্তর্ভুক্ত করলেন। বিরোধী পক্ষের নেতাদের মধ্যে মেনাকেম বিগিনও ছিলেন বেন-গুরিয়নের রাফি পার্টির মোসে দয়ানকে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদে বসানো হল।

২ জুন, ১৯৬৭। ইসরায়েলের ক্যাবিনেট মিটিংয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত করা হয়। ৪ জুন, রবিবার দয়ান ক্যাবিনেটের সামনে নিজের রণনীতি পেশ করলেন। মিশরীয়রা সিনাইতে ১,০০,০০০ সৈন্য ও ৯০০ ট্যাঙ্ক মোতায়েন করেছিল। উত্তরে সিরিয়া ৭৫,০০০ সৈন্য ও ৪০০ ট্যাঙ্ক তৈরি রেখেছিল। আর জর্ডন মোতায়েন করেছিল ৩২,০০০ সৈন্য ও ৩০০ ট্যাঙ্ক। তার মানে, ইসরায়েলকে লড়তে হত ২,০৭,০০০ সৈন্য ও ১৬০০ ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে।

আর ইসরায়েলের কাছে কী ছিল?

২,৬৪,০০০ সৈন্য ও ৮০০ ট্যাঙ্ক।

আর যুদ্ধবিমান?

আরবদের ছিল ৭০০ ফাইটার প্লেন, সেখানে ইসরায়েলের ছিল মাত্র ৩০০ টা। সুতরাং শুরু থেকেই পরিষ্কারভাবে ব্যাকফুটে ছিল ইসরায়েল।

মোসে দয়ান এবার আগেই আক্রমণ করার অনুমতি চাইলেন ক্যাবিনেটের কাছে। কারণ, তাঁর মতে আগে আক্রমণ করলে তবেই ইসরায়েলের পক্ষে এই যুদ্ধ জেতা সম্ভব।

ক্যাবিনেট ১২-৫ ভোটে আগে আক্রমণ করার প্রস্তাবকে সমর্থন দিল। এবারের রণনীতি ছিল— আক্রান্ত হওয়ার আগেই আক্রমণকারীকে শেষ করে দাও, ‘রাইজ অ্যান্ড কিল ফার্স্ট।’

৫ জুন, ১৯৬৭। তেল আভিভ শহর থেকে মাত্র ১২ মাইল দূরে তেল নফ এয়ারফোর্স বেসে ৫৫ নম্বর প্যারাট্রুপার ব্রিগেডকে মোতায়েন করা হল। সকাল ৭:১০ নাগাদ ঝাঁকে ঝাঁকে যুদ্ধবিমান টেক অফ করল, আর খুব কম উচ্চতা দিয়ে দ্রুত উড়ে যেতে থাকল দক্ষিণের দিকে। ৭:৩০টার মধ্যে প্রায় ২০০ যুদ্ধবিমান উড়ে গিয়েছে মিশরের দিকে। ইসরায়েল খুব ভালোভাবেই জানত যে, এই সময় মিশরের পাইলটরা প্রাতরাশ সারছে। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের বিমানগুলো অসুরক্ষিত অবস্থায় ছিল। তবে ইসরায়েলও সেদিন বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিল। মাত্র ১২টা যুদ্ধবিমান ছিল ইসরায়েলের সুরক্ষার জন্য, আর বাকি সব গিয়েছিল আক্রমণে।

যুদ্ধবিমানগুলো মিশরের রাডার ডিটেকশন এড়ানোর জন্য খুব নীচু দিয়ে উড়ছিল— কখনো কখনো মাটি থেকে মাত্র ১৫ মিটার উচ্চতায়। পাইলটদের কড়া নির্দেশ দেওয়া ছিল যে, কোনো ভাবেই রেডিও যোগাযোগ ব্যবহার করা যাবে না। অত্যন্ত খারাপ পরিস্থিতি হলে পাইলটদের বিমান সমুদ্রে ক্র্যাশ করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

এত সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও জর্ডনের রাডারে ইসরায়েলি বিমানের গতিবিধি

ধরা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভাগ্য সহায় ছিল ইসরায়েলের। মিশর তাদের ফ্রিকোয়েন্সি কোড পালটে দিয়েছিল যেটা জর্ডনের জানা ছিল না, আর তাই তারা মিশরকে সময়মতো সতর্ক করতে পারেনি। এই ভুলের মাসুল মিশরকে দিতে হল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার আক্রমণে কয়েকশো মিশরীয় যুদ্ধবিমান ধ্বংস হল। এক-তৃতীয়াংশ পাইলট মারা গেল। ১৩টা এয়ার বেস নষ্ট হল। ২৩টা রাডার স্টেশন ধ্বংস হল এবং এয়ারক্রাফ্ট সাইটগুলো মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হল। মোট কথা, মিশরের বায়ুসেনা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

ইসরায়েল এই অপারেশনে ১৭টা যুদ্ধবিমান ও ৫ জন পাইলট হারিয়েছিল। সকাল ১০:৩৫ নাগাদ য়িত্জাক রাবিন নিশ্চিত হলেন যে, মিশরীয় বায়ুসেনা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। মিশন সফল! যুদ্ধ শুরুর আগেই যুদ্ধটা প্রায় জিতে গিয়েছিল ইসরায়েল।

ইসরায়েল জর্ডনের রাজা হুসেনকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার জন্য অনুরোধ করেছিল। জর্ডনের সেনা অবশ্য তখন যুদ্ধে নেমে গেছে। তবু ইসরায়েল জর্ডনকে অনুরোধ করে, যদি জর্ডন যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়, তবে ইসরায়েল ১৯৪৯ সালের যুদ্ধবিরতির চুক্তিকে পুরো সম্মান জানাবে। কিন্তু জর্ডনের রাজার পক্ষে আরব দুনিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করা সম্ভব ছিল না।

৫ জুন বেলা ১১:৫০ নাগাদ জর্ডন, সিরিয়া ও ইরাকের যুদ্ধবিমান একযোগে ইসরায়েল আক্রমণ করে। প্রায় দু' ঘণ্টার লড়াইয়ে ইসরায়েল আরবদের আক্রমণ সফলভাবে প্রতিহত করে এবং বহু আরব বিমান ধ্বংস করে। জর্ডন ও সিরিয়ার এয়ার বেসগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। গোটা দিনে ইসরায়েল আরবদের ৪০০টা এয়ারক্রাফ্ট ধ্বংস করে। এক নতুন শক্তি হিসাবে উঠে আসে ইসরায়েলের বায়ুসেনা।

এদিকে স্থলযুদ্ধে ইসরায়েল গাজা ভূখণ্ডকে বাকি মিশর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পরের দিন কোনো বুলেট খরচ না করেই ইসরায়েল শারম আল-শেখ দখল করে আর তিরান প্রণালী পুনরায় খুলে দেয়।

ইসরায়েলের সংসদের বিরোধী দলনেতা মেনাকেম বিগিন এবার প্রধানমন্ত্রী এসকোলকে বললেন, 'পুরো জেরুসালেম দখল নিয়ে নিন। জর্ডন যুদ্ধে জড়িয়ে যে অন্যায় করেছে তার মূল্য তো তাকে দিতেই হবে। ইসরায়েলের পক্ষে পুরো জেরুসালেমের ওপর কবজা করার এটাই সুযোগ।'

এসকোল দোটানার মধ্যে পড়লেন। কারণ, তিনি ভাবছিলেন, জেরুসালেম দখল করতে গেলে যে সংঘর্ষ হবে, তার ফলে ইসরায়েলের পক্ষে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। তিনি নিজের মনের কথা বিগিনকে বললেনও।

বিগিন এসকোলকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'এই সুযোগ হারালে কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম কোনোদিন আমাদের ক্ষমা করবে না।'

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আইডিএফ-কে নির্দেশ দেওয়া হল— ওল্ড জেরুসালেম পুনরুদ্ধার করো। ইসরায়েলি প্যারাট্রুপার বাহিনী বাসে করে জেরুসালেমে প্রবেশ করল।

তবে ইসরায়েলের পক্ষে জর্ডনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শুরুটা মোটেই ভালো ছিল না। ইসরায়েলি সেনার কাছে খবর ছিল যে, জর্ডনের বাহিনীতে সৈন্যের সংখ্যা নাকি তাদের সৈন্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু এই তথ্য ছিল ভুল। জর্ডন ঢের বেশি সেনা মোতায়েন করেছিল ওল্ড জেরুসালেমের বাইরে। ইসরায়েলি বাহিনী প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে পড়ল। ৬

জুন রাত আড়াইটে নাগাদ সংঘর্ষ শুরু হয়, আর তা শেষ হয় সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ। মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে হওয়া সমস্ত আরব-ইসরায়েল সংঘর্ষের মধ্যে এটা ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষগুলোর মধ্যে একটা। ইসরায়েলের ৩৫ জন সৈন্য নিহত হয় আর জর্ডনের তরফে মারা যায় ৭১ জন। এই সংঘর্ষের পর ইসরায়েল ওল্ড জেরুসালেমের সন্নিকটে নো-ম্যানসল্যান্ডে পৌঁছায়। সকাল ৯:১৫ নাগাদ ৫৫ নম্বর ব্রিগেডের কমান্ডার মোটা গুর-এর কাছে নির্দেশ আসে, 'গো টু দ্য ওল্ড সিটি অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি ক্যাপচার ইট!'

প্যারাট্রুপার বাহিনী লায়নস গেটের দিকে এগোতে থাকে। এক ঘণ্টার মধ্যেই ইসরায়েলি বাহিনী টেম্পল মাউন্টে পৌঁছায়।

মোটা গুর রিপোর্ট করলেন, 'টেম্পল মাউন্ট এখন আমাদের দখলে।'

কয়েক হাজার বছর পর ইতিহাস তৈরি হল। এই প্রথম ওয়েস্টার্ন ওয়াল স্বাধীন ইহুদি-রাষ্ট্র ইসরায়েলের হাতে এল যে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র দু' দিন পর, ৭ জুন মিশর ও জর্ডনের বাহিনী ইসরায়েলের কাছে পরাজিত হল। নাসের নিজের বাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দিল। কিন্তু মিশরের পক্ষ থেকে সংঘর্ষবিরতি স্বাক্ষর করতে চাইছিল না কেউই। নাসের চাইছিল ১৯৫৬ সালের মতো শর্তাধীন চুক্তি হোক, যাতে ইসরায়েল সিনাই এলাকা ছেড়ে দেয়। কিন্তু ফরাসি প্রেসিডেন্ট ডি গালে ঠিকই বলেছিলেন— '১৯৫৬ সাল আর ১৯৬৭ সাল তো আর এক নয়।' ইসরায়েল কোনো শর্তাধীন চুক্তি করতে রাজি হল না। উপায়ান্তর নেই দেখে নাসের ৮ জুন মধ্যরাত্রে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি সই করে।

এদিকে উত্তর দিকে সিরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ তো চলছিলই। ইসরায়েল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল যে, তারা গোলান মালভূমি সিরিয়ার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করে ইসরায়েলি পক্ষ। ৯ জুন নাগাদ সিরিয়ার প্রতিরোধ ভেঙে পড়তে থাকে। ১০ জুন সিরিয়া সংঘর্ষ-বিরতি করতে বাধ্য হয়। ১০ জুন সিরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই যুদ্ধেও জয়ের পতাকা ওড়াল ইসরায়েল। মিশরের প্রায় ১০-১৫ হাজার সৈন্য প্রাণ হারায় ৫,০০০ সৈন্য নিখোঁজ হয়। জর্ডন হারায় ৭০০ জন সৈন্য; তাদের ক্ষেত্রে নিখোঁজ আর আহতের সংখ্যাটা ছিল প্রায় ৬ হাজার। সিরিয়ার ক্ষতি তুলনামূলক কমই ছিল। ৪৫০ জন সৈন্যের প্রাণহানি এবং নিখোঁজের সংখ্যা ছুঁয়েছিল ২ হাজার। ইসরায়েলের তরফে নিহত সৈন্যসংখ্যা ৬৭৯ জন এবং আহতের সংখ্যা ২,৫৬৭ জন ছিল।

এই যুদ্ধের ফল কী হয়েছিল জানেন?

ইসরায়েলের ভৌগোলিক আয়তন আগের তুলনায় প্রায় তিন গুণেরও বেশি বেড়ে যায়। গাজা ভূখণ্ড, সিনাই উপদ্বীপ অঞ্চল, ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক (পূর্ব জেরুসালেম সহ) এবং গোলান মালভূমি ইসরায়েলের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই যুদ্ধে আরও একটা জিনিস প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত হয়, তা হল ইসরায়েলি সেনার পেশাদারিত্ব। ৫-১০ জুন অবধি চলা ছ' দিনের এই যুদ্ধ বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে 'সিক্স ডে'জ ওয়র' নামে বিখ্যাত হয়ে গেছে।

১৯৭৩ সালের স্বাধীনতা দিবসের দিন ইসরায়েলে যে মিলিটারি প্যারেড হয়েছিল, সেটাই ছিল ইসরায়েলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মিলিটারি প্যারেড এবং এই প্যারেড ছিল স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ইসরায়েলের শেষ মিলিটারি প্যারেড।

শেষ প্যারেড কেন?

খাতায়-কলমে কিন্তু বলা হয় যে, খরচ কমানোর জন্য মিলিটারি প্যারেড বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু আসল কারণ কি এটাই?

ছ' দিনের যুদ্ধের পর ইসরায়েল এক দুর্ধর্ষ মিলিটারি পাওয়ার হিসাবে উঠে এসেছিল। ইসরায়েলি জনতার আত্মবিশ্বাসও বেড়ে গেছিল। তারা ভাবতে শুরু করেছিল যে, এটাই হয়তো শেষ যুদ্ধ; শত্রুপক্ষ হয়তো আর কোনোদিনই ইসরায়েলেকে আক্রমণ করার সাহস পাবে না। ইসরায়েলি সেনা আসলে অজেয়— এই ধারণা ঢুকে গিয়েছিল তাদের মাথায়।

ইসরায়েলের দক্ষিণ সীমান্ত কিন্তু কখনোই শান্ত হয়নি। সিনাই উপদ্বীপে মিশরীয় ও ইসরায়েলি সেনার ঘাঁটিকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল একটা সংকীর্ণ খাল, যার নাম দেওয়া হয়েছিল বার-লেভ-লাইন। সেই খাল এতটাই সংকীর্ণ যে, দু' পক্ষই একে অপরকে দেখতে পেত। ইসরায়েলের তরফে ভাবা হত, এই খাল থাকার ফলে মিশর আচমকা ইসরায়েলকে আক্রমণ করতে পারবে না। কিছুটা সময়ের জন্য হলেও তাদের আটকে রাখতে পারবে ইসরায়েলি বাহিনী।

মিশর একের পর এক যুদ্ধ হেরেছে এবং একাধিক পরাজয়ের অপমান মিশর ভুলতেও পারেনি। যে কোনো মূল্যে ইসরায়েলের কাছ থেকে সিনাই উপদ্বীপ ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য মরিয়া ছিল মিশর। ১৯৬৯ সালের ৮ মার্চ তারা ইসরায়েলের ওপর হামলা চালায়। ইসরায়েলি সেনাও সেই হামলার পালটা জবাব দেয়। ১৯৭০ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত সংঘর্ষ জারি থাকে। এটাই 'ওয়র অফ অ্যাট্রিশন'। আনুমানিক ৯২১ জন ইসরায়েলি প্রাণ হারায়, যাদের মধ্যে ৬৯৪ জন ছিল সৈন্য এবং বাকিরা ছিল সাধারণ মানুষ। ইসরায়েলের দু' ডজন এয়ারক্রাফ্ট নষ্ট হয়। আরবদের তরফে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। মিশরের সৈন্য ও সাধারণ মানুষ মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার জন নিহত হয়। ধ্বংস হয়েছিল প্রায় ১০০ এয়ারক্রাফ্ট।

১৯৭০ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের বিশ্ব জায়নিস্ট কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নাখুম গোল্ডম্যানকে শান্তি প্রক্রিয়ার আলোচনার জন্য কায়রোতে আমন্ত্রণ করেন। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী তখন গোল্ডা মেয়ার। তিনি ভাবলেন, এটা নিশ্চয়ই মিশরের একটা ফাঁদ। গোল্ডম্যানকে বললেন, 'কায়রো যাওয়ার দরকার নেই।'

যুদ্ধ দেখে দেখে ক্লান্ত ইসরায়েলি জনতা তখন শান্তি চাইছিল। তারা ভাবল, গোল্ডা মেয়ার শান্তির পথকে অবরুদ্ধ করছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই পদক্ষেপে জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ১৯৭০ সালের ২৮ এপ্রিল ৫৮ জন ছাত্র-ছাত্রী গোল্ডা

মেয়ারকে একটা চিঠি পাঠাল—- 'টুয়েলফথ গ্রেডার্স লেটার'। সেই চিঠি গোটা দেশকে নাড়া দিয়ে গেল।

কী ছিল সেই চিঠিতে?

ওতে লেখা ছিল— আর কত যুদ্ধ লড়ব আমরা? সরকার এই শান্তি প্রক্রিয়াতে বাধা দিচ্ছে কেন? এই চিঠির পর প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ারের বিরুদ্ধে জনরোষ আরও বাড়ল।

হয়তো শ্রীমতি মেয়ার ব্যাপারটা ভেবে দেখতেন। হয়তো দু' পক্ষের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হত। কিন্তু নিয়তি অন্য কিছুই লিখেছিল ইসরায়েলের ললাটে। কয়েক মাস পরেই হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের মৃত্যু হয়। নাসের না পারল ইহুদিদের

সমুদ্রে ফেলতে, না পারল শান্তিচুক্তি করতে।

নাসেরের মৃত্যুতে একটি অধ্যায় সমাপ্ত হল। অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যের কাহিনি তো থেমে থাকে না। শেহেরজাদের কিসসার মতোই শুরু হয়ে যায় আরেকটা অধ্যায়। ইসরায়েলকে ধ্বংস করার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন ইয়াসের আরাফাত। প্যালেস্টাইনের হিংসাকে তিনি ছড়িয়ে দিলেন গোটা বিশ্বে। ইসরায়েলি নাগরিকদের ওপর তারা হামলা চালানো শুরু করল। ইউরোপেও জাল বিস্তার করল তাঁর সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। ১৯৬৭-৭১ সালের মধ্যে অসংখ্যবার তারা ইসরায়েলের ওপর হামলা চালায়। আরাফাতের লক্ষ্য ছিল ইহুদিদের শেষ করা।

প্যালেস্টাইনের সন্ত্রাসবাদীরা ১৯৭০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি একটা সুইস এরোপ্লেন হাইজ্যাক করে মোট ৪৩ জন মানুষকে মেরে হত্যালীলা চালায়। এদের মধ্যে ১৭ জন যাত্রী ছিল ইহুদি। ওই একই দিনে মিউনিখের একটি বৃদ্ধাশ্রমে ঢুকে তারা ৭ জন বৃদ্ধ ইহুদিকে হত্যা করে।

ইসরায়েলের স্বাধীনতার পরপরই ১৯৪৮ সালের যুদ্ধ এবং ১৯৬৭ সালের ছ' দিনের যুদ্ধের পর বিপুল সংখ্যক ফিলিস্তিনি মানুষ চলে গিয়েছিল জর্ডনে। ১৯৭০ সালের মধ্যে পিএলও সেখানে শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসে। জর্ডনে হাশেমি রাজতন্ত্রের পতন ঘটানোর জন্য তারা নাশকতামূলক কাজকর্ম শুরু করে। তারা জর্ডনের তিনটি বিমান হাইজ্যাক করে ও টেলিভিশনে লাইভ টেলিকাস্ট করে বিমানগুলোকে ধ্বংস করে। কিং হুসেইনের ওপরে ৩ বার ফেইলড অ্যাসাসিনেশন হয়। কিং হুসেইন এরপর পিএলও-কে সমূলে উৎপাটন করার জন্য জর্ডনের সেনাকে নির্দেশ দেন। এই অভিযান 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' নামে খ্যাত। পিএলও এবং জর্ডনের সেনার মধ্যে সংঘর্ষ গৃহযুদ্ধের আকার নেয়, যা শুরু হয় ১৯৭০-এর সেপ্টেম্বর মাসে আর শেষ হয় ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে। কয়েক হাজার পিএলও জঙ্গি নিহত হয় সংঘর্ষে। আর এই লড়াইয়ের মাঝে পড়ে প্রাণ হারায় হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। জর্ডনের গৃহযুদ্ধের সুযোগে সিরিয়া জর্ডন দখল করার একটা সুবর্ণ সুযোগ দেখতে পায়। কিন্তু গোলান মালভূমিতে ইসরায়েলের ট্যাঙ্কের উপস্থিতির জন্য তারা আর এগোয়নি। এখানে একটা কথা বলে রাখি বন্ধুরা, আমরা 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' নিয়ে পরে আরও কিছু কথা বলেছি।

কিং হুসেইন পিএলও-এর হাত থেকে নিজের রাজত্ব রক্ষা করলেন বটে, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটা দেশ এই সন্ত্রাসবাদীদের জন্য বরবাদ হয়ে গেল।

কোন দেশ?

লেবানন। জর্ডনের সেনার তাড়া খেয়ে লেবাননে পালিয়ে যায় পিএলও জঙ্গিরা। প্রাথমিক ভাবে তাদের আশ্রয় দিলেও ১৯৭৫ সাল নাগাদ লেবানন ভুলটা বুঝতে পারে। 'মধ্যপ্রাচ্যের প্যারিস' রূপে বিখ্যাত লেবাননে শুরু হল গৃহযুদ্ধ। আর এর জন্য দায়ী ছিল একটাই লোক— ইয়াসের আরাফাত।

নাসেরের পর মিশরের প্রেসিডেন্ট হন আনোয়ার সাদাত। সাদাতের আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিশরের সম্পর্কের অবনতি হয়। এই অবনতি সত্ত্বেও কিন্তু রাশিয়া সমানে তাদের ফাইটার জেট, ট্যাঙ্ক, অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল, সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল এবং স্কাড মিসাইল সরবরাহ করে চলেছিল। মিশরের পাশাপাশি সোভিয়েতরা সিরিয়াকেও নিয়মিত অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে থাকে। ফলে এই দুটো দেশই সোভিয়েত অস্ত্রে আরও অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। আর সবকিছু এত দ্রুত ঘটছিল যে,

ইসরায়েলের কাছে তা মাথাব্যথার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

নাসেরের মতো সাদাতও মিশরের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে সাদাত সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল-আসাদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে- যৌথভাবে ইসরায়েল আক্রমণ করা হবে।

মিশর ইসরায়েলের দক্ষিণ সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় মিলিটারি মহড়া শুরু করে দিল। ইসরায়েল হাইকমান্ড এটাকে রুটিন এক্সারসাইজ ভেবে অগ্রাহ্য করল। মিশরের আসল মতলব ছিল সুয়েজ ক্যানেল পেরিয়ে ইসরায়েলে হানা দেওয়া। আর এই খবর কিন্তু ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কানে গিয়ে পৌঁছাল। তা সত্ত্বেও ইসরায়েলি হাইকমান্ড এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নিল না।

এই বছরই জর্ডনের রাজা হুসেইন গোপনে জেরুসালেম এসে প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ারের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি গোল্ডা মেয়ারকে জানান যে, মিশর ও সিরিয়া ইসরায়েলে হামলা করার ছক কষছে। স্বাভাবিক ভাবেই ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বিচলিত হয়ে পড়লেন। ইসরায়েল হাইকমান্ড তাঁকে আশ্বস্ত করল

চিন্তা করবেন না, আমরা দেখছি।

কিন্তু তারা এবারেও কোনো ব্যবস্থা করল না।

অক্টোবরের শুরুতে মোসাদ এজেন্ট আসরাফ মারওয়ান ইসরায়েলকে মিশরের হামলার ব্যাপারে সতর্ক করেন। এই আসরাফ মারওয়ান ছিলেন মিশরের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নাসেরের জামাই ও একজন ইসরায়েলের গুপ্তচর। আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর এই সতর্কবার্তা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরেই পৌঁছায়নি।

১ অক্টোবর সাদার্ন কমান্ডের লেফটেন্যান্ট বেঞ্জামিন সিমন তোভ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডেভিড গেদালিয়াহকে একটা রিপোর্ট দেন, যাতে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেন যে, মিশরীয় সেনা যুদ্ধের আয়োজন করছে। অবাক করার মতো ব্যাপার হল গেদালিয়াহ এই রিপোর্ট হেডকোয়ার্টারে পাঠানোর প্রয়োজনই মনে করেননি। সবকিছু খুব অদ্ভুত এবং উলটো পথে চলছিল।

অক্টোবরের ৪ ও ৫ তারিখ সমস্ত সোভিয়েত পরামর্শদাতারা মিশর ও সিরিয়া ত্যাগ করে। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে এই ঘটনাও ইসরায়েলি হেডকোয়ার্টারের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। এই দুটো দিনেই আকাশ থেকে নেওয়া কয়েকটা ছবিতে সীমান্ত এলাকায় অনেক বেশি সংখ্যায় ট্যাঙ্ক, ইনফ্যান্ট্রি ইউনিট ও মিসাইলের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। ৫ অক্টোবর রাত ১২:৩০এ মোসাদের হেডকোয়ার্টারে একটা জরুরি টেলিগ্রাম আসে। মারওয়ান অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের ব্যাপারে আবার সতর্ক করেন ইসরায়েলকে। তিনি মোসাদের প্রধান জ্বি জামিরকে জানান যে, ৬ অক্টোবর মিশর আক্রমণ করবে। আর বড় ব্যাপার ছিল যে এই দিনটি হল ইহুদিদের সবচেয়ে পবিত্র দিন— য়ম কিপ্পুর।

পরের দিন, ৬ অক্টোবর, শুক্রবার ইসরায়েলি ক্যাবিনেট একটা জরুরি বৈঠক করল। চিফ অব স্টাফ জেনারেল এলাজার তৎক্ষণাৎ আকাশপথে হামলা চালানোর অনুমতি চাইলেন। কিন্তু অনুমতি মিলল না।

কারণ কী ছিল?

কারণ আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত হিসাবে পাঁচ বছর কাটানো য়িজাক রাবিন মার্কিন ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসার হেনরি কিসিঞ্জারকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিলেন যে, ইসরায়েল কখনোই প্রথমে আক্রমণ করবে না। সুতরাং, আগ বাড়িয়ে আকাশপথে হামলা চালানোর অনুমতি দেওয়া হল না। তার পরিবর্তে সেনাবাহিনীর একটা ক্ষুদ্র অংশ পাঠানো হল সিনাই উপদ্বীপে।

'য়ম কিপ্পুর' ইহুদিদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র একটা দিন। যারা একেবারেই ধর্মীয় আচার-আচরণ পালনের ধার ঘেঁষে না, তারাও এই দিনটিতে উপবাস করে; যারা কোনোদিন সিনাগগের মুখ দেখেনি, তারাও এই দিনটিতে সিনাগগে যায় প্রার্থনা করতে। গোটা ইসরায়েল সেদিন শান্ত ছিল। দোকানপাট বন্ধ রাস্তায় গাড়িঘোড়া প্রায় ছিল না বললেই চলে।

বেলা ২টো নাগাদ সমস্ত নীরবতা খান খান করে দিয়ে সাইরেন বেজে উঠল। আকাশপথে হামলার সতর্কতা হিসাবে বাজছিল ওই সাইরেন। 'সিক্স ডে'জ ওয়র'-এরপর এই প্রথম বার ওভাবে সাইরেন বাজল। রেডিওতে ঘোষণা হল—সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে সকলে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান।

৩:৩০-এ ঘোষণা করা হল, মিশর ও সিরিয়া ইসরায়েল আক্রমণ করেছে। মুহুর্মুহু সাইরেনের আওয়াজে কেঁপে উঠছিল চতুর্দিক। হাজার হাজার মানুষ তখন ছুটছিল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

বিকেল ৪:০০টের সময় সৈন্যবোঝাই গাড়িতে পথ ভরে গেল। তারা চলেছিল দক্ষিণের সীমান্তে। হাসপাতালগুলো থেকে খুব অসুস্থ রোগী ছাড়া বাকি সবাইকে ডিসচার্জ দেওয়া হল। উদ্দেশ্য একটাই— আসন্ন যুদ্ধে আহত সৈনিকদের জায়গা দিতে হবে যে। প্রতিটা পরিবারের সমস্ত সক্ষম পুরুষদের ডেকে নেওয়া হল যুদ্ধের জন্য। একটু বাদেই ঘোষণা হল যে, মিশরের বাহিনী সুয়েজ ক্যানাল অতিক্রম করেছে। ৫টা নাগাদ ঘোষণা হল, আপার গ্যালিলিতে সিরিয়ার বিমান হামলা করছে।

ইসরায়েলের পক্ষে পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছিল। সুয়েজ ক্যানাল পার করে ২ হাজার মিশরীয় সৈন্য তখন ঢুকে পড়েছে, আর তাদের সুরক্ষা দিয়ে চলেছিল ২৪০টা ফাইটার জেট।

আর এদিকে? ইসরায়েলের পক্ষে?

মিশরীয়দের আটকানোর জন্য মোতায়েন ছিল মাত্র ৪৩৬ জন ইসরায়েলি সেনা! ওধারে গোলান মালভূমি হয়ে গ্যালিলির দিকে এগিয়ে আসছিল সিরিয়ার ১,৪০০ ট্যাঙ্ক। কিন্তু সেই মুহূর্তে ৬০০টা সিরিয়ান ট্যাঙ্কের মোকাবিলা করার জন্য ছিল ইসরায়েলের মাত্র ৫৭টা ট্যাঙ্ক!

সেদিন মধ্য রাত্রে ইসরায়েল রিজার্ভে থাকা ২ লক্ষ সৈন্যকে যুদ্ধে পাঠায়। সেই সব সৈন্যদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিল যারা আগে কোনোদিন কোনো যুদ্ধ লড়েনি। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল বহু দিনের পুরোনো অস্ত্র, যার মধ্যে কিছু ছিল ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার গোছের ইসরায়েলিরা কাদের বিরুদ্ধে লড়ছিল একবার দেখে নিই আমরা–তাদের লড়াই করতে পাঠানো হচ্ছিল ৩ লক্ষ সিরিয়ান ও ৮.৫ লক্ষ মিশরীয় সৈন্য বিরুদ্ধে। প্রতি বারের মতো যথারীতি এবারও মহানন্দে ইরাক য়ম কিপ্পুর যুদ্ধে যোগ দিল। তাদের অবদান ছিল ১৪ হাজার সৈন্য। লেবানন ও আরব লিগের সঙ্গে সামিল হল। আরবদের প্রতি ৬ জন সৈনিকের মোকাবিলা করার জন্য ইসরায়েলের

কাছে ছিল মাত্র ৯ জন সৈনিক। মাত্র ২৫ বছরের আয়ুসম্পন্ন একটা দেশ আরেক বার অস্তিত্ব সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল।

যুদ্ধের প্রথম ৫ দিন ইসরায়েলের পক্ষে ছিল খুবই শোচনীয়। গোটা যুদ্ধে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, তার অর্ধেকটা হয়ে গিয়েছিল ওই প্রথম ৫ দিনেই। ইসরায়েলি সেনার মনোবল তখন তলানিতে। মিশর যুদ্ধে জিতলে কী হবে সেটা ভেবেই সকলে শিহরিত হচ্ছিল। প্রথম ২ দিনেই ইসরায়েলের ১০% এয়ারক্রাফ্ট ধ্বংস হয়ে গেল। প্রথম ধাপে পাঠানো অর্ধেক ট্যাঙ্কও ওই ক'দিনে বিধ্বস্ত। ৮ অক্টোবর অবধি সিনাইতে পাঠানো ২৯০টা ট্যাঙ্কের মধ্যে ১৮০টা ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে সাহায্যের আবেদন জানালেন। তিনি টেলিভিশনে এক ভাষণের মাধ্যমে জর্ডনকে অনুরোধ করলেন যাতে তারা এই যুদ্ধে যোগ না দেয়। আমেরিকার সাহায্য তখন দারুণ জরুরি ছিল। গোটা ইসরায়েল তখন অপেক্ষা করছিল আমেরিকার সাহায্যের।

১০ অক্টোবর টেলিভিশনে প্রধানমন্ত্রী দেশের জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। সোভিয়েদের তীব্র নিন্দা করলেন মেয়ার। তাঁর মত ছিল, মিশর ও সিরিয়ার এই আক্রমণের জন্য দায়ী সোভিয়েত রাশিয়া; কারণ সমস্ত অস্ত্র সরবরাহ করছে তারাই।

আমেরিকা শেষ পর্যন্ত ইসরায়েলকে সাহায্য করতে রাজি হল। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট তাঁর সিকিউরিটি অ্যাডভাইসরকে ইসরায়েলকে সমরাস্ত্র সরবরাহের করার নির্দেশ দিলেন

কিন্তু হঠাৎই আমেরিকার ইসরায়েলের প্রতি এতটা সদয় হওয়ার কারণ?

ক্ষমতার অলিন্দে এখনও একটা খবর ঘোরে, আমেরিকার কাছে গোপন সংবাদ ছিল যে, ইসরায়েল তার পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডারে হাত দিতে চলেছে!

৮ অক্টোবর সিনাইতে ইসরায়েল মিশরীয় বাহিনীকে আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়েছিল। তাই এবার আইডিএফ নিজেদের রণনীতিতে সামান্য পরিবর্তন আনল। তারা এবার মনোযোগ দিল উত্তরে— সিরিয়া সীমান্তে। দক্ষিণে ইসরায়েলি সৈন্যদের নির্দেশ দেওয়া হল যে কোনো ভাবে মিশরকে আটকে রাখো। দু' দিনের মধ্যেই, ১০ অক্টোবর সিরিয়ার বাহিনীকে ইসরায়েলি সেনা ঠেলে পাঠিয়ে দিল সীমানার বাইরে। ১১ অক্টোবর দামাস্কাস ইসরায়েলি আর্টিলারির রেঞ্জের মধ্যে চলে এল। ইসরায়েলের যুদ্ধবিমান সিরিয়ান ডিফেন্স মিনিস্ট্রির বিল্ডিংয়ে বোমাবর্ষণ করল। এই ঘটনায় আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল ইসরায়েল। মোসে দয়ান সিরিয়াকে হুমকি দিলেন, 'সিরিয়ানরা যেন মনে রাখে, যে পথে তারা দামাস্কাস থেকে ইসরায়েলে এসে পৌঁছেছে, সেই একই পথে ইসরায়েলও কিন্তু দামাস্কাস পৌঁছে যেতে পারে।

ইসরায়েলি সেনা দামাস্কাসের দিকে পা বাড়াতেই নড়েচড়ে বসল সোভিয়েত রাশিয়া। ১১ অক্টোবর আমেরিকাতে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আনাতোলি ডোবরিলিন আমেরিকাকে সতর্ক করলেন যে, দামাস্কাসকে রক্ষা করার জন্য রাশিয়া তাদের যুদ্ধবিমান ও রণতরী ব্যবহার করবে। এর ২ দিন বাদে, ১৩ অক্টোবর রিচার্ড নিক্সন আমেরিকান বিমানগুলোকে ইসরায়েলে অস্ত্র পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে দিলেন। এটাই 'অপারেশন নিকেল গ্রাস'।

সিরিয়া বাগে এসে গিয়েছিল। এবার পালা দক্ষিণে মিশরকে দেখে নেওয়ার। ১৪ অক্টোবর মিশর একটা মারাত্মক ভুল করে বসল। রাশিয়ান সারফেস-টু- এয়ার মিসাইল ১২

কিমি রেডিয়াস পর্যন্ত এয়ারক্রাফ্ট হামলা থেকে মিশরীয় সেনাকে সুরক্ষা দিতে পারত। কিন্তু মিশরীয় সেনা ১২ কিমির সেই লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করে হামলা চালাতে গেল। আর তখনই মোক্ষম আঘাত হানল ইসরায়েলি বায়ুসেনার বিমান। মিশর ২৫০টা ট্যাঙ্ক হারাল। ইসরায়েলের ক্ষতি হল নামমাত্র। ইসরায়েল মিশরের ভুলের পুরো ফায়দা তুলে নিল। মিশরের বাহিনীকে তারা কোণঠাসা করে দিল।

১৫ অক্টোবর জেনারেল অ্যারিয়েল শ্যারনের নেতৃত্বে ইসরায়েলি সেনা নতুন উদ্যমে মিশরীয় সেনার ওপর হামলা চালাল। এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ইসরায়েলের প্রায় ৩০০ জন সৈন্য নিহত হল। এক সপ্তাহের মধ্যে ইসরায়েলি সেনা সুয়েজ ক্যানাল অতিক্রম করে দখল নিল তার পশ্চিম পাড়ের। ১৯ অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকা মিশর ও ইসরায়েলকে সিজ-ফায়ার করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এর মধ্যে সংঘর্ষ কিন্তু চলতেই থাকে।

২২ অক্টোবর ইউনাইটেড নেশনসের সিকিউরিটি কাউনসিল রেজোলিউশন ৩:৩৮ পাশ করে এবং সন্ধ্যা ৬:৫২তে যুদ্ধবিরতির ডাক দেয়। মাত্র ২ মিনিট বাকি থাকতে ইসরায়েল রেডিওতে ঘোষণা করে, আমরা যুদ্ধবিরতির শর্ত মানতে রাজি আছি।

সংঘর্ষ তারপরেও জারি ছিল। ২৪ অক্টোবর, রাত ২টো। ইসরায়েলি বাহিনী তখন ঘিরে ধরেছে মিশরীয় সেনাকে। মিশর ও সিরিয়া যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হল।

এই যুদ্ধে আরবরা হারিয়েছে মোট ৪৩২টি যুদ্ধবিমান, যেখানে ইসরায়েল হারিয়েছে মোট ১০২টা ফাইটার জেট। আরবদের পক্ষে নিহত সৈন্যসংখ্যা ৮,২৫৪ আর আহত ১৯,৫৪০। ইসরায়েলের পক্ষে নিহত ও আহতের সংখ্যা যথাক্রমে ২,৬৫৬ ও ৭,২৫০ জন। আরবদের তুলনায় ইসরায়েলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল অনেক কম, কিন্তু ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের তুলনায় এবারের ক্ষয়ক্ষতি ছিল ৩ গুণেরও বেশি।

এখনও পর্যন্ত য়ম কিপ্পুরের যুদ্ধই ছিল শেষ যুদ্ধ যেখানে ইসরায়েল অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। এই যুদ্ধে ইসরায়েল আরবদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে ইসরায়েলের সঙ্গে লড়তে আসা মানে নিজেকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া। এরপরেও ইসরায়েল একাধিক যুদ্ধ লড়েছে, তবে সেগুলোর কোনোটাতেই ইসরায়েলের অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়েনি।

কোথা কোথা খুঁজেছি তোমায়

‘অ্যাডলফ আইখম্যানের নাম শুনেছ?’

‘না স্যর। সে আবার কে?’

এই কথোপকথন হয়েছিল ১৯৬০ সালের ২৩ মে। স্থান: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। প্রশ্নকর্তা ইসরায়েলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়ন। আর উলটো দিকে তাঁর এক তরুণ সহকারী য়িজাক য়াকোভি।

য়াকোভি সত্যিই জানত না যে, আইখম্যান আসলে কে। শুধু য়াকোভি কেন, তার মতো অনেক ইসরায়েলি তরুণই জানত না আইখম্যানের ব্যাপারে।

‘না’ শোনার পর বেন-গুরিয়ন য়াকোভিকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিলেন। তারপর ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘আরে নায়কদের তো সবাই চেনে, দু-চারটে খলনায়কের নামও তো আমাদের মনে রাখা উচিত! এই অ্যাডলফ আইখম্যান নামের লোকটাই তোমার পরিবারের সবাইকে হত্যা করেছিল। এই জানোয়ারটাই ছিল হলোকাস্টের পরিচালক। ফাইনাল সলিউশনের প্রবর্তক। তোমাকে এ-ই পাঠিয়ে দিয়েছিল আউসভিৎসে।’

‘আচ্ছা স্যর, আমি ইহুদি হলেও ওরা আমাকে মেরে ফেলল না কেন?’

‘কারণ তোমার চুল সোনালি রঙের, আর চোখের মণি নীল। ওরা তোমাকে আর্য ভেবেছিল হে!’

একটু থেমে বেন-গুরিয়ন আবার বললেন, ‘আজ তুমি আমার সঙ্গে নেসেটে যাবে। সেখানে আমি একটা বিশেষ ঘোষণা করব। কী, অসুবিধা নেই তো?’

‘কী যে বলেন না আপনি! অসুবিধে আবার কীসের? কিন্তু কী ঘোষণা করবেন আজ?’ য়াকোভি জানতে চায়।

‘ওই যে আইখম্যানের কথা বললাম, ওকেই ধরে আনা হয়েছে!’

আইখম্যান। নাৎসি বাহিনীর নরপিশাচ। কত লক্ষ ইহুদি যে এরই পরিকল্পনায় ডেথ ক্যাম্পে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরেছে তার ইয়ত্তা নেই। ইহুদিদের এভাবে নিকেশ করার থিওরি বের করেছিল এই আইখম্যানই— নাম দিয়েছিল ‘ফাইনাল সলিউশন’। হিটলারের পতন-পরবর্তী সময়ে অন্যান্য যুদ্ধ -অপরাধীদের মতোই জার্মানি থেকে হাওয়া হয়ে যায় আইখম্যান। আর তার অনুসন্ধান চলতে থাকে সারা বিশ্ব জুড়ে। তবে ইসরায়েলের নজর এড়িয়ে থাকার সাধ্য সম্ভবত স্বয়ং ঈশ্বরেরও নেই। আইখম্যানের হদিশ মেলে। তাকে ইসরায়েলে ধরে আনা ও তার বিচার রীতিমতো বিস্ময় জাগানো এক ঘটনা। গোটা পৃথিবীর নজর কেড়েছিল আইখম্যানের বিচার। সারা দুনিয়ার সামনে এসেছিল হলোকাস্টের নৃশংসতা ও বর্বরতার কাহিনি। আইখম্যানকে আর্জেন্টিনা থেকে কীভাবে ধরে আনা হল সেই কাহিনিই লিখলাম।

ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের আগেই আইখম্যান জার্মানি থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছিল এবং এমন ভাবেই হাওয়া হয়েছিল লোকটা যেন মাটিই তাকে খেয়ে ফেলেছে। সে বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে সেটাও কেউ জানত না। সবাই ভুলতে বসেছিল আইখম্যানকে। আর এমন সময়েই আইখম্যানের খোঁজ পাওয়া গেল হঠাৎই এক অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে। খোদ জার্মানি থেকেই আইখম্যানের খবর এল।

১৯৫৭ সালের শেষ দিক। জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট শহর থেকে ইসরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের কাছে একটা খবর আসে।

কী খবর?

তার আগে দেখে নিই খবরটা দিলেন কে?

সংবাদটা দিয়েছিলেন হেসে'র অ্যাটর্নি জেনারেল ড: ফ্রিজ বাওয়ার। তিনি ছিলেন একজন ইহুদি। নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে কোনোক্রমে পালিয়ে বেঁচেছিলেন ভদ্রলোক। জার্মানি থেকে পালিয়ে তিনি প্রথমে ডেনমার্ক ও পরে সুইডেনে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তিনি নিজের জীবন সঁপে দেন নাৎসিদের বিচার ও শাস্তির কাজে।

আইখম্যানের খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোসাদের পক্ষ থেকে বাওয়ারের সঙ্গে দেখা করার জন্য সাউল দারোম নামে একজন সিকিউরিটি অফিসারকে পাঠানো হল। কয়েক দিন পরে দারোম ফিরে এসেই সোজা আইজার হ্যারেলকে রিপোর্ট করলেন।

কী ছিল সেই রিপোর্টে?

'আইখম্যান ইজ অ্যালাইভ! সে আর্জেন্টিনায় আছে।'

অ্যাডলফ আইখম্যান। নাৎসি জার্মান এসএস বাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল। হলোকাস্টের কারিগর। ৬০ লক্ষেরও বেশি ইহুদির হত্যার একজন মূল চক্রী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে আইখম্যান একবার মিত্রবাহিনীর হাতে ধরাও পড়ে যায়। কিন্তু মিত্রবাহিনীর সেপাইরা বুঝতেই পারেনি যে, এ-ই হল কুখ্যাত আইখম্যান। সে তার পরিচয় দিয়েছিল অ্যাডলফ বার্থ নামে। বলেছিল, আমি একজন নাৎসি সৈনিক। সাধারণ সৈন্য। একজন সাধারণ যুদ্ধবন্দি হিসাবেই তাকে রাখা হয়েছিল। কড়া পাহারার ব্যবস্থাও করা হয়নি। আর সেই সুযোগেই ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে সে পালিয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আইখম্যান কোথায় পালিয়েছে এই নিয়ে অনেক জল্পনা ছিল। গুজব ছিল যে, আইখম্যান সিরিয়া, মিশর, কুয়েত কিংবা দক্ষিণ আমেরিকাতে কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে।

তা এত গভীর জলের মাছের সন্ধান কীভাবে পেলেন বাওয়ার?

সে আরেক অদ্ভুত কাহিনি। মাত্র কয়েক মাস আগে বাওয়ারের কাছে আর্জেন্টিনা থেকে একটা চিঠি আসে। চিঠির লেখক লোথার হারমান মিস্টার বাওয়ারের সম্পর্কে শুনেছেন ও জেনেছেন খবরের কাগজ পড়ে। তিনি এটাও জানতেন যে, নাৎসি অপরাধীদের মধ্যে আইখম্যান হল মোস্ট ওয়ান্টেড। ভদ্রলোকের মেয়ে সিলভিয়া এক যুবকের সঙ্গে প্রেম করছিল। কিন্তু প্রণয় কোনো কারণে পরিপূর্ণতা পায় না। মেয়েটি হতাশায় ভুগতে থাকে। হারমান মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারে ছেলেটির নাম নিক আইখম্যান। খটকা লাগে এখানেই। 'আইখম্যান' পদবিটা শোনামাত্রই তাঁর শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। নিশ্চয়ই এই ব্যাটাও খুনি অ্যাডলফ আইখম্যানের কোনো আত্মীয় হবে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লেখেন বাওয়ারকে। লেখেন, এজেন্ট পাঠান; আইখম্যান এখানেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে।

বাওয়ারের ভয় ছিল এই কথা যেন জার্মান সরকারের কানে না যায়। কারণ, তাহলে আইখম্যানকে ধরার আশা আশাই থেকে যাবে। জার্মান বিচার বিভাগে অনেক প্রাক্তন নাৎসি

ছিল। বাওয়ার জার্মান সরকারের ওপর বিন্দুমাত্র ভরসা করতেন না। বুয়েনস্ আইরেসের জার্মান এমব্যাসির কর্মীদেরও সন্দেহ করতেন বাওয়ার। করবেন না-ই বা কেন? একের পর এক নাৎসি যুদ্ধ-অপরাধীদের সাহায্য করে গেছে আর্জেন্টিনার গভর্নমেন্ট। তিনি ভাবতেন যে, আর্জেন্টিনাকে যদি আইখম্যানের কথা বলা হয় তাহলে হয়তো এমব্যাসি থেকেই কেউ তাকে সতর্ক করে দেবে, আর তখনই পাখি ফুড়ুৎ!

বাওয়ার চাইছিলেন আগে মোসাদ নিশ্চিত হোক যে, আর্জেন্টিনায় বসবাসকারী সন্দিগ্ধ লোকটাই আইখম্যান এবং তারপর ইসরায়েলের পক্ষ থেকে তাকে সমর্পণের দাবি করা হবে বা ধরে আনার ব্যবস্থা করা হবে।

সাউল দারোম হ্যারেলের টেবিলের ওপর একটা কাগজ রাখলেন। তাতে লেখা ছিল একটা ঠিকানা— '৪২৬১ কাইয়ে সাকাবুকো, অলিভোস, বুয়েনস আইরেস।'

জানুয়ারির শুরুতেই পাঠানো হল ইমানুয়েল তালমোর নামে মোসাদের স্পেশাল অপারেশন টিমের এক সদস্যকে। বাওয়ারের দেওয়া তথ্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য তাকে পাঠানো হয়। তালমোর ফিরে এসে বললেন, 'আইখম্যান ওই বস্তির মতো এলাকায় থাকতেই পারে না! আশেপাশে কোনো বাড়ি নেই। কারেন্টের কানেকশন অবধি যায়নি বাড়িটায়। একজন এক্স এসএস লেফটেন্যান্ট কর্নেল ওখানে কেন থাকবে? অত কষ্ট করে? আর আমি ও বাড়িতে যে মোটা ভদ্রমহিলাকে দেখলাম সে আইখম্যানের স্ত্রী ভেরা আইখম্যান হতেই পারে না।'

হ্যারেল ধাক্কা খেলেন বটে, কিন্তু দমে গেলেন না। তিনি এবার সরাসরি সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলেন, যিনি বাওয়ারকে চিঠি লিখে আইখম্যানের কথা জানিয়েছিলেন। বাওয়ারের কাছ থেকে খুব সহজেই তাঁর ঠিকানা পাওয়া গেল। লোথার হারমান থাকতেন করোনেল সুয়ারেজ শহরে, বুয়েনস আইরেস থেকে ৩০০ মাইল দূরে। বাওয়ার একটা চিঠি দিয়ে লিখলেন যে, এই চিঠির বাহককে যেন হারমান সবরকমে সহযোগিতা করেন।

১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তেল আভিভ পুলিশের হেড অফ ইনভেস্টিগেশন এফরেম হফস্টেটার পৌঁছলেন করোনেল সুয়ারেজ। ঘরে ঢুকে তিনি দেখলেন অতি সাধারণ পোশাক পরে একজন অন্ধ ব্যক্তি বসে আছেন। সঙ্গে এক যুবতী। অন্ধ ব্যক্তিই লোথার হারমান, আর মেয়েটি সিলভিয়া হারমান। হারমানকে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন ফ্রিজ বাওয়ারের বন্ধু হিসাবে। নিজের আসল নাম গোপন করে বললেন, 'মাইসেলফ কার্ল হাপার্ট।'

হারমান তাকে বললেন, 'জার্মানিতে নাৎসিরা ক্ষমতায় আসার আগে আমি পুলিশে চাকরি করতাম। আমার বাবা-মাকে নাৎসিরা খুন করেছিল, আর আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল ডাখাউতে। গেস্টাপো বাহিনীর মারের চোটে আমি অন্ধ হয়ে যাই। পরে আমি আর আমার স্ত্রী আর্জেন্টিনায় এসে সংসার পাতি।'

নিজের মেয়ের ব্যর্থ প্রেম এবং আইখম্যান পদবি শোনার পরের সব কথাই খুলে বললেন হারমান। 'আমি চাই, আমার বাবা-মায়ের খুনিদের উচিত শাস্তি হোক,' বলে কার্লের দিকে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে হারমান তাকিয়ে রইলেন।

তিনি এরপর তাঁর মেয়ে সিলভিয়াকে সবকিছু খুলে বলতে বলেন। সিলভিয়া বলল, 'প্রায় দেড় বছর আগে আমরা বুয়েনস আইরেসের কাছে অলিভোসে থাকতাম। ওখানেই

নিক আইখম্যানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। একদিন কথায় কথায় নিক বলে ফেলেছিল জার্মানরা সব ইহুদিদের শেষ করে দিলেই ভালো হত। কথাটা আমার গায়ে লেগে যায়। আসলে নিক আমার ইহুদি অরিজিনের ব্যাপারটা জানত না। আরেক দিন ও বলল যে, ওর বাবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান বাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। এভাবেই অনেক কথা বলত আমার সঙ্গে। বুয়েনস আইরেস থেকে আমরা চলে আসার পরেও আমাদের মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান চলতে থাকে। নিকের পাঠানো চিঠিতে ওর নিজের ঠিকানা লেখা থাকত না আর আমি চিঠি পাঠাতাম নিকের এক বন্ধুর ঠিকানায়। এটা শুনেই বাবার মনে সন্দেহ দানা বাঁধে।'

হারমান মেয়েকে নিয়ে একদিন অলিভোসে পৌঁছান। সিলভিয়া তার বন্ধুদের সাহায্যে নিকের বাড়ির ঠিকানাও জোগাড় করে ফেলে। তার সাকাবুকো স্ট্রিটের বাড়িতেও তারা পৌঁছে যায়। নিক তখন বাড়িতে ছিল না। সিলভিয়া একজন ভদ্রলোককে দেখে। টাকমাথা, সরু গোঁফ, চোখে চশমা ছিল। জানা গেল যে, তিনিই নিকের বাবা।

হারমান এবার বললেন যে, তিনি প্রয়োজনে সিলভিয়াকে নিয়ে আবার বুয়েনস আইরেস যেতে রাজি। হফস্টেটার এবার হারমানকে আইখম্যানের শনাক্তকরণের জন্য কয়েকটা জিনিস দিলেন— তার ফটো, তার আঙুলের ছাপ এবং আরও কিছু কাগজপত্র। কিছু টাকাও দেওয়া হল।

কয়েক মাস বাদে মোসাদের অফিসে হারমানের রিপোর্ট পৌঁছল। তাতে তিনি লিখেছিলেন, আইখম্যানের সবকিছুই জানা গেছে। সাকাবুকো স্ট্রিটের বাড়ির মালিক হল একজন অস্ট্রিয়ান, ফ্রান্সিসকো স্মিট। তিনি ডাগুটো ও ক্লিমেন্ট পরিবারকে বাড়িটা ভাড়া দিয়েছিলেন। হারমান জোর গলায় দাবি করেন যে, স্মিটই আইখম্যান।

হ্যারেল এবার আর একজন এজেন্টকে পাঠালেন আর্জেন্টিনাতে, হারমানের কথার সত্যতা যাচাই করার দরকার ছিল। সেই এজেন্ট তারবার্তা পাঠাল, 'ফ্রান্সিসকো স্মিট আইখম্যান নয়।'

এবার বিরক্ত হলেন। হারমান কি তবে বিশ্বাসযোগ্য নন? তিনি এই কেসটা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

আইখম্যানের ব্যাপারটা সবাই প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল। কারণ কেস বন্ধ হওয়ার পরে মাঝে কেটে গেছে দেড় বছর। এমন একটা সময়ে ফ্রিজ বাওয়ার ইসরায়েলে আসেন। তিনি কেস বন্ধ করে দেওয়ায় হ্যারেলের ওপর রেগেও ছিলেন। ভদ্রলোক সরাসরি দেখা করলেন অ্যাটর্নি জেনারেল হাইম কোহেনের সঙ্গে। তিনি বললেন যে, মোসাদ যদি না পারে তাহলে তিনি জার্মান সরকারকে ঘটনাটা জানাতে বাধ্য হবেন। বাওয়ার এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে এসেছিলেন এবং তা ছিল— রিকার্ডো ক্লিমেন্ট ছদ্মনামে আইখম্যান আর্জেন্টিনাতেই আছে।

হ্যারেল ব্যাপারটা ধরে ফেললেন—- হারমান তাহলে ভুল করে ক্লিমেন্টের পরিবর্তে ফ্রান্সিসকো স্মিটের নাম বলেছিল। ভাড়াটে হিসাবে ক্লিমেন্ট পরিবারের নাম কিন্তু সে জানিয়েছিল। একজন দক্ষ মোসাদ এজেন্টকে পাঠালে কেসটা হয়তো অনেক আগেই মিটে যেত।

১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারির দিকে জ্বি আহারোনিকে বুয়েনস আইরেসে পাঠানো হল। দীর্ঘ দেহ, ছিপছিপে চেহারার ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন একজন মোসাদ এজেন্ট আহারোনি। তিনি

সেখানে পৌঁছেই সেখানে বসবাসকারী এক ইহুদি বন্ধুর সাহায্য নিলেন। বন্ধুটি সাকাবুকো স্ট্রিটের সেই বাড়িতে গেলেন। যদি কোনো হদিশ মেলে। কিন্তু তাঁকে হতাশ হয়েই ফিরতে হল। বাড়ি খালি। শুধু কয়েক জন কাঠমিস্ত্রি ও রংয়ের মিস্ত্রি কাজ করছিল।

এরপর আরেক জনে পাঠানো হল বেলবয় হিসাবে। তার হাতে একটা উপহার যাতে লাগানো একটা কার্ড। কার্ডে লেখা— 'ডিয়ার নিক,

'ডিয়ার নিক, জন্মদিনের শুভেচ্ছা।' রংমিস্ত্রিদের অনেক অনুরোধ করার পর একজনের কাছ থেকে নিকদের নতুন ঠিকানা পাওয়া গেল। সে বলে দিল, 'ট্রেনে করে সান ফার্নান্ডো স্টেশনে যেতে হবে। তারপর ২০৩ নং বাস ধরে নামতে হবে আভিজেন্ডাতে সেখানে নামলে রাস্তাতেই একটা কিয়স্ক দেখা যাবে। তার ডান দিকে অন্য বাড়িগুলো থেকে দূরে ছোট্ট একটা ইটের বাড়ি দেখা যাবে। ওটাই ক্লিমেন্টদের বাড়ি।'

মোসাদের কাছে এটুকুই ছিল যথেষ্ট 1

পরের দিনই আহারোনি সেই পথেই বাড়িটার সামনে গিয়ে পৌঁছালেন। তিনি দরজায় নক করলেন। দরজা খুললেন একজন ভদ্রমহিলা। আহারোনি ভদ্রমহিলাকে বললেন, 'আমি একটা আমেরিকান সেলাই মেশিন কোম্পানি থেকে এসেছি। আমরা আমাদের কারখানার জন্য জমি খুঁজছি। আপনাদের বাড়িটা আমরা কিনতে চাই।'

কথা বলার সময় তিনি নিজের হাতব্যাগে থাকা লুকোনো ক্যামেরার সাহায্যে ক্লিমেন্ট-হাউসের ছবি বিভিন্ন কোণ থেকে তুলে নিলেন

পরের দিন কাগজপত্র ঘেঁটে তিনি বার করলেন যে জমির মালিকানা রয়েছে ভেরা লিবেল ডি আইখম্যানের নামে। আর্জেন্টিনার নিয়ম অনুযায়ী মহিলাদের ক্ষেত্রে বিয়ের আগের ও পরের দুটো নামই দলিল নথিভুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। রিকার্ডো ক্লিমেন্ট নিজের নামে জমি নথিভুক্ত করাননি।

এরপর কয়েক দিন ওই বাড়ির আশেপাশে চক্কর কাটলেন আহারোনি। কিন্তু ক্লিমেন্টের দেখা মিলল না। তবে তিনিও একটা বিশেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দিনটা ছিল ২১ মার্চ। অ্যাডলফ আইখম্যান ও ভেরা লিবেলের পঁচিশতম বিবাহ বার্ষিকী। আহারোনি ধরেই নিয়েছিলেন যে, এই দিন নিশ্চয়ই আইখম্যান আসবে।

২১ মার্চ আহারোনি আবার ক্যামেরা নিয়ে গেলেন। বাড়ির ইয়ার্ডে তিনি একজন পুরুষের দর্শন পেলেন এবার। রোগা, টাকমাথা, মাঝারি উচ্চতার একজনকে দেখলেন। নাকটা ছিল বেশ লম্বা ও নাকের নীচে সরু গোঁফও ছিল। চোখে চশমা। ইন্টেলিজেন্স ফাইলের সঙ্গে সব হুবহু মিলে যাচ্ছিল।

ইসরায়েলে হ্যারেল বেন-গুরিয়নের বাড়িতে গিয়ে খবর গেল, 'আমরা আইখম্যানকে আর্জেন্টিনাতে খুঁজে পেয়েছি। এবার তাকে ধরে আনতে পারব।'

বেন-গুরিয়ন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন— 'ব্রিং হিম ডেড অর অ্যালাইভ!' তারপর একটু থেমে বললেন— 'ব্রিং হিম অ্যালাইভ। আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য একটা দৃষ্টান্ত গড়ে তোলার দরকার আছে।'

হ্যারেলের সামনে এবার নতুন চ্যালেঞ্জ ছিল। আইখম্যানকে আর্জেন্টিনা থেকে অপহরণ করার চ্যালেঞ্জ। যদিও ব্যাপারটা বেআইনি, আর্জেন্টিনা শত্রু-রাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু

অপহরণ না করলে তাকে জীবিত আনাও অসম্ভব।

এই অপারেশনের জন্য একটা টিম তৈরি করা হল। তাতে রইল ১০ জন পুরুষ আর একজন মহিলা। এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখে নেওয়া যাক-

১. রাফি ঈটান: তিনি দলের কমান্ডার। ঈটানের বাবা-মা রাশিয়া থেকে প্যালেস্টাইনে এসেছিল। এখানেই এক কিবুজে তাঁর জন্ম। একজন দুর্ধর্ষ ইনটেলিজেন্স অফিসার! ঠান্ডা মাথায় কতটা নৃশংস কাজ করা যায় সেটা ঈটানকে না দেখে বোঝা সম্ভব নয়। মাত্র ১২ বছর বয়সেই তিনি যোগ দিয়েছিলেন হেগানাতে। ইহুদিদের অনেক শত্রুকে তিনি নিজের হাতে হত্যা করেছেন। ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিতে ঈটান কিংবদন্তীসম চরিত্র।

২. জ্বি মালকিন: এই দলের সহকারী কমান্ডার। তাঁর জন্ম পোল্যান্ডে। পরে প্যালেস্টাইনে এসে হেগানায় যোগ দেন। তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি ও ছদ্মবেশ ধরার পটুতার জন্য তাঁকে এই মিশনে নেওয়া হয়।

৩. আব্রাহাম সালোম: এই দলের ডেপুটি কমান্ডার। জন্ম অস্ট্রিয়াতে। ১৯৩৮ সালে নাইট অব শ্যাটারড গ্লাসের ঘটনার দিন প্রায় ৩০ জন ইহুদি-বিদ্বেষীর হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্যালেস্টাইনে অনুপ্রবেশ করার পর তিনি হেগানাতে যোগ দেন ও পরে সিন বেটের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কমান্ডার হন। নিখুঁত পরিকল্পনা করা ও দক্ষতার সঙ্গে রসদ সরবরাহ করার ক্ষমতা ছিল তাঁর সহজাত।

৪. মোসে তাভর: লিথুয়ানিয়ায় জন্ম। শক্তসমর্থ, পেটানো চেহারা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের হয়ে লড়াই করা এক সৈনিক। অপহরণের জন্য এরকম শক্তিশালী লোকের প্রয়োজন ছিল। তবে অপহরণের চেয়ে সরাসরি আইখম্যানকে সরাসরি হত্যা করতেই বেশি উৎসাহী ছিলেন তিনি।

৫. সালোম দানি: জন্ম হাঙ্গেরিতে। তিনি একজন উঁচু দরের শিল্পী ও জালিয়াতিতে ওস্তাদ। তিনি ও তাঁর বোন হলোকাস্টের সময় নকল পারমিট বানিয়ে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলেন। চুপচাপ ও শান্ত স্বভাবের মানুষ। বুয়েনস আইরেসে থেকে তিনি মোসাদ টিমের জন্য যাবতীয় জাল দস্তাবেজ তৈরি করবেন এটাই ঠিক করা হয়েছিল।

৬. য়াকভ গ্যাট: জন্ম ট্রানসিলভানিয়াতে। সিন বেটের একজন এজেন্ট। স্প্যানিশটা খুব ভালো বলতে ও বুঝতে পারতেন। আর্জেন্টিনার সরকারি ভাষা স্প্যানিশ। সুতরাং ভালো স্প্যানিশ জানা লোকের প্রয়োজন ছিল। তাঁর কাজ ছিল এজেন্টদের জন্য নিরাপদ বাড়ি খোঁজা ও গাড়ির মেরামত করা। ইনিও ছিলেন খুব ঠান্ডা মাথার লোক।

৭. য়েহুডিথ নিসিয়াহু: তিনি এই মিশনের একমাত্র মহিলা সদস্য। নেদারল্যান্ডে জন্ম। একজন মোসাদ এজেন্ট। ভাড়া বাড়িতে কেবলমাত্র পুরুষদের উপস্থিতি যাতে সন্দেহ তৈরি না করে এ জন্য তাঁকে এই মিশনে সামিল করা হয়েছিল।

৮. রিকজাক নেসের: জন্ম চেকোস্লোভাকিয়ায়। বয়সে তরুণ। সরল, সাদাসিধে ও নিরীহ চেহারার জন্য তাঁকে দলে নেওয়া হয়েছিল। তাঁর কাজ ছিল বাড়ি খোঁজা, গাড়ি এবং যাবতীয় সরঞ্জাম জোগাড় করা।

৯. য়োনা ইলিয়ান: তেল আভিভের একজন নামকরা ডাক্তার। টিমের কোনো সদস্য বা যাকে অপহরণ করা হবে তার যে কোনো রকম মেডিকাল ট্রিটমেন্টের জন্য তাঁকে দলে নেওয়া হয়। তাছাড়া আইখম্যানকে মাদক ইনজেক্ট করার প্রয়োজনেও তাঁকে লাগতই।

১০. এফরেদম ইলানি: তালা খোলার ব্যাপারে বিশারদ, আর আর্জেন্টিনার অলিগলি ছিল তাঁর চেনা। বুয়েনস আইরেসে ইসরায়েলি এমব্যাসি এবং টিমের সঙ্গে একমাত্র তিনিই যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করবেন বলে ঠিক হয়েছিল।

১১. জ্বি আহারোনি: জন্ম জার্মানিতে। তিনি এই টিমের একমাত্র জার্মান ভাষা জানা সদস্য। সান ফার্নান্দোতে আইখম্যানের বাড়ি তিনিই খুঁজে বের করেন। তিনি ছিলেন সিন বেটের একজন ইনভেস্টিগেটর। ঠিক করা হয় যে, আইখম্যানের সঙ্গে একমাত্র তিনিই কথা বলবেন।

হ্যারেল নিজেও এই টিমের সদস্য ছিলেন। তিনিও পুরো মিশনে বুয়েনস আইরেসে থাকবেন এমনটাই ঠিক হয়েছিল।

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে বিভিন্ন দিক থেকে ৪ জনের একটা টিম আর্জেন্টিনাতে ঢুকল। তাঁরা ওয়াকি টকি, ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম, মেডিকাল কিট, সালোম দানির ভ্রাম্যমান ল্যাবের অংশবিশেষ (জাল পাসপোর্ট, এফিডেভিট বা জাল কাগজ বানাবার জন্য) আর্জেন্টিনাতে সুকৌশলে পাচার করে নিয়ে গিয়েছিলেন। বুয়েনস আইরেসে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেওয়া হয়, যার কোড নেম দেওয়া হয় ‘দ্য ক্যাসল’। পরের দিনই টিম রওনা দেয় সান ফার্নান্দোর উদ্দেশ্যে। তাঁরা যখন পৌঁছালেন, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ২০২ নং রুটে ধীরে ধীরে এগোনোর সময়েই সৌভাগ্যবশত ক্লিমেন্টকে দেখা গেল। কোনোদিকে না তাকিয়ে সে সোজা তার বাড়িতে ঢুকে গেল। এজেন্টরা বুঝে গেছিল যে, ওই সময়টায় ক্লিমেন্ট (আইখম্যানের ছদ্মনাম) রোজ বাড়ি ফেরে। তখন ঠিক করা হয় যে, এভাবেই কোনো এক সন্ধ্যায় বাসস্টপ ও তার বাড়ির মাঝের রাস্তা থেকেই তাকে ধরে তুলে নেওয়া হবে গাড়িতে।

সেই রাতেই হ্যারেল ইসরায়েলে বার্তা পাঠান, অপারেশন করা সম্ভব।

আইখম্যানকে অপহরণ না হয় করা গেল, কিন্তু তাকে ইসরায়েলে কীভাবে নিয়ে যাওয়া যাবে?

এটা একটা চিন্তার বিষয় ছিল। এই সময় হ্যারেল জানতে পারেন যে, ২০ মে আর্জেন্টিনা পালন করতে চলেছে তাদের ১৫০তম স্বাধীনতা দিবস সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা আসবেন। শিক্ষামন্ত্রী আব্বা এবানের নেতৃত্বে ইসরায়েলের একটা প্রতিনিধি দলও বিশেষ বিমানে চড়ে আসছে বলে জানা গেল। হ্যারেল এক সুবর্ণ সুযোগ দেখতে পেলেন। তিনি ওই বিমানে করেই আইখম্যানকে ইসরায়েলে পাঠানোর প্ল্যান করে ফেললেন।

বিমান বুয়েনস আইরেসে পৌঁছানোর কথা ১১ মে। পাইলটকে নির্দেশ দেওয়াই ছিল যেন একজন অভিজ্ঞ মেকানিককে নেওয়া হয়, যাতে প্রয়োজন পড়লে আর্জেন্টিনার ল্যান্ড ক্রু ছাড়াই যেন বিমান টেক অফ করতে পারে।

১ মে হ্যারেল ইউরোপিয়ান পাসপোর্টে বুয়েনস আইরেস পৌঁছান। ৯ মে একটি অ্যাপার্টমেন্টে টিমের সকল সদস্য একত্রিত হল। এই অ্যাপার্টমেন্টের কোড নেম দেওয়া হয়েছিল ‘হাইটস’।

ঠিক হল সাক্ষাৎ ও পরিকল্পনা করা হবে ক্যাফেগুলোতে। সকলেই জানত কোন সময়, কোন ক্যাফেতে হ্যারেল থাকবেন। ওই ক্যাফে থেকেই তিনি দলের লোকেদের

নির্দেশ দিতেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হিসাবে বেছে নেওয়া হল এয়ারপোর্টের রাস্তায় একটা অ্যাপার্টমেন্টকে। এর কোড নেম দেওয়া হয়েছিল 'দ্য বেস'। আইখম্যানকে ধরে আনার পর এখানেই রাখার পরিকল্পনা করা হয়।

সব ঠিক করার পর ১০ তারিখে আইখম্যানকে অপহরণের প্ল্যান করা হয়। স্মুদলি হয়েও যেত। ঠিকই ছিল যে, ইসরায়েলি বিমান আসবে ১১ তারিখ। আর ১২ তারিখে সেই বিমানে আইখম্যানকে নিয়ে যাওয়া হবে ইসরায়েলে।

সব ঠিক চলছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তের একটা ঘোষণায় গোটা পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হল। আসলে প্রচুর সংখ্যক প্রতিনিধি এসে যাওয়াতে তাদের জায়গা দিতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিল আর্জেন্টিনা কর্তৃপক্ষ। তাই তারা ইসরায়েলকে জানিয়ে দেয় যে, ইসরায়েলি প্রতিনিধিরা যেন ১১ মে'র পরিবর্তে ১৯ মে এসে পৌঁছায়। সাংঘাতিক কাণ্ড! এর ফলে হ্যারেলের কাছে দুটো অপশন রইল। এক, অপহরণের দিন পিছিয়ে দেওয়া; দুই, ১০ মে অপহরণের পর আরও ৯ থেকে ১০ দিন আইখম্যানকে লুকিয়ে রাখা। দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ আইখম্যানের পরিবার পুলিশে খবর দিলে পুলিশ তন্নতন্ন করে খোঁজা শুরু করে দেবে। আর দুর্ভাগ্যক্রমে তারা যদি মোসাদ এজেন্টদের কবজায় তাকে খুঁজে পায় তাহলে এক কেলেংকারি কাণ্ড হবে। কিন্তু হ্যারেল দ্বিতীয় বিকল্পটাই বেছে নিলেন। কেবল অপহরণের দিন একদিন পিছিয়ে ১০ তারিখের জায়গায় ১১ তারিখ করা হল। সময় ঠিক করা হল সন্ধ্যা ৭: ৪০ মিনিটে।

১১ মে, সন্ধ্যা ৬:৩০। দুটো গাড়ি রওনা দিল গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। যে গাড়িতে আইখম্যানকে তোলা হবে, তার মধ্যে ছিলেন রাফি ঈটান, মোসে তাভর, জ্বি মালকিন ও জ্বি আহারোনি। জ্বি আহারোনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন। দ্বিতীয় গাড়িটায় ছিলেন আব্রাহাম সালোম, য়াকভ গ্যাট ও ড: ইলিয়ান। ড: ইলিয়ানের কাছে ছিল যন্ত্রপাতি ও ওষুধ ভর্তি একটা ব্যাগ।

৭:৩৫ নাগাদ দেখা গেল দুটো গাড়িকেই পার্ক করা রয়েছে গ্যারিবল্ডি স্ট্রিটে। তখন অন্ধকার নেমে এসেছে চতুর্দিকে। দুজন এজেন্ট গাড়ির হুড খুলে এমন ভান করতে থাকলেন যে কেউ দেখলে ভাববে যে, তাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। আহারোনি কিন্তু গাড়ির স্টিয়ারিং ধরেই বসে রইলেন। আরেক জন নজর রাখছিলেন বাইরে— আইখম্যান আসছে কিনা।

ইহুদিরা নাৎসিদের কী পরিমাণে ঘেন্না করে তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। একজন এজেন্ট তো হাতে গ্লাভস পরে এসেছিলেন শুধুমাত্র এই কারণে যাতে সরাসরি আইখম্যানকে স্পর্শ না করতে হয়! দ্বিতীয় গাড়িটা খানিক দূরে একটা গলির মুখে আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। সেখানেও দুজন দাঁড়িয়েছিল গাড়ির বাইরে, আর একজন চালকের আসনে বসে ছিল। প্রতিটা সেকেন্ডের কাউন্টিং চলছিল। আর তাঁদের মনে তখন একটাই প্রশ্ন—- কোথায় আইখম্যান?

৭:৪০ নাগাদ একটা বাস এসে দাঁড়াল। নড়েচড়ে বসল সকলে। কিন্তু বাস থেকে কেউ নামল না। ঈটান বিড়বিড় করে বললেন, 'এমনটা তো হওয়ার কথা নয়! তাহলে কি আগে থেকেই খবর পেয়ে গেছে?'

৭:৫০ নাগাদ আরো দুটো বাস পরপর এল। কিন্তু আইখম্যানের দেখা নেই। এবার সবার বুক দুরুদুরু করতে লাগল। আইখম্যান কি তবে বিপদের গন্ধ পেয়ে পালিয়েছে?

ঘড়িতে পাক্কা ৮টা বাজল। হ্যারেলের নির্দেশ ছিল ৮টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার। ৮টার পর আর কেউ সেখানে থাকবে না। কিন্তু রাফি ঈটান ৮:৩০টা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন বলে ঠিক করলেন।

৮:০৫ নাগাদ আরেকটা বাস এসে থামল। বাস থেকে আইখম্যান ওরফে ক্লিমেন্ট নামল। তার ওপর প্রথম নজর পড়ে আভ্রাহাম সালোমের। গাড়ির কাছাকাছি আসতেই সালোম গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে দিল। কিছুক্ষণের জন্য চোখে ধাঁধা লেগে যায় ক্লিমেন্টের। সে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। জ্বি মালকিন তখন ক্লিমেন্টের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে স্প্যানিশে বলে, 'এক মিনিট'। ক্লিমেন্ট তখন নিজের টর্চ লাইটটা খোঁজার জন্য পকেটে হাত ঢোকায়। এজেন্ট মালকিন ভাবলেন ক্লিমেন্ট বোধহয় পকেট থেকে পিস্তল বের করছে। তৎক্ষণাৎ তিনি ক্লিমেন্টের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ক্লিমেন্ট জোরে চিৎকার করার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে সব এজেন্ট তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাকে জাপটে ধরে তুলে নিয়ে গাড়ির ভেতরে শুইয়ে দিল। তার মুখ হাত দিয়ে চেপে রাখা হল, যাতে সে আর চিৎকার না করতে পারে। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে এগোতে শুরু করে দিল। পিছু পিছু চলল দ্বিতীয় গাড়িটাও।

ক্লিমেন্টের হাত-পা বেঁধে ফেলা হল। মুখও বন্ধ করে দিল এজেন্টরা, যাতে সে আওয়াজ না করতে পারে। তার নিজের চশমা খুলে পরিয়ে দেওয়া হল

একটা কালো চশমা। আর জার্মান ভাষায় বলে দেওয়া হল, 'নড়াচড়া করেছ কি মরেছ!' এরপর অবশ্য গোটা রাস্তায় সে আর কোনো প্রতিরোধ করেনি। রাফি ঈটান এবার ক্লিমেন্টের শার্টের ভেতরে হাত ঢোকালেন। তার বাম বগলের তলায় আর পেটের ডান দিকে তিনি কিছু একটা খুঁজছিলেন।

কিন্তু কী খুঁজছিলেন ঈটান?

নাৎসি বাহিনীতে থাকা সকলের গায়ে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে একটা দাগ বানানো হত। পার্মানেন্ট চিহ্ন। হুলিয়া। সেটারই সন্ধান করছিলেন ঈটান। পেয়েও গেলেন।

কাঙ্ক্ষিত নিশানের সন্ধান পেয়ে ঈটান মালকিনের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন। মানেটা ছিল— হি ইজ আইখম্যান!

রাত ১০: ৫৫ নাগাদ গাড়িগুলো গিয়ে থামল 'দ্য বেস'-এর সামনে। এটা সেই অ্যাপার্টমেন্ট, যেখানে আইখম্যানকে ধরে এনে লুকিয়ে রাখা হবে বলে ঠিক করা হয়েছিল। আইখম্যান অপহরণকারীদের মাঝে টলতে টলতে বাড়ির ভেতর ঢুকল। তার পোশাক খুলে সারা শরীর তল্লাশি করে নিল এজেন্টরা। হাঁ করিয়ে দেখে নেওয়া হল তার মুখের ভেতরটাও।

এরপর আরম্ভ হল ইনটারোগেশন। সবটাই জার্মান ভাষায়। টুপি কিংবা জুতোর মাপ, জন্মদিনের তারিখ, বাবা-মায়ের নাম এসব জিজ্ঞাসা করা হল। সে-ও রোবটের মতো জবাব দিতে থাকল।

'তোমার জার্মান নাৎসি পার্টির কার্ড নম্বর?'

'৪৫৩২৬।'

‘তোমার এসএস নম্বর?’

‘৬৩৭৫২।’

‘নাম?’

‘রিকার্ডো ক্লিমেন্ট।’

‘তোমার নাম কী-ই?’

দ্বিতীয় বারে সে উত্তর দিল, ‘অটো হেনিংগার।

তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করা হল, ‘তোমার নাম জানতে চাওয়া হচ্ছে।’

‘অ্যাডলফ আইখম্যান।’

জবাব শুনে সব এজেন্ট নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। এত সহজে যে সে নিজের পরিচয় স্বীকার করবে এটা কেউই ভাবেনি।

এবার নিজে থেকেই মুখ খুলল সে, ‘আমি অ্যাডলফ আইখম্যান। আপনারা ইসরায়েলি, তাই তো? শুনুন, হিব্রু কিছুটা জানি। ওয়ারশতে একজন রাবাইয়ের কাছে শিখেছিলাম।’

হ্যারেলকে তাঁর দলের দুজন সদস্য ওই রাতেই একটা ক্যাফেতে গিয়ে খবরটা দিলেন। আইখম্যানের স্বীকারোক্তির কথা শুনে দারুণ খুশি হলেন হ্যারেল।

এদিকে আইখম্যানকে ধরার পর ইসরায়েলি এজেন্টদের যতটা আনন্দ হয়েছিল, তার সঙ্গে একই ছাদের নীচে সময় কাটানো হয়ে উঠছিল ততটাই বিশ্রী ব্যাপার। যে খুনিটা এক সময়ে তাঁদের পরিজনদের হত্যা করেছে, সেই লোকটাকেই যত্ন করে লুকিয়ে রাখতে হচ্ছিল। দিন-রাত ২৪টা ঘণ্টা তার সমস্ত দরকার মেটাতে হচ্ছিল এজেন্টদেরই। আইখম্যানকে কোনো সময়েই একদমই একা ছাড়া হচ্ছিল না, এমনকী টয়লেটেও তাকে একা যেতে দেওয়া হচ্ছিল না। আর যাইহোক, তাকে আত্মহত্যা করতে দেওয়া যাবে না।

য়েহুডিথ নিসিয়াহু আইখম্যানের জন্য রান্না করতেন এবং তাকে খেতেও দিতেন। কিন্তু তার এঁটো বাসন ধুতেন না। আইখম্যানকে তীব্র ঘেন্না করতেন যে। প্রতি ২৪ ঘণ্টা অন্তর পালটে পালটে তাঁরা পাহারায় থাকতেন।

‘দ্য বেস’-এ কাটানো ১০ দিন ছিল তাঁদের জীবনের দীর্ঘতম দশটা দিন। সময় যেন কাটতেই চাইছিল না। আর ধরা পড়ার একটা ভয় তো সবসময়ই মাথায় ঘুরছিল।

আইখম্যানের সঙ্গে কথা বলত একমাত্র আহারোনি। আইখম্যান তার অপহরণকারীদের সব কথাই বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিচ্ছিল। সে যেন নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়েছিল।

এদিকে আর্জেন্টিনাতে আইখম্যানের খোঁজ শুরু হয়ে গেছে। খোঁজ নেওয়া হচ্ছে হাসপাতালে, মর্গে ও থানায়। আর হ্যারেলের কানেও পৌঁছেছে এই কথা। তিনি তার টিমকে নির্দেশ দিয়েছিলেন— আইখম্যানকে কোনোভাবেই হাতছাড়া করা যাবে না। ঘরের ভেতর আরেকটা গুপ্ত ঘর বানানো হয়েছে যাতে পুলিশ এলে তাকে লুকিয়ে রাখা যায়।

এমারজেন্সিতে তাকে বাইরে বার করার জন্য একটা আলাদা দরজার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

হ্যারেল অবশ্য এসব কিছু মাথায় রেখে বলেছিলেন, ‘যদি এর মধ্যে আর্জেন্টাইন পুলিশ তোমাদের নিতান্তই ধরে ফেলে, তাহলে একজন এজেন্ট একটা হাতকড়ার একদিক নিজের হাতে লাগাবে, আর অন্য দিকটা লাগাবে আইখম্যানের হাতে। তারপর হ্যান্ডকাফটার চাবিটা ছুড়ে ফেলে দেবে, যাতে কেউ খুঁজে না পায়। আর পুলিশকে বলবে যে, তোমরা ইসরায়েলি। হলোকাস্টের ঘৃণ্য অপরাধী আইখম্যানকে গ্রেফতার করেছ। তার বিচার হবে। এরপর তোমরা আমার নাম আর আমার হোটেলের ঠিকানাটাও দিয়ে দেবে। যদি তোমরা ধরা পড়ো, তাহলে আমারও অ্যারেস্ট হওয়া উচিত।’

এর কয়েক দিন পর মোসাদের টিম আইখম্যানের কাছ থেকে একটা লিখিত জবানবন্দি নেয়। তাতে সে লেখে যে, সে স্বেচ্ছায় বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য ইসরায়েল যেতে প্রস্তুত।

১৮ মে তেল আভিভের নিকটবর্তী লড ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে ইসরায়েল এয়ারলাইন্সের ‘হুইসপারিং জায়েন্ট’ নামক বিমানটি ছাড়ল আর্জেন্টিনার উদ্দেশে। ইসরায়েলি প্রতিনিধি দল ছাড়া বিমানে কয়েক জন সাধারণ যাত্রীও ছিল। রোমে পৌঁছানোর পর আরও ৩ জন যাত্রী উঠল। কয়েক ঘণ্টা পরে তারা এয়ারলাইন্সের কর্মীদের ইউনিফর্মে বিমানের করিডরের মধ্যে চলাফেরা করতে লাগল। তাঁরা ছিলেন মোসাদ এজেন্ট। এদের মধ্যে একজনের নাম য়েহুদা কারমেল। মাত্র কয়েক দিন আগেই তাঁর বস তাঁকে নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। টেবিলের ওপর রাখা একটা ছবিতে তাঁর চোখ আটকে যায়। ওই ছবির সঙ্গে কারমেলের চেহারার অসম্ভব রকমের মিল ছিল। ছবিটা দেখেই সে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘এটা কার ছবি?’

‘অ্যাডলফ আইখম্যানের।’

এবার আরও বেশি অবাক হওয়ার পালা। তাকে জানানো হল যে, আইখম্যানের ডামি বা নকল হিসাবে তাঁকে একটা মিশনের জন্য আর্জেন্টিনা পাঠানো হবে। হ্যারেলের প্ল্যানই ছিল কারমেলকে একজন ইসরায়েল এয়ারলাইন্সের কর্মী হিসাবে আর্জেন্টিনায় নিয়ে যাওয়া ও তারপর তার ইউনিফর্ম আর পরিচয়পত্র ব্যবহার করে আইখম্যানকে তার জায়গায় ইসরায়েলে পাঠিয়ে দেওয়া। কারমেল যে পাসপোর্ট ব্যবহার করে আর্জেন্টিনায় গিয়েছিলেন সেখানে তাঁর নাম ছিল জিভ জিকরোনি।

আরেকটা ব্যাকআপ প্ল্যানও তৈরি করেছিলেন হ্যারেল। বুয়েনস আইরেসে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এক ইসরায়েলি ব্যক্তি মির বার- হোন। হ্যারেলের কাছে সেই খবর ছিল। হ্যারেল তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, ‘তুমি যখন তোমার আত্মীয়ের বাড়ি ফিরবে তখন তুমি ব’লো যে, তোমার একটা গাড়ি দুর্ঘটনা হয়েছিল আর তারপর থেকে তোমার মাথা ঘুরছে, গা গোলাচ্ছে আর খুব দুর্বল লাগছে। বলবে, ডাক্তার ডাকুন। ডাক্তার এসব দেখে খুব সম্ভবত তোমাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে বলবে। তুমি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাবে।

১৯ মে তুমি বলবে যে, তুমি এখন ভালো আছ এবং বাড়ি যেতে চাও। তোমাকে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করে দেবে এবং ডিসচার্জ সার্টিফিকেটে লেখা থাকবে তোমার অসুস্থতার বিবরণ।’ উপসর্গগুলোর নিখুঁত বিবরণ অবশ্য দিয়ে দিলেন ডক্টর ইলিয়ন।

মির বার-হোন শুধু অক্ষরে অক্ষরে হ্যারেলের আদেশ পালন করলেন। ৩ দিন ধরে

তিনি বুয়েনস আইরেসের একটা হাসপাতালে পড়ে পড়ে অভিনয় করে গেলেন। ১৯ মে হাসপাতাল থেকে ছাড়াও পেলেন। আর তার এক ঘণ্টার মধ্যে হ্যারেলের হাতে পৌঁছে গেল তাঁর ডিসচার্জ সার্টিফিকেট, যাতে লেখা ছিল মির বার-হোনের গাড়ি দুর্ঘটনার ফলে লাগা আঘাতের চিকিৎসা করা হয়েছে।

এবার যদি আইখম্যানকে ইসরায়েল এয়ারলাইন্সের কর্মী হিসাবে পাঠানোর প্ল্যান ব্যর্থ হয়, তখন তাকে স্ট্রেচারে শুইয়ে মির বার-হোন হিসাবে বিমানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে—এটাই ছিল হ্যারেলের পরিকল্পনা।

১৯ মে। ইসরায়েলের বিমান বুয়েনস আইরেসে অবতরণ করল। এই বিমানের ফিরে যাওয়ার কথা ২০ মে'র মধ্যরাতে।

হ্যারেল শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন, আইখম্যানকে ইসরায়েল এয়ারলাইন্সের কর্মী হিসাবেই পাঠাবেন। য়েহুদা কারমেল তাঁর ইউনিফর্ম আর ডকুমেন্ট মোসাদ টিমকে দিয়ে দিয়েছেন। এক্সপার্ট সালোম দানি ডকুমেন্টগুলোকে আইখম্যানের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে এমনভাবে তৈরি করে দিলেন যে কারো সাধ্য নেই তাকে ধরে। কারমেলকে নতুন ডকুমেন্ট দিয়ে বলে দেওয়া হয় যেন কিছু দিনের মধ্যেই তিনি আর্জেন্টিনা ছেড়ে ইসরায়েলের ফিরে যান।

ওদিকে 'দ্য বেস'-এ তখন আইখম্যানকে পাঠানোর তোড়জোড় চলছে। তাকে মাদক দিয়ে অচৈতন্য করা হল। তারপর আরম্ভ হল ক্লিনিং— অর্থাৎ, বাড়ি থেকে মোসাদ এজেন্টদের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার কাজ। এই ক'দিন ঘরে কী হয়েছে তার কোনো ট্রেস রইল না। বাকি যে বাড়িগুলোতে অন্য সদস্যরা ছিল সেখানেও একই কাজ করা হল।

২০ মে। রাত ৯টা। সব তৈরি। আইখম্যানকে স্নান করিয়ে, শেভ করিয়ে ইসরায়েল এয়ারলাইন্সের কর্মীদের ইউনিফর্ম পরিয়ে দেওয়া হল। তার পকেটে দেওয়া হল জিভ জিকরোনি নামের পরিচয়পত্র। ডাক্তার এবার আইখম্যানকে এমন একটা ইনজেকশন দিলেন যাতে সে ঘুমিয়ে পড়বে না ঠিকই, তবে তার চেতনাও পুরোপুরি থাকবে না। সে দেখতে পাবে, শুনতে পাবে এমনকী হাঁটতেও পারবে কিন্তু সে কোনো প্রতিক্রিয়া দিতে পারবে না।

হ্যারেল প্রত্যেক মোসাদ এজেন্টের জন্য আর্জেন্টিনা থেকে বেরোনোর আলাদা প্ল্যান তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সব ঠিক থাকলে তারা এই বিমানে করেই যেতে পারবে। আর তার ব্যবস্থা করেই রেখেছে সালোম দানি। সকলের নকল পাসপোর্ট ও নকল স্ট্যাম্প সবকিছুই ছিল তৈরি।

রাত ১১টায় মোসাদ ও ইসরায়েল এয়ারলাইন্সের গাড়ি একে একে হাজির হল পার্কিং লটে। হ্যারেল যে গাড়িতে আইখম্যান ছিল তাদের উদ্দেশে বললেন–'গুডলাক'। তারপর তিনি ছুটলেন টারমিনালের দিকে। তাকে বিমান ধরার জন্য চেক ইন করতে হবে যে। আইখম্যানকে বিমানকর্মীর ইউনিফর্মে বিমানে তোলা হল। দুজন ধরে ধরে আইখম্যানকে বিমানে নিয়ে গেল। তাকে বিমানে একটা উইন্ডো সিট দেওয়া হল। বাকি সবাই আইখম্যানকে কভার করে সিট দখল করল।

বাকি মোসাদ এজেন্টরা সকলে সাধারণ যাত্রী হিসাবেই বিমানে উঠলেন। হ্যারেলও ছিলেন। সালোম দানি প্রত্যেকের পাসপোর্ট এবং অন্যান্য কাগজপত্র এতটাই নিখুঁতভাবে বানিয়েছিল যে কারোর কোনো সন্দেহই হয়নি।

রাত ১২:০০। বিমান টেক অফ করার সময় হয়ে গেছে। হঠাৎ কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে বলা হল, ‘প্লেন টেক অফ করবে না। পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া অবধি অপেক্ষা করুন!’ প্রত্যেকের তখন উত্তেজনায় ঘাম ছুটছে। হলটা কী? আর্জেন্টিনার পুলিশ কি খবর পেয়ে গেছে? এবার কি সবাই ধরা পড়ে যাবে? কয়েক মিনিটের রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষার পর অবশেষে টেক অফ করার সিগনাল পাওয়া গেল। ধড়ে যেন প্রাণ ফিরল সবার। হ্যারেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

২২ মে সকালে বিমান লড বিমানবন্দরে ল্যান্ড করল। সকাল ৯:৩০টায় হ্যারেল বেন-গুরিয়নের অফিস পৌঁছলেন। হ্যারেলকে দেখে তিনি অবাক হয়ে বললেন, ‘আরে, তুমি কখন এলে?’

হ্যারেল বললেন, ‘জাস্ট দু’ ঘণ্টা আগেই... ।’ আইখম্যানকে যে তাঁরা ধরে এনেছেন সে কথাও প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন। কিন্তু এটা জানার পরও বেন- গুরিয়নের কোনো ভাবান্তর হল না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘যাকে ধরে এনেছ, তুমি নিশ্চিত যে সে-ই আইখম্যান? ওই লোকটার বিরুদ্ধে যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে যারা আইখম্যানকে দেখেছে, তাদের মধ্যে কয়েক জনকে ডেকে আনো। শনাক্তকরণ করা হোক।

হ্যারেলের নির্দেশ পালন করলেন। আইখম্যানকে চেনে বা দেখেছে এমন লোক আইখম্যানের সেলে গেল, কথা বলল ও তাকে শনাক্তও করল।

২৩ মে বিকেল ০৪:০০-তে বেন-গুরিয়ন নেসেটে ঘোষণা করলেন ৬০ লক্ষ ইহুদির হত্যাকারী আইখম্যানকে ইসরায়েলে ধরে আনা হয়েছে।

১৯৬১ সালের ১১ এপ্রিল থেকে আইখম্যানের বিচার শুরু হয় জেরুসালেমে। বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ১৯৬১ সালের ১৫ ডিসেম্বর তাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

আইখম্যানকে এভাবে অপহরণ করে আনার ঘটনায় গোটা দুনিয়া সেদিন ইসরায়েলের নিন্দা করেছিল। বিচার প্রক্রিয়া ও শাস্তিদান দেখে মানবিকতার দোহাই দিয়েছিল অনেক দেশই। আর্জেন্টিনা বলেছিল— একটি স্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করেছে ইসরায়েল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, ফ্রান্স, ব্রিটেন সবাই আর্জেন্টিনার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ইউনাইটেড নেশনস ইসরায়েলকে সতর্ক করেছিল, ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা না ঘটে।

তবে আইখম্যানের বিচার শুধুমাত্র একজন অপরাধীর বিচার নয়। এ ছিল পৃথিবীর সামনে ভয়ানক নাৎসি বর্বরতার দলিল উন্মোচনের আয়োজন। হলোকাস্টের বীভৎসতা যাতে পৃথিবীর সামনে না আসে তার জন্য নাৎসিরা প্রায় সমস্ত প্রমাণ লোপাট করে দিয়েছিল। আইখম্যানের বিচার গোটা দুনিয়ার চোখ খুলে দেয়। পৃথিবী জানতে পারে হলোকাস্টের বীভৎসতার কাহিনি। আসলে আইখম্যান ছিল হলোকাস্টের সিম্বল, আর সেই চিহ্নটাকে বিশ্ববাসীর সামনে মেলে ধরে ইহুদিরা নিজেদের পিতৃপুরুষদের সম্মান জানিয়েছিল।

অপারেশন য়াহলোম

যেদিন সন্ধেয় ভারতীয় বায়ুসেনার পাইলট অভিনন্দন বর্তমান পাকিস্তান থেকে এসে ভারতের মাটিতে পা রাখলেন, সেদিন মন বলছিল, 'স্যর, য়ু আর দ্য ইন্ডিয়ান ড্যানি শাপিরা।'

আশা করি অভিনন্দন বর্তমানের পরিচয় দেওয়া বাতুলতাই হবে। কিন্তু একটি ন্যায্য প্রশ্ন তুলতেই পারেন সুধী পাঠকবন্ধুরা: কে এই ড্যানি শাপিরা?

ড্যানি শাপিরা একজন ইসরায়েলি পাইলট।

একজন পাইলটের মধ্যে আলাদা এমন কী আছে যে তাঁর নাম এভাবে উচ্চারণ করতে বাধ্য হচ্ছি?

কারণ এই ড্যানি মিগ ২১ উড়িয়ে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে সৃষ্টি করেছিলেন ইতিহাস।

আশা করি মিগ ২১-এর সূত্রে পাঠকবন্ধুরা গেঁথে ফেলতে পারবে অভিনন্দন বর্তমান আর ড্যানি শাপিরার নাম। মিগ ২১-এ চেপে পাকিস্তানি ফ্যালকন ১৬ ফাইটার জেটকে ধাওয়া করে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন অভিনন্দন। এই মিগ ২১ কিছু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এখন 'উড়ন্ত কফিন' নামে কুখ্যাত। টেকনিক্যাল ফল্টের কারণেই পাকিস্তানের মাটিতে গিয়ে পড়েন অভিনন্দন। বাকি ইতিহাস সকলের জানা।

এত বদনাম! এত কুখ্যাতি! তবুও এই মিগ ২১-ই ছিল এক সময়ের চমৎকার! ড্যানি শাপিরা এই মিগ ২১ নিয়েই ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন।

এ এক এমন সময়ের কথা, যখন মিগ ২১ নিয়ে পাশ্চাত্যের প্রতিটি দেশে চরম উন্মাদনা। কী আমেরিকা, কী য়ুরোপ আর কী ইসরায়েল, সকলেই চাইছিল অন্তত একটা মিগ ২১ হাতে পেতে।

সেই সময়ে মিগ ২১ নিয়ে সবথেকে বড় বিপদের মুখে ছিল ইসরায়েল। কারণ সোভিয়েতের কাছ থেকে সব মুসলমান রাষ্ট্রগুলি মিগ ২১ কিনে নিয়ে ক্রমশ ঘিরে ফেলছিল ইসরায়েলকে।

ত্রস্ত ইসরায়েল ঘোষণাই করে বসেছিল:

বিশ্বের যে কোনো পাইলট যদি একটি মিগ ২১ নিয়ে এসে ইসরায়েলের বুকে নামাতে পারেন, তাহলে তাঁকে ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার পুরস্কার দেবে ইসরায়েল সরকার এবং সপরিবারে সুরক্ষিত ভাবে তাঁকে স্থান দেওয়া হবে ইসরায়েলের মাটিতে।

এই ঘোষণার পর মিগ ২১ অধিকৃত প্রতিটি দেশ সতর্ক হয়ে যায়। প্রত্যেক দেশ নিজের পাইলটদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে।

সোভিয়েত কোনো অবস্থাতেই পশ্চিমের কোনো দেশকে মিগ ২১-এর টেকনোলজি দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল না।

কিন্তু সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেখাল ইসরায়েল। বলা ভালো, ইসরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদ। মাত্র তিন বছরের মধ্যেই। মাঝে দু-দু' বার অসফল হয়েও।

এ এক অদ্ভুত ইতিহাস! বিশ্বের প্রথম কোনো দেশ, বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে হরণ করে আনল অপর কোনো দেশের লড়াকু বিমান। অনেকে বলবেন, এ তো চুরি! আবার অনেকের কাছেই এই অধ্যায় গর্বের।

আসুন বন্ধুরা, বলি, মিগ ২১ হরণের সেই কাহিনি।

বিগত শতাব্দীর ছয়ের দশকের মধ্য এশিয়া। এ সেই সময়ের কথা, যখন দুই দশক ধরে ইহুদি আর আরবদের মধ্যে চলা দ্বৈরথ রূপ নিতে চলেছিল যুদ্ধের।

বড় অদ্ভুত পরিস্থিতি। আব্রাহমের তিন সন্তানের মধ্যে দুই সন্তান যুদ্ধের মোহানায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ইহুদি এবং মুসলমান।

মধ্য এশিয়া দাঁড়িয়েছিল বারুদের স্তূপে। প্রত্যেকে নিজের সাধ এবং সাধ্য অনুসারে অস্ত্র জোগাড় করে চলেছিল। আর ঠিক সেই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্ত হৃদয়ে আরবদের জন্য খুলে দিয়েছিল নিজেদের অস্ত্রভাণ্ডার।

আর ইহুদিদের দেশ ইসরায়েল সন্ধান করছিল একটি শক্তিশালী ফাইটার প্লেনের। সোভিয়েত শস্ত্রাগারের মুকুটমণি মিকোয়ান গুরেভিচ টোয়েন্টিওয়ান বা মিগ ২১ ছিল সেই সময়ের সবথেকে প্রসিদ্ধ যুদ্ধবিমান। কারণ যেমন ছিল এর গতিবেগ, তেমনই ছিল অধিক উচ্চতায় ওড়ার ক্ষমতা। ফরাসি এবং ইসরায়েলি মিরেজ ৩-এর তুলনায় ওজনে ছিল এক টন হালকাও। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সোভিয়েতদের কাছ থেকে মিগ ২১ বিমান বা তা নির্মাণের পদ্ধতির কোনোটাই ইসরায়েলের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। বিশ্ব কূটনীতির চক্রে আটকা পড়ে গিয়েছিল ইহুদি জাতি তথা ইসরায়েল।

তাই ইসরায়েলি বায়ুসেনা পুরোপুরি ভাবে ফ্রান্সের দাসোঁর তৈরি মিরাজ থার্ডের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে বসেছিল।

১৯৬৫ সাল নাগাদ ইসরায়েলি বায়ুসেনার প্রধান ছিলেন আইজার ওয়াইজম্যান। পরবর্তীতে ইসরায়েলের সপ্তম রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন।

ইসরায়েলের গুপ্তচর সংস্থার নাম হল মোসাদ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির নাম মোসাদ। মোসাদ আসলে এক আশ্চর্যের নাম! এর কাণ্ডকারখানার কথা লিখতে বসলে হয়তো মহাভারতের থেকেও মোটা হয়ে যাবে বইয়ের বহর। ১৯৬৫ সালের সেই দিন ইসরায়েল তথা সারা বিশ্বের ইতিহাসে লেখা থাকবে অদ্ভুত সম্ভ্রমের সঙ্গে, যেদিন মোসাদ চিফ ব্রেকফাস্টের টেবিলে বায়ুসেনার প্রমুখের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন।

দুজনে একে অপরের বন্ধু। মোসাদ চিফ যদি নিজের যৌবনের দিনে একটি প্যারাশুট জাম্পিং-এর সময় ঘায়েল না হয়ে যেতেন, তাহলে হয়তো প্রৌঢ়ত্বে এসে হয়ে উঠতেন ইসরায়েলের স্থলসেনার প্রমুখ।

এসব কথাই চলছিল। হাসি, মজায় গমগম করছিল ঘর।

মোসাদ চিফ বলে চলেছিলেন, ‘আরে ছাড়ো তো আইজার। এই হলে কী হত, ওই হলে কী হত— এসব মনভোলানো কথা বলে কোনো লাভ আছে নাকি? অফিসিয়াল কথাবার্তায় ঢোকো দেখি। বলো, অ্যাজ আ মোসাদ চিফ আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?’

মির অমিত। হ্যাঁ, তৎকালীন মোসাদ চিফের নাম এটাই ছিল এবং মোসাদ চিফের কাছ থেকে আসা এমন খোলা আমন্ত্রণ পেয়ে হতভম্বের মতোই তাকিয়ে রইলেন বায়ুসেনার প্রধান আইজার। কথাটা শুনে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন আইজার ওয়াইজম্যান।

দু' হাতের তর্জনী পরস্পরের সঙ্গে ঠেকিয়ে দু' চোখ সামান্য কুঁচকে বললেন, 'আমার একটা মিগ ২১ চাই!'

টেবিলের ওপর ডান হাতটাকে চাপড়ে চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়ে মির অমিত বললেন, 'মজা করছ আইজার? পুরো ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের কাছে অমন একটা পিসও নেই!'

নিজের বাঁ হাতের কনুইটাকে টেবিলের ওপরে রেখে সামান্য এগিয়ে এসে আইজার বললেন, 'আমাদের একটা মিগ ২১ চাই! এটা কোনো মজার কথা নয়। তুমি বড় মুখ করে বললে বলেই কথাটা পাড়লাম। ক্ষমতায় না কুলোলে ছেড়ে দাও।'

কথাটা সম্মানে লেগে যায় মিরের এবং এই দিনের পর থেকে ওঁর কার্যকালের এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি অক্ষত মিগ ২১-কে ইসরায়েলের মাটিতে এনে নামানো। আগেই লিখেছি যে, মোসাদ এক আশ্চর্যের নাম। সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করে ফেলা হল কর্মসূচি। চারটি ধাপে।

ক. এমন একটি দেশকে বেছে নেওয়া, যেখানকার বায়ুসেনার পাইলট(রা) নিজের দেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ

খ. সেই দেশে মোসাদের আন্ডারকভার এজেন্ট স্থাপন করা।

গ. মিগ ২১ জেটকে উড়িয়ে ইসরায়েলের মাটিতে এনে নামানোর মতো পাইলটের চয়ন।

ঘ. মিগ ২১-কে ইসরায়েলের মাটিতে ল্যান্ড করাবার যাবতীয় পরিকল্পনা।

প্রথম ধাপ পার করার জন্য মির অমিত ডেকে পাঠালেন রেহাবিয়া বারদিকে। রেহাবিয় বারদি, মোসাদের এক পুরোনো পেয়াদা। এক দশক ধরে মিশর এবং সিরিয়ার পটভূমিতে মিগ ২১ আয়ত্তে আনার কাজে নিযুক্ত ছিল এই বারদি।

বারদির নেটওয়ার্ক কাজে লাগালেন মির। তার সাহায্যেই সারা আরবে ছড়িয়ে দিলেন নিজের গুপ্তচরদের। কাজ হলও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইরাক থেকে আশা জাগানো খবর পেলেন মির।

ইরাক থেকে লিখেছিলেন মোসাদের গুপ্তচর দলের প্রধান য়াকোব নিমরোদি। চিঠির বক্তব্য ছিল:

মির,

ইরাকে জোসেফ শেমস নামে একজন ইহুদি আছে। সে এমন একজন পাইলটের সন্ধান জানে যে ইসরায়েলের মাটিতে মিগ ২১ নিয়ে গিয়ে নামাতে পারবে।

য়াকোব নিমরোদি।

মোসাদের চিফ মিরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল শব্দগুলো পড়েই। তাঁর মুখের হাসি দেখে মনে হল যেন মিগ ২১-কে ইসরায়েলের মাটিতে নামতে দেখছেন মির।

কিন্তু না আঁচালে বিশ্বাস নেই বলে কোনো রকমের তাড়াহুড়ো করতে চাইলেন না মির অমিত। এত বড় তথা গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনের ক্ষেত্রে একটা ভুল পদক্ষেপ সমগ্র আরব

দুনিয়ায় মোসাদের নেটওয়ার্ককে মুহূর্তের মধ্যে নষ্ট করে দিতে পারত।

মির চাইলেন জোসেফ শেমসকে একটু পরখ করে নিতে। আর এখান থেকেই শুরু হল পরিকল্পনার দ্বিতীয় চরণ।

মোসাদের ছোটখাটো কয়েকটা কাজের দায়িত্ব জোসেফকে দিলেন মির। ফলাফল হল চমকপ্রদ। মির নিজেও এতটা ভালো কাজের আশা করেননি জোসেফের কাছে।

এরপর কেবল ইতিহাস গড়ার দিকে এক পা, এক পা করে এগোতে থাকল ইসরায়েল, মোসাদ এবং মির অমিত। ১৯৬৫ সালের শেষ ভাগে মিগ ২১ নিয়ে প্রোজেক্টের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হল নিমরোদি আর জোসেফকে।

অপারেশন পা রাখল তৃতীয় পর্বে।

নিমরোদি মির অমিতের কাছে যে পাইলটের নাম করেছিলেন, তাঁর নাম ছিল মুনির। মুনির রেড়ফা। পেটানো চেহারা। চওড়া কাঁধ। বছর ত্রিশ বয়েস তাঁর।

জোসেফ আর মুনিরের মধ্যে আত্মীয়তাও ছিল। জোসেফের স্ত্রী এবং মুনিরের সহধর্মিণী ছিলেন দুই বোন। শুধু এটুকুই অবশ্য মোসাদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। নিমরোদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে জেনে নিয়েছিলেন যে, মুনির নিজের কাজের জায়গা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

জোসেফ একদিন ডিনার টেবিলে মুনিরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘তা মুনির, আপনার নেক্সট প্রোমোশন কবে হচ্ছে?’

উদাস মুনির উত্তর দিয়েছিলেন, ‘সম্ভবত আর কোনো প্রোমোশনই হবে না আমার।’

আরেকটু খুঁচিয়েছিলেন জোসেফ, ‘এত দিনে তো আপনার স্কোয়াড্রন লিডার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।’

‘জোসেফ, আমি একজন ক্রিশ্চান এবং ইরাকের এয়ারফোর্সে একজন ক্রিশ্চানের পদোন্নতি হওয়া প্রায় অসম্ভব। অ্যান্ড সো আই অ্যাম আ পাইলট স্টিল।’

গভীর এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে মুনিরের দিকে তাকিয়েছিলেন জোসেফ।

এরপর থেকে যত বার, যেখানে ওঁদের দুজনের সাক্ষাৎ হয়েছে, তত বারই জোসেফ মুনিরের হুনুরির তারিফ করে গেছেন এবং মুনির হতাশ ভঙ্গীতে বলেছেন যে, কর্মক্ষেত্রে তিনি কিছুতেই এগোতে পারছেন না।

একদিন জোসেফ হঠাৎই মুনিরকে বললেন, ‘চলুন না, এথেন্স থেকে ঘুরে আসা যাক। হতেই তো পারে যে আপনার ভাগ্য ওখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।’

বিশ্বের সকল রাষ্ট্রেই সমস্ত সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বিদেশে যাওয়ার জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু ইরাক সরকারের পক্ষ থেকে মুনিরকে যাওয়ার পারমিশন দেওয়া হল না।

যে কোনো যুদ্ধ জিততে গেলেই লাগে ছল, বল এবং কৌশল। তার ভরপুর প্রয়োগ করলেন জোসেফ। ইরাকি বায়ুসেনাকে জানালেন যে, মুনিরের স্ত্রী ভয়ানক অসুস্থ এবং সেই

রোগের চিকিৎসা একমাত্র এথেন্সেই হতে পারে। এর সঙ্গে যোগ করা হল যে, পরিবারে একমাত্র মুনিরই ইংরাজিতে কথা বলতে সক্ষম। তাই ওঁকে ছাড়া কোনো কাজই হবে না।

খাপে খাপ মেলানোর পর এথেন্সের মাটিতে পা রাখলেন জোসেফ এবং মুনির।

এই হল মহাপালার শেষ পর্ব। এখানেই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সর্বাধিক। হলও। অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও গলদ ঘটলই। কিন্তু অপারেশন সফলই হল। সম্ভবত দেবতা য়হোবা ইসরায়েলের প্রতি উদারই ছিলেন।

মির জানতেন যে, একজন পাইলটই অপর একজন পাইলটের ভালো বন্ধু হতে পারেন। তাই নিজেদের পক্ষ থেকে কাজ উদ্ধারের জন্য পাঠালেন কর্নেল জেবকে। কর্নেল জেব ইসরায়েলি বায়ুসেনার পাইলট ছিলেন এবং স্থলবাহিনীর প্লেন ওড়াতেন।

জেব। লিরঁন জেব। দুনিয়া জানত যে জেব একজন সেনা আধিকারিক, কিন্তু বাস্তবে ছিলেন মোসাদের দুর্ধর্ষ এক এজেন্ট।

জেবের একটা প্লাস পয়েন্ট ছিল। ওঁকে দেখলে পোলিশ মনে হত। পোলিশ বলতে পোল্যান্ডের নাগরিক এবং বাস্তবেও তা-ই ছিলেন উনি। হিটলারের হলোকাস্ট থেকে কোনোক্রমে রক্ষা পাওয়া এক যুবক হয়ে উঠেছিল ইসরায়েলের বিমানচালক তথা মোসাদের স্তম্ভ।

কিন্তু মুনিরের সঙ্গে সাক্ষাতে জেব কেবল বললেন, 'আমি একজন পোলিশ পাইলট।'

ঘনিষ্ঠতা বাড়ল দুজনের। বন্ধুত্ব গাঢ় হলে মুনিরকে রাজি করিয়ে ফেললেন জেব। কী ব্যাপারে? না, ইরাকের মিগ ২১ ফাইটার প্লেন মুনির এনে নামাবেন ইসরায়েলের বুকে।

আর এরপরই সিনে প্রবেশ করলেন জেহুদা পোরাত। জেহুদা ছিলেন ইসরায়েলি বায়ুসেনার রিসার্চ অফিসার। মুনিরের ডেইলি প্ল্যান জানতে চাইলেন জেহুদা। নিজের রুটিন সাগ্রহে জানালেন মুনির।

নিজের দরকারের একটা কথা জেনে নিয়েছিলেন পোরাত। প্রতিদিন সকালে একজন করে পাইলটকে মিগ ২১-এ করে ইরাকের কুর্দ সীমান্তবর্তী এলাকার গ্রামগুলোতে রুটিন চক্কর দিতে পাঠানো হত।

পোরাত জানালেন মুনিরকে, 'কুর্দ সীমান্তে এসে পৌঁছানো মাত্রই তোমার প্লেনের রেডিওতে কোল ইসরায়েলের সিগন্যাল ক্যাচ করবে। তুমি সেখানে আরবি গান শুনতে পাবে— মরহবতে মরহবতে...। আর এটাই হবে আমাদের পক্ষ থেকে দেওয়া নিশান। তুমি জানবে গোটা ইসরায়েল তোমাকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে।'

শেষ অবধি ইসরায়লের অপেক্ষার অবসান ঘটল। ১৬ আগস্ট, সকাল আটটার সময়ে ইসরায়েলের হৎজোড় বিমানবন্দরে এসে নামল মিগ ২১।

সে এক উৎসবের দিন!

যে বৃত্তান্ত লেখা হল, তার মধ্যে সমস্যাগুলোর কথা প্রায় উল্লেখই করা হয়নি। জেনে রাখুন পাঠক, এমন এমন সব পরিস্থিতির উদ্রেক হয়েছিল যে মনে হয়েছিল এই কাজ করা

অসম্ভব।

প্রথম সমস্যা হয়েছিল তখন, যখন ইরাক থেকে এথেন্স এবং এথেন্স থেকে রোম হয়ে ইসরায়েল নিয়ে যাওয়ার পথে তেল আবিবের বিমানে ওঠার আগে উধাও হয়ে যান মুনির। ফ্লাইট টেক অফ করার অন্তিম মুহূর্তে জেব এবং পোরাত মুনিরকে আসতে দেখেন। কারণ জিজ্ঞেস করায় জানা যায় যে মশাই নাকি কায়রো যাওয়ার প্লেনে চড়ে বসেছিলেন এবং কেবিন ক্রু শেষ মুহূর্তের গুনতিতে ওঁকে প্লেন থেকে নামিয়ে দেয়।

ভেবে দেখুন তো, এত গুপ্ত একটা মিশনে নিয়োজিত পাইলট যদি কোনো ক্রমে মিশরে গিয়ে পড়তেন, তাহলে জিনিসটা আর ধামাচাপা রইত কি?

দ্বিতীয় ভুলের কথা শুনলেও চমকে উঠতে হয়। ইরাক ছেড়ে আসার আগে নিজের বাড়ির সমস্ত আসবাব নিলামের একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে মূর্খের মতো কাজ করে বসেন মুনির। এই খবর শোনার পর হার্ট অ্যাটাক হতে বসেছিল মির অমিতের। নিজের বিচক্ষণতা নিয়ে শোক প্রকাশ করেছিলেন মির। বলেছিলেন, ‘এ কোন মূর্খকে দায়িত্ব দিলাম?’

বিশ্বের মিগ ২১ ধারী সব দেশ সেই সময়ে ইসরায়েলের মিশন সম্পর্কে কম- বেশি খবর রাখায় নিজের পাইলটকে সন্দেহের চোখে দেখছিল। আর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন মিগ ২১ পাইলট নিজের বাড়ির সব আসবাব নিলামে বিক্রি করে দিতে চাইছি। কিন্তু বরাতের জোরে বেঁচে গিয়েছিলেন মুনির। রক্ষা পেয়েছিল ইসরায়েলের প্রকল্প। ইরাকি গুপ্তচর সংস্থা মুখবরাত কীভাবে যে এত বড় একটা খবর দেখতে বা বুঝতে পারেনি তা ঈশ্বরই জানবেন।

ভাগ্যের জোরেই রক্ষা পেয়েছিল অপারেশনটা।

তৃতীয় বাধা সামনে এল ১৪ আগস্ট। সেবারেও অল্পের জন্য রক্ষা পেল মিশন।

কী হয়েছিল? যখন মুনিরের প্লেন ইসরায়লের কোল ক্যাচ করল, শোনা গেল আরবি গান ‘মরহবতে মরহবতে… ’, তখনই ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেল ওঁর প্লেনের ককপিট।

কতকটা বাধ্য হয়েই মুনির মাটিতে নামাতে বাধ্য হলেন নিজের ফাইটার মিগ ২১-কে। সৌভাগ্যবশত সেদিন প্লেন ইসরায়েলের মাটি ছুঁয়েছিল। নইলে মিগ ২১-এর মুখ দেখতেই পেত না ইসরায়েল। দৈব সহায় ছিল। তাই ১৯৬৬ সালের ১৬ আগস্ট সঠিক জায়গায়, সঠিক সময়ে দেখা দিল মিগ ২১।

এই ছিল অপারেশন ডায়মন্ড!

হ্যাঁ, হিরের মতোই দামি ছিল এই মিশন। মোসাদ নিজের দেশকে, দেশের আগামী প্রজন্মকে সেদিন এমন একটি উপহার দিয়েছিল যার ঋণ শত শত বছরেও শোধ করতে পারবে না ইসরায়েলের উত্তরপুরুষেরা। মোসাদের উদ্দেশ্য ছিল— ‘কেউ যুদ্ধবিমান দিচ্ছে না তো ছিনিয়ে নিয়ে এসো!’

এই মিশন সারা বিশ্বে ‘অপারেশন ডায়মন্ড’ নামেই পরিচিত। তবে ইসরায়েলে একেই বলা হয়েছিল ‘অপারেশন য়াহলোম’। ইসরায়েলের হিব্রু ভাষায় ‘য়াহলোম’ শব্দের অর্থ হল ‘হিরে’।

আসলে য়াহলোম ছিল এই অপারেশনে মুনির রেড়ফার কোডনেম। এই নাম কখন

ঠিক হয়েছিল সে কথা বলেই ইতি টানি কাহিনির। মির আর মুনিরের প্রথম সাক্ষাতেই স্থির হয়েছিল এই কোডনেম। মুনিরের শান্ত, সমাহিত মুখ-চোখ দেখে মির জেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এ কি পারবে?'

জেব উত্তরে বলেছিলেন, 'ইস্ য়াহলোম স্যর! ইটস্ য়াহলোম!' মানে, 'এ পাইলট নয় স্যর, হিরে! এ হিরে স্যর!'

এ তো গেল মিগ ২১ হরণের কথা। আসি, তার পরের উপাখ্যানে।

মিগ ২১ ইসরায়েলের বুকে নামানোর পর মুনির কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ভবিষ্যতে কি আমাকে এই জেট ওড়াতে দেওয়া হবে?'

উত্তরটা দিয়েছিলেন ওয়াইজম্যান 'না মুনির। এই প্লেন ওড়াবেন আমাদের সেরা পাইলট মিস্টার ড্যানি শাপিরা। আপনি ওঁকে শিখিয়ে দেবেন।'

ওয়াইজম্যানের কথা শেষ হতে না হতেই ঘরের বাইরে নক হল। কেউ একজন বললেন, 'মে আই কাম ইন স্যর?'

ঘরের বাইরে থেকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাওয়া ব্যক্তিটি ছিলেন ড্যানি শাপিরা। আসলে সবকিছুই ছিল পূর্বপরিকল্পিত। মিগ ২১-কে ইসরায়েলের এনে ফেলার পরে কে ওড়াবে, কে তাঁকে শেখাবে সবকিছুই।

আগে থেকেই মিলিটারি কম্যান্ডার আলুফ হোড ড্যানিকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, 'ড্যানি, তুমি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের প্রথম পাইলট হতে চলেছ যে মিগ ২১ ওড়াবে। যত তাড়াতাড়ি পারবে, ওড়ানোটা শিখে নাও।'

ঘরে প্রবেশ করলেন ড্যানি। মুনিরের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন ওয়াইজম্যান এবং বলাই বাহুল্য যে, সাক্ষাৎকার সফল হল।

পরদিন সকালে মুনির এবং ড্যানি দাঁড়িয়ে ছিলেন রানওয়ের ওপরে। দুজনের মধ্যিখানে ছিল মিগ ২১। দেখা গেল, প্লেনের সমস্ত সুইচের লেবেলিং করা আছে রাশিয়ান এবং আরবি ভাষায়।

কিন্তু ড্যানি তো ড্যানিই! সবার থেকে আলাদা। মাত্র এক ঘণ্টা মুনিরের সঙ্গে প্লেন ওড়াবার পর মুনিরকে বললেন, 'এবার আমি একাই ওড়াব!'

মুনির হাসতে হাসতে বললেন, 'স্যর, এই প্লেন ওড়ানোর জন্য কয়েক মাসের কোর্স করতে হয়। আর আপনি মাত্র এক ঘণ্টায় সব শিখে ফেললেন? এখন আপনার একা ওড়ানো মানে মৃত্যুর মুখে নিজেকে সঁপে দেওয়া।'

ড্যানি পাত্তাই দিলেন না। হ্যাঙ্গার থেকে প্লেন বের করা হল। গ্লাসলিড খুলে ভেতরে ড্যানি পা রাখতেই যাবেন এমন সময় পিছন থেকে শুনলেন ওয়াইজম্যানের কণ্ঠ— 'ড্যানি, কোনো রকমের কায়দা দেখাবে না। এই প্লেনটা গায়ে যেন একটাও আঁচড় না পড়ে!'

'ইয়েস স্যর!' এটুকুই ছিল ড্যানির উত্তর। হাওয়ায় উড়ে গেলেন ড্যানি।

স্বচ্ছন্দে ওড়ালেন মিগ ২১। নামার পর মুনির ড্যানিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'আমি আপনার মতো পাইলট আগে কখনো দেখিনি। এই আরব দুনিয়ার

কোনো পাইলটেরই আপনার সঙ্গে লড়ার মতো হিম্মত কুলোবে না।'

ড্যানি পরে কিংবদন্তী হয়ে ওঠেন। মাত্র কয়েক মাসের কয়েকটা টেস্ট ফ্লাইটের পর সিক্স ডে'জ ওয়্যার (ছ' দিনের যুদ্ধ)-এ কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধ্বংস করেন মিশরের ছ'টা মিগ ২১। ইসরায়েলি ইনটেলিজেন্স সংস্থায় একটা নতুন কথা চালু হল — BA before Amit, AM – after Meir!

হার মানতে বাধ্য হল মিশর। খলিফা হতে যেতেই অন্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলি সরে যেতে বাধ্য হল। ছ' দিনের যুদ্ধ জয়ের কৃতিত্ব ছিল ড্যানির। ছিল মুনিরের। ছিল মিগ ২১-এর এবং অবশ্যই অপারেশন য়াহলোমের।

যার কেউ নেই, তার ড্রোন আছে

১৯৬৮ সাল। ইসরায়েলের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টরেটের অফিস। এই ইন্টেলিজেন্স সংস্থার হিব্রু নাম 'আমান'।

আমানের অফিসে যেন একটু বেশিই ভিড়। তার কারণও আছে অবশ্য। কৌতূহলের কেন্দ্রে আছে কয়েকটা ছবি। ছবিগুলো সংগ্রহ করে এনেছেন আমানের একজন স্পেশাল এজেন্ট সাবতাই ব্রিল। মিশরে ঢুকে গোপনে এই ছবিগুলো তিনি সংগ্রহ করেছেন।

ব্রিলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হলেন কর্নেল আব্রাহাম আরনান। ভদ্রলোক খুব মনোযোগ দিয়ে ছবিগুলো দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি উপস্থিত বিশ্লেষকদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কীসের ছবি বলে মনে হচ্ছে?'

'স্যর, সম্ভবত সৈন্য চলাচলের জন্য একটা সেতু তৈরি করা হয়েছে', একজন অ্যানালিসিস্ট উত্তর দিল।

অফিসরুমের পরিবেশটা মুহূর্তের মধ্যে থমথমে হয়ে গেল। একগাদা প্রশ্ন আর একরাশ সংশয় দেখা দিল আমান-কর্তা আরনানের মনে— মিশর কি তাহলে সত্যিই আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে?

এর মাত্র এক বছর আগেই এই দুটো দেশ যুদ্ধ লড়েছে। 'সিক্স ডেজ ওয়র' বা 'ছ' দিনের যুদ্ধ'। অবিশ্বাস্য ভাবে ইসরায়েল যুদ্ধে জয়ী হয়। মিশরের কাছ থেকে তারা ছিনিয়ে নেয় সিনাই। মিশর এই এলাকা ফেরত নেবার জন্য মরিয়া হয়ে রয়েছে। সুয়েজ খাল মিশরের মূল ভূখণ্ডকে সিনাই থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। মিশরীয়রা সুয়েজ খালের ওপর এই সেতু বানিয়েছে ট্যাঙ্ক ও সৈন্য বহনকারী যানবাহন চলাচলের জন্য। এই সেতু ব্যবহার করে ইসরায়েল আক্রমণ অনেকটাই সহজ হবে। এই কথাগুলোই একের পর এক নিজের মনে সাজালেন আরনান।

এরকম একটা আশঙ্কা আগে থেকেই করেছিল ইসরায়েলের ইনটেলিজেন্স এজেন্সিগুলো। তাই এই এলাকার ওপরে নজরদারি করা আরম্ভ হয়। গোপনে নজর রাখার এই ব্যাপারটা অবশ্য মোটেও সহজ কাজ ছিল না। চতুর্দিকে মোতায়েন ছিল ইজিপ্সিয়ান স্নাইপার টিম। সামান্য ভুলচুক হলেই ইসরায়েলি সেনারা মিশরীয় সেনার স্নাইপারের টার্গেটে পরিণত হতে লাগল।

তাহলে কী উপায়?

ব্যবহার করা শুরু হল ইসরায়েলি এয়ারফোর্সের যুদ্ধবিমান। বিমান ওড়ার সময়ে ছবি তোলারও চেষ্টা করা হল। কিন্তু শত্রু এলাকায় বিমান উড়লে সহজেই আক্রান্ত হওয়ার ভয় তো থাকবেই, তাই মিসাইলের হাত থেকে বাঁচার জন্য বিমানগুলোকে অনেক উঁচু দিয়ে উড়তে হত। ফলে অত উঁচু থেকে তোলা ছবি কোনো কাজেই লাগল না ইসরায়েলের।

আর অন্য কোনো উপায় না থাকায় মিশরে গুপ্তচর পাঠিয়ে আসল খবর জানার চেষ্টা করা হল। গেলেন স্পেশাল এজেন্ট সাবতাই ব্রিল। ব্রিল ছবি তো তুলে আনলেন। তার ফলে বোঝাও গেল যে, সেখানে কিছু একটা ঘটেছে বা ঘটছে।

কিন্তু এই কথা জানার আরও বেশি দরকার ছিল যে, প্রতি মুহূর্তে সেখানে নতুন কী-কী ঘটনা ঘটে চলেছে।

এই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন ব্রিল— কিছু একটা তো করতেই হবে যাতে সেখানকার সবকিছুর খুঁটিনাটি জানা যায়।

চিন্তা ক্রমশ পরিণত হল দুশ্চিন্তায়। ব্রিল কিন্তু ভাবা থামালেন না, একটা উপায় চাই! কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি একটা সিনেমা দেখেছিলেন। সেই চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছিল একটি আমেরিকান-ইহুদি বালক একটা খেলনা বিমান ওড়াচ্ছে। বিমানটা ছিল রিমোট কন্ট্রোলড। 'ইউরেকা!' ব্রিলের মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো একটা বুদ্ধি খেলে গেল— 'কয়েকটা এরকম রিমোট কন্ট্রোলড খেলনা বিমান কিনে তাতে ক্যামেরা লাগিয়ে সুয়েজ খালের ওপর দিয়ে ওড়ালেই তো মিশরের সেনার উপস্থিতির এবং গতিবিধির সব বিবরণ পাওয়া যাবে।'

চটপট কাজে নেমে পড়লেন ব্রিল। প্রথম পদক্ষেপ ছিল, এমন কাউকে বেছে নেওয়া যে রিমোট কন্ট্রোলড এরোপ্লেন ওড়ানোয় দক্ষ। খোঁজ খোঁজ! এজেন্সির পক্ষ থেকে সামনে এনে ফেলা হল এক অফিসার স্লোমো বারাকের নাম। এই আধিকারিক প্রতি সপ্তাহান্তের ছুটিতে খেলনা বিমান উড়িয়ে অবসর বিনোদন করেন। ব্রিল বুঝে গেলেন যে, একে দিয়েই কাজ হবে।

পরবর্তী ধাপ কী ছিল?

সেটা হল এই পরিকল্পনার সরকারি অনুমোদন। ব্রিল চাইছিলেন, বায়ুসেনা নিজেই এই কাজের দায়িত্ব নিক। ইসরায়েলি এয়ারফোর্সকে আমানের তরফ থেকে এই দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলে বায়ুসেনার টেকনিকাল বিভাগের আধিকারিকরা কটাক্ষ করে বললেন, 'আরে ভাই, ওগুলো খেলনা বিমান, ওগুলো দিয়ে কিস্যু হবে না!'

এই কথা শুনে ভয়ানক নিরাশ হলেন ব্রিল। তিনি ছুটলেন তাঁর কমান্ডার কর্নেল আব্রাহাম আরনানের কাছে। আরনান সব শুনে বললেন, 'আগে তুমি নিজে আমাকে এরকম একটা খেলনা বিমান চালিয়ে দেখাও, তারপর আমি দেখছি কী করা যায়।'

দিনক্ষণ ঠিক করা হল। তেল আভিভ থেকে কিছুটা দূরে একটা এয়ারস্ট্রিপ বাছা হল ট্রায়ালের জন্য। নির্ধারিত দিনে স্লোমো বারাক রিমোট দিয়ে বিমান টেক অফ করালেন। আকাশে ওড়ালেন। তারপর নিজস্ব কিছু কায়দা দেখিয়ে নির্ভুলভাবে ল্যান্ডও করালেন বিমানটাকে।

সব দেখে আরনান খুশি হলেন। তিনি ব্রিলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আনুমানিক কত খরচ পড়বে?'

ব্রিল হিসাব করে বললেন, 'তিনটে এরোপ্লেন, ছ'টা রিমোট, পাঁচটা ইঞ্জিন, বাড়তি টায়ার আর প্রপেলার নিয়ে পড়বে মোট ৮৫০ মার্কিন ডলার।

'গো আহেড!' বললেন আরনান।

আরনান সবুজ সংকেত দেওয়ার পরই ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সের একটি টিম নিউ ইয়র্কের ম্যানহ্যাটনে একটা খেলনার দোকানে গিয়ে হাজির হল। প্ল্যানমাফিক সরঞ্জামগুলো কেনার পর সেগুলো ইসরায়েলি দূতাবাসের ডিপ্লোম্যাটিক পাউচে করে পাঠানো হল দেশে। ইসরায়েলে পৌঁছনোর পর মালগুলোকে সটান হস্তান্তরিত করা হল ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টরেটের টেকনিকাল টিমের কাছে। সেখানে প্লেনগুলোতে জার্মান ৩৫০ এমএম

ক্যামেরা বসল। এই ৩৫০ এমএম ক্যামেরার বিশেষত্ব হল, এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতি ১০ সেকেন্ড অন্তর একটা করে ছবি উঠবে।

এবার আসরে নামার পালা। কিন্তু সরাসরি অপারেশনে নামার আগে একবার যাচাই করে নেওয়া দরকার। সবার একটাই ভয় হচ্ছিল যে মিশরের সেনা খেলনা বিমান দেখলেই তো গুলি করে এর ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে। সুতরাং, পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

গ্রীষ্মের এক দুপুরে ইসরায়েলের দক্ষিণে নেগেভ মরুভূমির মিলিটারি বেসক্যাম্পে আরনান ও ব্রিল গিয়ে উপস্থিত হলেন। রাস্তার একটা দিক ছেড়ে দেওয়া হল রানওয়ে হিসাবে ব্যবহারের জন্য। আর অ্যান্টি এয়ারক্রাফ্ট মেশিনগানগুলোকে প্রস্তুত রেখে ওপরের দিকে তাক করা হল তাদের মুখ। ব্রিলের হার্টবিট বেড়ে গেল। যদি মেশিনগানগুলো গুলি করে বিমানটাকে নীচে নামাতে পারে তাহলে যাবতীয় পরিকল্পনা তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দেওয়া হবে।

বিমান উড়ল। টেক অফ করার পর যখন খেলনা প্লেনটা আকাশে চক্কর কাটতে থাকল, তখন তার দিকে গোলাবর্ষণ করার আদেশ দেওয়া হল। কান পাতা দায় হয়ে গেল বিকট শব্দে। আর ধোঁয়ায় ভরে গেল চারদিক। কিছুক্ষণ পর ব্রিল বিমানটিকে আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। মনে অনে ভাবলেন, 'বোধহয় সব শেষ এবার।'

একটা সময়ে ফায়ারিং থামল। ধোঁয়া খানিকটা পরিষ্কার হলে ব্রিল ওপরের দিকে তাকালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অস্ফুটে বলে উঠলেন— 'অবিশ্বাস্য!' আকাশে তখনও অক্ষত অবস্থায় উড়ছে এরোপ্লেনটা।

আসলে খেলনা বিমান আকারে আসল বিমানের থেকে এতটাই ছোট যে, একে নিশানা লাগানো ভীষণ কঠিন ব্যাপার।

আর আরনান তো নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বিমান নীচে নামার পর তিনি ব্রিলকে জড়িয়ে ধরলেন। বলাই বাহুল্য যে, ব্রিল এই বিমান মিশরের আকাশে ব্যবহার করার অনুমতি পেয়ে গেলেন।

প্রথমে সুয়েজ খালের পাশে ইসমালিয়া শহরের কাছে মিশরের মিলিটারির অবস্থান জানার জন্য এটাকে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। বিমানের দায়িত্ব দেওয়া হল দুজনকে। একজন হল পাইলট, মানে যার হাতে কন্ট্রোলিং রিমোট থাকবে। আরেক জন দিকনির্দেশক, যে বাইনোকুলার দিয়ে প্লেনটার ওপর নজর রাখবে।

পাইলটের দায়িত্বে ছিলেন বারাক। আরনান মিশরের মাত্র এক কিমি ভেতর পর্যন্তই যাওয়ার অনুমতি দিলেন। প্রথমেই বেশি ঝুঁকি তিনি নিতে চাইছিলেন না। অবিশ্বাস্য সাফল্য এল প্রথম বারের উড়ানেই। যে ছবিগুলো হাতে পাওয়া গেল, তাতে পরিষ্কার ভাবে মিশরের সেনার পরিখা বা মিলিটারি ট্রেঞ্চগুলো দেখা যাচ্ছিল। এমনকী কমিউনিকেশন কেবলগুলো পর্যন্ত দৃশ্যমান হচ্ছিল স্পষ্ট ভাবে।

এরপর জর্ডন উপত্যকাতে একইরকম অভিযান চালানো হল। সাফল্য এল সেখানেও। এর কার্যকারিতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এবার কিছু সিরিয়াস চিন্তাভাবনা শুরু করল আমান কর্তৃপক্ষ। তৎকালীন মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সর প্রধান, মেজর জেনারেল আহারন য়ারিভ একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন— ইসরায়েল এবার এ ধরনের আরো ছোট আকারের বিমান নিজেই বানাবে এবং তা নিয়মিত ব্যবহার করবে।

য়ারিভ ব্রিলকে এই অভূতপূর্ব আবিষ্কারের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে একটা চিঠি লিখেছিলেন। এর কয়েক সপ্তাহ পরে ব্রিলের পদোন্নতি হয় ও তাঁকে সিনাইতে আর্লি ওয়ার্নিং ইন্টেলিজেন্স সিস্টেমের কমান্ডার বানিয়ে দেওয়া হয়। ব্রিল বেশ খুশিই হয়েছিলেন। না পদোন্নতির জন্য নয়, তাঁর প্রোজেক্টটা সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে তাই। কিন্তু ব্রিলের এই আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী হল না। তিনি এক পুরোনো বন্ধুর কাছ থেকে খবর পেলেন যে, তাঁর এই প্রোজেক্টটাকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

কারণ কী ছিল?

য়ারিভ যাদের নিয়ে টিম বোনিয়ছিলেন, তাদের তৈরি করা বিমান বারবার ক্র্যাশ হচ্ছিল। আর এদিকে প্রোজেক্টে অনেক টাকাও ঢালা হয়ে গিয়েছিল 1 কোনো উপায় না দেখে এই প্রোজেক্ট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

এই খবর শুনে ব্রিলের মাথায় যেন বাজ পড়ল। এটা কীভাবে সম্ভব?

ব্রিলও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি য়ারিভ সহ ইন্টেলিজেন্সের পদস্থ অফিসারদের সবাইকে চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন যাতে এই প্রোজেক্ট হঠাৎ বন্ধ না করা হয়। তিনি এটাও সতর্ক করলেন যে, এর ফলে ইসরায়েলের ইন্টেলিজেন্সের ক্ষতি হবে। সেদিন ব্রিলের কথায় কেউ কান দেয়নি। প্রোজেক্ট বন্ধ করে দেওয়া হল।

ব্রিলের আশঙ্কাই সত্যি হয়েছিল। ইসরায়েলকে এই ভুলের খেসারত দিতে হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের ৬ অক্টোবর (য়ম কিপ্পুর) মিশরীয় সেনা সুয়েজ পেরিয়ে সিনাই উপদ্বীপ এলাকায় অতর্কিতে হামলা চালায়। প্রায় বিনা বাধায় তারা এই এলাকায় প্রবেশ করে। ইসরায়েলের স্বাধীনতার পর এটাই সবচেয়ে ভয়ানক যুদ্ধ ছিল। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইসরায়েলি সেনা সিনাই উপদ্বীপ নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু এর ফলাফল ছিল মারাত্মক। প্রায় ২,০০০ ইসরায়েলি সৈন্য নিহত হয়েছিল।

এই ঘটনা দেখে সবথেকে বেশি আহত হয়েছিলেন ব্রিল। রাগে, দুঃখে নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না। ব্রিলের প্রোজেক্ট বন্ধ না করা হলে মিশরের সেনার আক্রমণের আগাম খবর হয়তো পাওয়া যেত। তাহলে আগে থেকে প্রতিরোধও করা যেত, এড়ানো যেত শত শত লোকের মৃত্যু।

আমানের পক্ষ থেকেও এই ভুল উপলব্ধি করতে বেশি সময় লাগেনি। স্থানীয় ডিফেন্স কোম্পানিগুলোর সঙ্গে আলোচনা করা হল। শুরু হল হালকা আনম্যানড এরিয়াল ভেইকল বা ইউএভি তৈরির কাজ। এই ইউএভি-ই আজকের দিনের ‘ড্রোন’। কয়েক বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৭৯ সালে তৈরি হল প্রথম ড্রোন, যার নাম দেওয়া হল ‘স্কাউট’ এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এটাকে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

১৯৮২ সালের জুন মাস। লেবানন থেকে রকেট আক্রমণের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল ইজরায়েল। এই আক্রমণের হোতা ছিল প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা পিএলও। এদের এক এবং একমাত্র লক্ষ্যই থাকে যেনতেনপ্রকারেণ ইসরায়েলের ক্ষতিসাধন। ইসরায়েলের তরফে ঠিক করা হল যে, লেবাননে ঢুকে এদের সমূলে উৎপাটন করা হবে। লেবাননে এয়ার স্ট্রাইক করা ছিল কার্যত অসম্ভব। কারণ ওদের হাতে ছিল সোভিয়েত নির্মিত সারফেস- টু-এয়ার মিসাইল। এরকম প্রায় কুড়িটি মিসাইল ব্যাটারি লেবাননের বেকা উপত্যকায় সক্রিয় ছিল। স্কাউটকে এবার মাঠে নামানো হল। এই ড্রোনের মাধ্যমেই প্রথমে মিসাইল ব্যাটারির লোকেশনগুলো ইসরায়েলি বায়ুসেনার হাতে পৌঁছায়।

৬ জুন, ১৯৭৯। ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেমের মাধ্যমে মিসাইলের সমস্ত ব্যাটারিগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হল। এরপর ইসরায়েলি ফাইটার জেট বোমাবর্ষণ করে প্রায় সব ক'টা মিসাইল ব্যাটারি ধ্বংস করে দেয়।

অভাবনীয় সাফল্য! একটা ফাইটার জেটেরও েকোনা ক্ষতি হয়নি এই অপারেশনে। এত নিখুঁত অভিযান একমাত্র ড্রোনের জন্যই সম্ভব হয়েছিল। যারা এত দিন পর্যন্ত ড্রোনের কার্যকারিতা নিয়ে সন্দিহান ছিল, তারাও মেনে নিল যে যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোনের ভূমিকা হবে অপরিসীম।

এদিকে আমেরিকাও ড্রোন বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছে তখন। তারা ড্রোনকে ঠিকঠাক টেক অফ করাতে পারছিল না। কয়েক বিলিয়ন ডলার খরচা করার পরও যখন সাফল্য এল না, তখন তারা ড্রোন বানানোর প্রোজেক্ট বন্ধ করে দেয়।

১৯৮৩ সালের জুন মাস নাগাদ আমেরিকা ইসরায়েলের কাছে সাহায্য চাইল। তার কারণও ছিল অবশ্য। একটা আমেরিকান গুপ্তচর বিমানকে সিরিয়া গুলি করে নীচে নামিয়েছিল। আর তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে বেইরুটের কাছে সিরিয়ার অ্যান্টি এয়ারক্রাফ্ট ব্যাটারি লক্ষ্য করে আমেরিকা বিমান হামলা চালায়। এই হামলাতে আমেরিকা দুটো যুদ্ধবিমান ও একজন পাইলটকে হারায়। মিশন ব্যর্থ হয়। এনকোয়ারিতে জানা গেল যে, সিরিয়াতে টার্গেট আমেরিকান যুদ্ধজাহাজের ক্যাননের রেঞ্জের মধ্যেই থাকলেও তার সঠিক লোকেশনটাই জানা নেই। আর সেটা জানতে গেলে আমেরিকার দরকার একটা ড্রোন। নিজেদের বিমান এবং পাইলট হারানোর কয়েক সপ্তাহ পর ইউএস নেভির সেক্রেটারি জন লেম্যান বেইরুট ছুটলেন, আর সেখানে তিনি ড্রোন সম্পর্কে জানার জন্য তেল আভিভ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯৮২ সালেই তিনি খবর পেয়েছিলেন যে, ইসরায়েলিরা ড্রোন ব্যবহার করছে। কিন্তু তিনি ইসরায়েলি ড্রোন 'স্কাউট'কে একটি বার কাছ থেকে দেখতে চাইছিলেন। ইসরায়েলে যাওয়ার পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানকার মিলিটারি হেডকোয়ার্টারের একটা ঘরে। তাঁর সামনে একটা টিভি আর তাঁর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল একটা উড়ন্ত ড্রোনকে কন্ট্রোল করার জয়স্টিক! ড্রোনের ব্যবহার দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন লেম্যান।

এরপর মেরিন কের্পেসর কমান্ডান্ট জেনারেল পল জিয়ার কেলিকে ইসরায়েলে পাঠানো হল এবং তিনিও স্বচক্ষে সব দেখলেন। লেম্যান ও কেলি দুজনেই ড্রোন কিনতে সমান ভাবে আগ্রহী হলেন। কারণ, ড্রোন হাতে পেলে সিরিয়াকে শিক্ষা দেওয়া ছিল কেবল সময়ের অপেক্ষা।

তাঁরা সরাসরি আমেরিকান নেভি এবং ইসরায়েল এরোস্পেস ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে একটা চুক্তি করলেন। আমেরিকা চাইছিল আরেকটু বড় ও শক্তিশালী ড্রোন, যার প্রযুক্তি হবে আরো উন্নত এবং যুদ্ধজাহাজও ব্যবহারের উপযোগী। শীঘ্রই একটা প্রোটোটাইপ তৈরি করা হল, তার নাম দেওয়া হল 'পায়োনিয়ার'। মাজোভে, মরুভূমিতে পরীক্ষামূলক উড়ান করা হল। আমেরিকান নেভির কর্তারা যারপরনাই বিস্মিত হলেন এবং সঙ্গে আনন্দিতও। তারা ১৭৫টা পায়োনিয়ার তখনই অর্ডার দিয়ে দিলেন।

১৯৮৬ সাল থেকে আমেরিকাতে পায়োনিয়ারের ডেলিভারি শুরু হয়। আমেরিকাকে অবশ্য পায়োনিয়ার ড্রোন যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৯৯১ সালে সাদ্দাম হুসেনের ইরাক, কুয়েত আক্রমণ করে। আমেরিকা কুয়েতের পক্ষ নেয়। ইরাকের বিরুদ্ধে এরকম একটা অপারেশনের সময়কার একটা ঘটনা। এক দল ইরাকি

সৈন্যদের ওপর দিয়ে পায়োনিয়ার উড়ে যাচ্ছিল। ইরাকি সৈন্যরা ভয়ে নিজেদের সাদা গেঞ্জি উড়িয়ে আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত দিয়েছিল। বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম বার েকানা রোবটের কাছে একটা গোটা মিলিটারি ইউনিট আত্মসমর্পণ করেছিল। এর কৃিতত্ব ইসরায়েলরই প্রাপ্য।

ওদিকে লেম্যান ইসরায়েল থেকে আমেরিকা ফেরার পর জানতে পারলেন যে, লস আঞ্জেলেসে কেউ এরকমই একটা ড্রোন তৈরি করছে।

কে সেই ব্যক্তি?

একজন ইসরায়েলি এঞ্জিনিয়ার এই কাজটা করছিলেন। তাঁর নাম আবে কারেম। কারেম ইসরায়েল এরোস্পেস ইন্ডাস্ট্রির একজন প্রাক্তন পদস্থ আধিকারিক। ১৯৭৩ সালে য়ম কিপুর যুদ্ধের সময় কারেম নিজের প্রথম আনম্যানড এয়ারক্রাফ্ট বানান। ইসরায়েল যখন মিশরের সোভিয়েত এয়ার ডিফেন্স ভেদ করতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছিল, তখন কারেম এমন একটা মিসাইল বানিয়েছিলেন যেটা জয়স্টিক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হত। এর মাধ্যমে মিশরের রাডারগুলোকে সক্রিয় করে তাদের সঠিক অবস্থান জানা গিয়েছিল। এই মিসাইল ব্যবহার করে রাডারগুলোকে সক্রিয় করে তোলা হয়। তারপর ফাইটার জেট থেকে রাডারে মিসাইল নিক্ষেপ করে রাডারগুলোকে নষ্ট করা সম্ভব হয়েছিল। এই সাফল্যের পর কারেম ভেবেছিলেন যে, এটা ইসরায়েলে বানানোর জন্য সরকার বিনিয়োগ করবে দেশি ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে। কিন্তু কারেম অবাক হলেন যখন তিনি জানলেন যে ইসরায়েল রিমোট কন্ট্রোলড মিসাইল মার্কিনদের কাছ থেকে কিনছে। তাঁর একটা স্বপ্নের প্রোজেক্ট এভাবে ধূলিস্যাৎ হওয়াতে কারেম ভীষণ হতাশ হয়েছিলেন। শেষে তিনি ইসরায়েল ছেড়ে আমেরিকাতে চলে আসেন।

কারেমের লক্ষ্য ছিল খুব কম খরচে একটা ড্রোন তৈরি করা। তিনি ‘অ্যাম্বার’ নামে একটা প্রোটোটাইপ বানালেন, যেটার ইঞ্জিন ছিল একটা বাইকের, আর বড়ি ছিল প্লাইউড এবং ফাইবার গ্লাসের। অ্যাম্বার একটানা ৩০ ঘণ্টা উড়তে পারছিল। লেম্যানের উদ্যোগে আমেরিকান নেভি ২০০টা অ্যাম্বার কিনতে চাইল। কারেম ভাবলেন যে, এবার তাঁর কপাল ফিরল। ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে কাজ করতে এগোলেন। কিন্তু ১৯৮৭ সালে গভর্নমেন্ট ডিফেন্সের বরাদ্দ বাজেট কমিয়ে দিল। ফলে সেই অর্ডার বাস্তবে আর সম্ভব হল না। কারেম এবার এক্সপোর্ট কোয়ালিটি ড্রোন বানানোর কাজ আরম্ভ করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য! ঠিক তখনই ব্যাঙ্ক তাঁর কাছ থেকে লোনের ৫ মিলিয়ন ডলার ফেরত চাইল। বাধ্য হয়ে কারেম তার যন্ত্রপাতি সব বেচে দিলেন।

১৯৯৩ সালে তৎকালীন যুগোস্লাভিয়াতে এথনিক ওয়র শুরু হয়। সেনা ও জঙ্গি উভয়পক্ষই সাদা পোশাকে লড়াই করছিল। এমতাবস্থায় আমেরিকার পক্ষে বাস্তবিক পরিস্থিতি বোঝা একরকম অসম্ভব ছিল।

একইরকমভাবে বসনিয়ায় যুদ্ধের সময় সিআইএ একই সমস্যার সম্মুখীন হয়। তৎকালীন সিআইএ ডিরেক্টর ছিলেন রবার্ট জেমস উলসে। তিনি জানতেন, ড্রোনের সাহায্য ছাড়া পরিস্থিতির অনুমান করা সম্ভব নয়। উলসে পেন্টাগনের ড্রোন এক্সপার্টদের ডেকে পাঠালেন। বিশারদরা জানালেন, ‘বসনিয়ায় ড্রোন পাঠাবেন তো? হয়ে যাবে। ড্রোন তৈরি করতে সময় লাগবে ছ’ বছর আর খরচ পড়বে পাঁচশো মিলিয়ন ডলার।’

বলাই বাহুল্য যে, সময় এবং অর্থের পরিমাণ, দুটোই ছিল অত্যন্ত বেশি। উলসে তখন আবে কারেমকে ডেকে পাঠালেন। আসলে কয়েক বছর আগে উলসের সঙ্গে কারেমের একবার দেখা হয়েছিল এবং প্রথম দেখাতেই উলসে বুঝে গিয়েছিলেন যে,

কারেমের অদ্ভুত ইনোভেটিভ সব আইডিয়া আছে। কারেমকে ডেকে এনে সিআইএ ডিরেক্টর সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'বসনিয়ার জন্য ড্রোন বানাতে তোমার কত সময় ও কত খরচ পড়বে?'

'সময়... স্মমমমম... এই ধরুন ছ' মাস। আর খরচ হবে ফাইভ মিলিয়ন ডলার।'

সিআইএ-এর পক্ষ থেকে জেন নামের একজন ব্যক্তিকে কারেমের সহায়ক হিসাবে দেওয়া হল। ছ' মাস পর কারেম ও জেনের তৈরি ড্রোন 'ন্যাট ৭৫০' বসনিয়ার আকাশে উড়তে শুরু করে দিল। এরপর কয়েক দিনের মধ্যেই উলসে সিআইএ-এর ল্যাংগলের অফিসে বসে সরাসরি সব খবর পেতে থাকলেন। 'ন্যাট'-এর সাফল্যে পেন্টাগন থেকেও শুভেচ্ছাবার্তা এল। সেই বার্তায় বলা হল— 'আরও শক্তিশালী ড্রোন বানাও, যার এঞ্জিন হবে আরও বড় ও পাখনা হবে আরও শক্তিশালী।'

এবারের ন্যোট একটা পরিবর্তন আনা হল। ন্যাটকে স্যাটেলাইটের সঙ্গে লিঙ্ক করে দিল সিআইএ। আর নতুন নামকরণের জন্য আয়োজন করা হল এক প্রতিযোগিতার। শেষ পর্যন্ত নাম বাছা হল 'প্রিডেটর', যার অর্থ 'শিকারি'। শত্রুর কাছে সঠিক অর্থেই এটা প্রিডেটর ছিল। সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাক এবং ইয়েমেনে অসংখ্যবার প্রিডেটরের ব্যবহার করা হয়েছে এবং সাফল্যও পাওয়া গেছে। এই কাজ ইসরায়েল এবং এক ইসরায়েলি এঞ্জিনিয়ারের সাহায্য ছাড়া সম্ভবই হত না।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ড্রোনের এত জনপ্রিয়তার কারণ শুধু যুদ্ধে এর সাফল্য দিয়ে বিচার করলেই কিন্তু চলবে না। আসলে ড্রোনের েকানা বিকল্প নেই।

-মানুষ ১০-১২ ঘণ্টা টানা কাজ করার পর তার বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ড্রোন একটানা ৫০ ঘণ্টা আকাশে উড়তে পারে।

-ড্রোন কেমিক্যাল ও বায়োলজিকাল অস্ত্রের নাগালের বাইরে থাকে বলে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

-আকারে ছোট বলে একে টার্গেট করা মুশকিল। আর ড্রোনের শব্দ এতই কম যে রাস্তার ট্রাফিকের শব্দের মাঝে এর শব্দ আলাদা করে বোঝাই যাবে না।

-যুদ্ধবিমান নির্মাণের চেয়ে ড্রোন তৈরি করার খরচ অনেকটাই কম।

১৯৮৫ সাল থেকে ইসরায়েল ড্রোন রফতানিতে প্রথম স্থানে আছে। প্রায় ৬০% আন্তর্জাতিক বাজার ইসরায়েলের হাতে। দ্বিতীয় স্থানে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যার বাজারে শেয়ার প্রায় ২৩.৯%। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রাজিলের মতো দেশ ইসরায়েলের ড্রোন ব্যবহার করে। ইসরায়েলি মিলিটারি এখন ব্যাপক হারে ড্রোন ব্যবহার করছে। তারা 'হেরন' নামে যে ড্রোনটা ব্যবহার করছে তার একটা বিশেষত্ব আছে। এর ফ্লাইট রুট আগে থেকেই এতে প্রোগ্রাম করে দেওয়া যায়। এই ড্রোন পূর্বনির্ধারিত পয়েন্টে ল্যান্ড করতেও সক্ষম। এর ফলে হেরন-এর অপারেটর মিশনে বেশি করে মনোযোগ দিতে পারে।

ড্রোনকে প্রথম দিকে শুধু ইনটেলিজেন্স এবং নজরদারির প্রয়োজনেই ব্যবহার করা হত। ড্রোনগুলোতে লেসার ডেসিগনেটর লাগানো হয়েছিল, যা লেসার রশ্মির মাধ্যমে লক্ষ্যবস্তুকে আলোকিত করে তুলত আর ফাইটার এয়ারক্রাফ্ট বা হেলিকপ্টার থেকে মিসাইল ছুড়ে লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করা হত। একজন হিজবুল্লাহ জঙ্গির গাড়িকে ঠিক এভাবেই টার্গেট

করে তাকে হত্যা করেছিল ইসরায়েলি সেনা। এবার ড্রোন নিয়ে আরেকটু ভাবনাচিন্তা শুরু হল। ড্রোন যদি এত কিছু করতে পারে তবে মিসাইলও নিশ্চয়ই নিক্ষেপ করতে পারবে।

ইসরায়েলের কাছে 'হেরন' ও 'হার্মিস ৪৫০' নামে যে ড্রোন আছে তারা মিসাইল বহন করতে পারে ও প্রয়োজনে নিখুঁতভাবে লক্ষ্যভেদ করতে পারে। গাজা এলাকায় ২০১২ সালে ১,০০০টা আন্ডারগ্রাউন্ড রকেট লঞ্চার ও ২০০টি টানেল আক্রমণ করে ইসরায়েলি সেনা। আর এদের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য দিয়েছিল এই ড্রোন।

আহমেদ জাবারি, হামাসের একজন মিলিটারি কমান্ডার এবং ইসরায়েলের কাছে একজন মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসবাদী। গাজার রাস্তায় তার গাড়িতে ইসরায়েলি মিসাইল অকস্মাৎ আঘাত হানে। ড্রোনের মাধ্যমে তার অবস্থান সুনিশ্চিত করে তবেই এই মিসাইল-হামলা চালানো হয়েছিল। এর আগে চার চার বার তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গিয়েছিল। যে কাজ চার বারে সফল হয়নি, ড্রোনের সাহায্যে তা অনায়াসেই করে ফেলল আইডিএফ।

২০১০ সালের আগে পর্যন্ত ইসরায়েলি সেনার মধ্যে 'পালসার' নামে একটা ছোট ইউনিট ছিল। পালসার ইউনিটের কাজ ছিল ট্যাঙ্কগুলোর আগে আগে চলা এবং শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে টিমকে সতর্ক করা। নিজেদের জীবন বিপন্ন করে এই কাজটি সৈন্যদের করতে হত। এই কাজ ড্রোন দিয়ে করানো শুরু হলে পালসার ইউনিট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

২০০৯ সালের জানুয়ারি মাস। গাজা স্ট্রিপ থেকে ইসরায়েল সেনা প্রত্যাহার করেছে সবে চার বছর হয়েছে, কিন্তু প্যালেস্টাইনের তরফ থেকে রকেট আক্রমণ থামছিল না। শুধু আগের বছরই দু' হাজারেরও বেশি রকেট ও মর্টার ধেয়ে এসেছে প্যালেস্টাইন থেকে। তৎকালীন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন য়হুদ অলমার্ট। তিনি গাজা স্ট্রিপে সেনা নামানোর নির্দেশ দিলেন। এবার হয় এসপার, নয় ওসপার! গাজাতে সেনা নামল।

ওদিকে ইসরায়েলের জন্য আরেকটা খারাপ খবর অপেক্ষা করছিল। খবরটা দিল মোসাদ। ইরান থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্রবোঝাই একটি জাহাজ লোহিত সাগরে সুদানের বন্দরে নোঙর করেছে। অস্ত্রগুলির মধ্যে ছিল ফজু আর্টিলারি রকেট, যা কিনা অনেক লম্বা রেঞ্জের এবং তেল আভিভ পর্যন্ত আঘাত হানতে সক্ষম। এই অস্ত্র যদি প্যালেস্টাইনে পৌঁছয়, তাহলে সর্বনাশ নিশ্চিত। মোসাদের কাছে খবর ছিল, অস্ত্রভর্তি কন্টেনারগুলো ট্রাকে করে সুদান ও মিশর হয়ে গাজা সীমান্তে পৌঁছানো হবে। সেখান থেকে সুড়ঙ্গ মারফত অস্ত্রগুলো গাজা ভূখণ্ডে পাচার করা হবে। তৎকালীন আইডিএফ চিফ অব স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল গবি আশকেনাজি এই ট্রাকের কনভয় আক্রমণের ছক কষতে লেগে পড়লেন। যে করেই হোক অস্ত্রবোঝাই গাড়ির কনভয়কে মিশরে ঢোকার আগেই আক্রমণ করতে হবে। মিশরের সঙ্গে তখন ইসরায়েলের শান্তিচুক্তি চলছিল। মিশরে আক্রমণ করলে আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে পড়তে হত ইসরায়েলকে। তাই তারও আগে, সুদানের সীমানার মধ্যেই যা করার তা করে ফেলতে হবে। সুতরাং, হাতে সময় ছিল খুবই কম।

এরকম অপারেশন চালানোর আগে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন দরকার হয়। এর আগেও দেশের বাইরে সিরিয়াতে নিউক্লিয়ার রিয়্যাকটর গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ইজরায়েলি বায়ুসেনা। আমেরিকার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও হামলা করা হয়েছিল। দেশের বাইরে এভাবে হামলা চালাতে থাকলে আন্তর্জাতিকভাবে আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এবারের আক্রমণ এমনভাবে করতে হবে যাতে কেউ যেন কোনো ভাবেই ইসরায়েলকে সন্দেহ না করতে পারে।

ফাইটার জেট পাঠালে রাডারে ধরা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চলন্ত ট্রাককে শনাক্ত করে টার্গেট করাটাও একটা চ্যালেঞ্জ। আর সুদানের আকাশে বেশি সময় ওড়াও যাবে না, কারণ ফাইটার জেটের জ্বালানির ক্ষমতাও যে সীমিত। আসকেনাজি তার অপারেশন বিভাগের প্রধানদের ডেকে পাঠালেন। আলোচনার পর ড্রোন দিয়ে আক্রমণের সিদ্ধান্তেই সিলমোহর পড়ল। প্রধানমন্ত্রী এবারে অবশ্য 'সেন্ড ইয়োর বয়েজ' বলতে পারলেন না, কারণ আক্রমণকারীরা তো যন্ত্র ছিল।

আক্রমণের আগে নেগেভ মরুভূমিতে শুরু হল মহড়া। মহড়ার প্রথম ধাপ ছিল কনভয়ের সঠিক অবস্থান সুনিশ্চিত করা। দ্বিতীয় ধাপ, টার্গেটে আঘাত হানা। আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও সুদানের বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে ট্রাকের কনভয় খুঁজে বের করা ছিল খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজারই সামিল। এই অপারেশনের জন্য হেরন টিপি এবং হার্মিস ৪৫০ ড্রোনকেই বেছে নেওয়া হল। হেরনের কাজ ছিল কনভয়কে শনাক্ত করা ও তার গতিবিধির খবর দেওয়া। হেরনের উপস্থিতি যাতে ধরা না পড়ে তার জন্য তাকে ওড়াতে হত অনেক বেশি উচ্চতা দিয়ে। আর হার্মিস ড্রোন মিসাইল দিয়ে আঘাত হানবে কনভয়ের ওপর। প্রয়োজনে ফাইটার জেট ব্যবহারের পথও খোলা রাখা হল। তবে সেটা ছিল ব্যাকআপ প্ল্যান।

আক্রমণের সময় হিসাবে বেছে নেওয়া হল রাত্রিবেলা। হামলার দিনে আকাশ আংশিক মেঘাচ্ছন্ন ছিল। জানুয়ারিতে সুদানে এরকমই আবহাওয়া থাকে। সুদান ও প্যালেস্টাইনের পাচারকারীরা নিশ্চিন্তে পথ চলেছিল মরুভূমির মধ্যে দিয়ে।

ইসরায়েল যে ড্রোন দিয়ে হামলা চালাতে পারে এটা পাচারকারীদের ধারণার বাইরে ছিল। তারা যখন দেখল মিসাইলগুলো উল্কাবেগে তাদের দিকে ছুটে আসছে, তখন বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল। এই হামলায় ৪৩ জন পাচারকারী নিহত হয়, আর সব ক'টা ট্রাকই ধ্বংস হয়ে যায়। ইসরায়েলের মিশন সফল হয়েছিল।

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই ইরান আবার অস্ত্র পাচার করার চেষ্টা করে। এবারেও অলমার্ট আরেকটা এয়ার স্ট্রাইকের অনুমতি দিলেন। অবশ্যই ড্রোন স্ট্রাইক। এই হামলায় ৪০ জন পাচারকারী মারা পড়ল আর ডজনখানেক ট্রাক ধ্বংস হল।

পরপর দুটি ঘটনায় গোটা সুদানে সাড়া পড়ে গেল। সুদান জানত যে, ইরান ও হামাস মিলিতভাবে অস্ত্র পাচার করার জন্য গোপনে সুদানের মাটি ব্যবহার করছে। কিন্তু সুদানের রাষ্ট্রপতি ওমর আল-বসিরের সরকার ঘুণাক্ষরেও এটা

আন্দাজ করতে পারেনি যে, ইসরায়েল সুদানে প্রবেশ করে এরকম দুঃসাহসিক অভিযান চালাতে পারে। তাদের সন্দেহের তির ছিল আমেরিকার দিকে। তাই ২৪ ফেব্রুয়ারি সুদানের বিদেশ মন্ত্রক আমেরিকান এমব্যাসির ইন-চার্জ আলবার্তো ফার্নান্ডেজকে আমেরিকার বিভাগগুলোর দায়িত্বে থাকা নাসেরুদ্দিন ওয়ালির সঙ্গে দেখা করার জন্য রাজধানী খতুমে ডেকে পাঠায়।

'আমাদের ধারণা, আমেরিকান প্লেনগুলোই এই হামলা চালিয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি! এর জবাব আমরা দেব সঠিক সময়ে! দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার অধিকার আমাদের আছে এবং যে কোনো মূল্যে আমরা সেটাকে রক্ষা করব,' ওয়ালি কথাগুলো ফার্নান্ডেজকে শোনালেন।

ফার্নান্ডেজ আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোনো কথাই বলেননি। তিনি শুধু ওয়ালিকে

আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সুদানের উদ্বেগ তিনি ওয়াশিংটনকে জানাবেন।

সুদানের আমেরিকাকে সন্দেহ করাটা নিতান্ত অমূলক ছিল না। তার কারণ, মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই ফার্নান্ডেজ সুদান সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, ইরান গাজার হামাসকে অস্ত্র পাচার করার জন্য সুদানের এলাকা ব্যবহার করছে এবং সুদান সরকারের এতে প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে। তাই সুদান গভর্নমেন্ট ভেবেছিল, হয়তো আমেরিকাই সুদানের বিরুদ্ধে মিলিটারি অ্যাকশন শুরু করেছে।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল যখন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী অলমার্ট তেল আভিভে একটা সিকিউরিটি কনফারেন্সে ঘোষণা করলেন যে, ইসরায়েল দেশের বাইরে একটা কাউন্টার-টেররিসম অভিযান চালিয়েছে— 'আমি এর থেকে বেশি বিস্তারিত আর কিছুই বলব না, বাকিটা আপনারা বুঝে নিন। যে জানতে ইচ্ছুক, সে ব্যাপারটা ঠিকই জেনে যাবে... তবে জেনে রাখুন, পৃথিবীতে এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে ইসরায়েল অভিযান করতে পারে না।' সমঝদারকে লিয়ে ইশারা হি কাফি হোতা হ্যায়!

ইসরায়েলের তুলনামূলক ভাবে নতুন একটি মিলিটারি ইউনিটের নাম 'ম্যাগলান'। তুখোড় একটি ইউনিট! ১৯৮৬ সালে একে গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু এরপরে প্রায় প্রায় দুই দশক ধরে দুনিয়াবাসীর কাছে গোপন ছিল এর অস্তিত্ব। ২০০৬ সালে একটা আলাদা ইউনিট হিসাবে ম্যাগলানের নাম প্রকাশ্যে আনা হয়। শত্রুর সীমানায় ঢুকে শত্রুকে ধরাশায়ী করতে ম্যাগলানের জুড়ি মেলা ভার। এই ইউনিটের একজন তরুণ সদস্য ছিলেন অমিত উল্ফ। উল্ফ যত দিন এই ইউনিটে ছিলেন, প্রায় প্রতিদিনই ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও দক্ষিণ লেবাননে

হিজবুল্লাহ জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চলত। মিলিটারি সার্ভিস পুরো করার পর উল্ফ এরোস্পেস এঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেন। পড়া শেষ করার পর উল্ফ ইসরায়েল এরোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ (আইএআই)-এর ড্রোন ডিভিশনে যোগ দেন।

মিলিটারিতে সার্ভিস করার সময় থেকেই উল্ফের ইচ্ছা ছিল এমন একটা ড্রোন বানানো যেটা একজন সৈনিক খুব সহজেই নিজের পিঠে বহন করে নিয়ে যেতে পারবে। পাহাড়ি এলাকায় নজরদারির জন্য এই ড্রোনগুলি খুব দরকারি। উল্ফের মাথায় আরেকটা চিন্তা কাজ করছিল। পাহাড়ি এলাকা বা ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় ড্রোন ওড়ানোর জন্য রানওয়ে পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। তাঁর এমন ড্রোন বানানোর ইচ্ছা ছিল, যা রানওয়ে ছাড়াই উড়তে পারে। ২০০৮ সালে উল্ফ একটা কফি শপে বসে তার সহকর্মীদের সঙ্গে এই আলোচনাই করছিলেন। সেখানে বসেই একটা ন্যাপকিনের ওপর একটা নকশা এঁকে দেখালেন। এর কয়েক দিন পর তিনি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট বিভাগের প্রধানের সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিকল্পনার কথা শোনালেন। সব ধীরেসুস্থে শোনার পর বিভাগীয় প্রধান প্রাথমিকভাবে ৩০,০০০ মার্কিন ডলার অনুমোদন করলেন এই প্রোজেক্টের জন্য। সেই অর্থ জলে যায়নি। প্রায় দু' বছর পর আইএআই তৈরি করে ফেলল এমন এক ড্রোন, যা হেলিকপ্টারের মতো উল্লম্ব ভাবে টেক অফ ও ল্যান্ড করতে পারে এবং প্রায় ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় থেকে টার্গেটের ওপর নজরদারি করতে সক্ষম। এটা টানা ছ' ঘণ্টা আকাশে ভেসে থাকতে পারে। এর নাম দেওয়া হল 'প্যান্থার'। প্যান্থার এতটাই হালকা যে একজন সৈন্য খুব সহজেই এটাকে অভিযান চলাকালীন পিঠে করে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে। উল্ফ এক দিকে যেমন ছিলেন একজন সৈনিক, তেমনই তিনি একজন এরোস্পেস এঞ্জিনিয়ারও ছিলেন। এই দুইয়ের অভিজ্ঞতারই ফসল হল প্যান্থার।

ড্রোনের আবিষ্কার সবকিছু বদলে দিয়েছে। ১৯৮২ সালে ইসরায়েলে শুরু হয়েছিল 'লাভি' নামে এক প্রোজেক্ট, যার উদ্দেশ্য ছিল ফোর্থ জেনারেশনের মাল্টিরোল, একক

এঞ্জিনের এক ফাইটার জেট ডেভেলপ করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সহযোগিতায় চলছিল এই প্রোজেক্ট। কয়েকটি প্রোটোটাইপও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সমস্যা হল, এর খরচ পড়ে যাচ্ছিল আকাশছোঁয়া। ফলে ইসরায়েলি ক্যাবিনেট ১৯৮৭ সালে এই প্রোজেক্ট বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তখন এক প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

আইএআই-এর পক্ষে এই সিদ্ধান্ত এক কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। প্রশ্ন উঠল, এই প্রোজেক্টের কাজে নিযুক্ত কয়েকশো এঞ্জিনিয়ারকে এবার কোথায় নিয়োগ করা হবে?

তাদের নিজের নিজের দক্ষতা অনুযায়ী স্যাটেলাইট, মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম ও ড্রোনের প্রোজেক্টগুলোতে আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় ড্রোনই ছিল ইসরায়েলের বিকল্প শক্তি।

বলা বাহুল্য, ড্রোনের আবিষ্কার আধুনিক যুদ্ধের পরিভাষাটাই পালটে দিয়েছে। টার্গেটের সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে ড্রোনের কোনো বিকল্প নেই। কারো জীবন ঝুঁকির মধ্যে না ফেলে ড্রোনের মাধ্যমে অনেক অসম্ভব কাজও করা সম্ভব হয়েছে। ড্রোন হাতে থাকাতে ইসরায়েল শত্রুর চেয়ে ঢের বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু আত্মতুষ্টিতে ভোগার মতো সময় বা সুযোগ ইসরায়েল কখনোই পায়নি। ২০০৬ সালের ১২ জুলাই। ইরানের মদতপুষ্ট হিজবুল্লাহ জঙ্গিরা ইসরায়েলে ঢুকে আইডিএফ-এর দুজন সৈন্যকে অপহরণ করে। ইসরায়েলও জবাবি হামলা চালায়। শুরু হয় দ্বিতীয় লেবানন যুদ্ধ। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ইসরায়েলি সেনা হিজবুল্লা জঙ্গিদের শুরুতেই কোণঠাসা করে দেয়। জঙ্গিরা সাদা পোশাকে থাকত এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে যেত। এর ফলে তাদের শনাক্ত করা কঠিন হয়ে ওঠে। এভাবেই যুদ্ধ চলতে থাকল। এর মধ্যে ১২১ জন ইসরায়েলি সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে। ইসরায়েলি সেনা হিজবুল্লাহকে খুব হালকাভাবেই নিয়েছিল। এবার হিজবুল্লাহ বেশ তৈরি হয়েই যুদ্ধে নেমেছিল। লাগাতার ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানের আক্রমণের মাঝেও তারা দিনে গড়ে ১২০টা রকেট নিক্ষেপ করছিল। তারা ইসরায়েলি রেডিও সিস্টেম এবং সীমান্ত এলাকার সেলুলার নেটওয়ার্ক হ্যাক করেছিল। ইসরায়েলের জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। যুদ্ধ তখন শেষের দিকে। ইসরায়েলের আকাশে হিজবুল্লা ৩টে ইরানি ড্রোন দিয়ে হামলা চালাল। ড্রোনগুলোতে ২০ পাউন্ডেরও বেশি বিস্ফোরক বহন করছিল। টার্গেটে পৌঁছানোর আগেই এদের মধ্যে দুটো ড্রোন ক্র্যাশ করে আর একটা ড্রোন ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান গুলি করে নীচে নামায়। এই ঘটনা ইজরায়েল প্রশাসনকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। যে দেশ ড্রোন আবিষ্কার করল, তার ওপরই ড্রোন-হামলা চালাল এক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন! বিশ্বের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম।

২০১২ সালে আবার একটা ড্রোন ইসরায়েলের ভেতরে প্রবেশ করে। ড্রোনটি ডিমোনা শহরের থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে ছিল। ডিমোনা, এখানে ইসরায়েলের নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর রয়েছে। লক্ষ্যে পৌঁছনোর আগে এটাকেও গুলি করে নামানো হয়। ২০১৪ সালে গাজা স্ট্রিপ থেকে হামাস জঙ্গিরা নাশকতার লক্ষ্যে ইসরায়েলে ড্রোন পাঠাতে শুরু করে। ইসরায়েলের নিজের তৈরি অস্ত্রেই এবার নিজের বিপদ তৈরি হল। হিজবুল্লাহ ইসরায়েলে ড্রোন পাঠানোর আগে আইডিএফ-এর ধারণা ছিল যে, এই অঞ্চলে ইসরায়েল ছাড়া আর কারো কাছে ড্রোন নেই। আর ইরানের কাছে যদিও বা এক দুটো ড্রোন থেকেও থাকে, তাহলে সেটা ইসরায়েলের ড্রোনের থেকে কয়েক প্রজন্ম পিছিয়ে এবং সেটা ইজরায়েল পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না। এর জন্য তারা ইসরায়েলি রাডারে ড্রোন শনাক্ত করার কোনো ব্যবস্থাই রাখেনি। কিন্তু এই ঘটনার পর ইসরায়েল নতুন রাডার বানাতে শুরু করে ও পুরোনো রাডারগুলিকে প্রতিস্থাপন করতে শুরু করে।

আরেকটা কাজ ইসরায়েল গোপনে গোপনে করছিল। তা হল হিজবুল্লাহ পার্টিতে ড্রোন নিয়ে যারা কাজ করছে তাদের ওপর নজর রাখা। হাসান আল- লাক্কিস ছিল হিজবুল্লাহর ড্রোন বিভাগের কমান্ডার ইন চার্জ। ২০১৩ সালে লেবাননের রাজধানী বেইরুটে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। লেবাননের রিপোর্ট মোতাবেক দুজন গুপ্তঘাতক পর্যটকের ছদ্মবেশে আল-লাক্কির গাড়ির কাছাকাছি গিয়ে সাইলেন্সার লাগানো বন্দুক দিয়ে তাকে গুলি করে। হিজবুল্লাহ ইসরায়েলকেই এর জন্য দায়ী ঘোষণা করে। কিন্তু ইসরায়েলের তরফ থেকে এই ঘটনার দায় স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটাই করা হয়নি। কিন্তু হিজবুল্লাহ যাতে কোনোভাবেই ড্রোন ব্যবহার না করতে পারে সেজন্য ইজরায়েল সদা সচেষ্ট এটা নিশ্চিত।

উগ্রপন্থী সংগঠনের হাতে ড্রোন সত্যিই মারাত্মক! সাধারণ রাডারে এর উপস্থিতি ধরা পড়ে না। যদি কোনো দেশের ড্রোন অন্য দেশের ভেতরে প্রবেশ করে তাহলে কি তাকে ফাইটার জেট বা মিসাইল স্ট্রাইকের গোত্রে ফেলা হবে?

২০১২ সালে যখন হিজবুল্লাহ ড্রোন উড়িয়ে ডিমোনার কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল, তখন ইসরায়েল এই ঘটনা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। কোনো দেশের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে যায়নি তারা। কিন্তু যদি কখনো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে শত্রুরা একটা সফল ড্রোন স্ট্রাইক করে ফেলতে পারে, তবে কি ইসরায়েল সেই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে?

সেটা অবশ্য সময়ই বলবে।

ইসরায়েলে গোটা বছরে যতগুলো আকাশযান-উড়ান হয় তার অর্ধেকটাই হল ড্রোনের উড়ান। এর থেকে একটা ধারণা পাওয়া যায় ইসরায়েল ড্রোনের

ব্যবহারকে কোন পর্যায়ে নিয়ে গেছে। পরের কয়েক বছরের মধ্যে পুরোনো এফ-১৫ আর এফ-১৬ বিমানগুলোর জায়গা নেবে ড্রোন। শীঘ্রই শুধু ড্রোনেরই একটা বাহিনী তৈরি করা হবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো মানুষই নেবে। রোবটের মতো ড্রোনকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি যে!

আমরা ভুলিনি, ক্ষমাও করিনি

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২। সকাল ৫:৩০। ইসরায়েলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর শয়নকক্ষের দরজায় কেউ নক করল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন লেডি মেয়ার।

এত সকালে আবার কে এল? মন কু গাইছিল। না জানি কোন খারাপ খবর শুনতে হবে! এমনিতেই দেশের শত্রুর অভাব নেই।

খুব একটা ভুল ভাবেননি গোল্ডা মেয়ার। একজন প্রধানমন্ত্রীকে অমন কাকভোরে দরজায় নক করে ঘুম ভাঙানোর ঘটনা কেবল ইসরায়েল কেন অন্য যে কোনো রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই কত বার ঘটেছে কে জানে? সত্যিই কি খুব খারাপ কিছুর ইঙ্গিত?

বিছানা ছাড়লেন প্রধানমন্ত্রী। দরজার বাইরে থাকা ব্যক্তির উদ্দেশে বললেন, 'দাঁড়াও, যাচ্ছি!' তারপর তিনি কাঁপা কাঁপা হাতে দরজা খুললেন। মুখে আর কোনো প্রশ্ন করতে হল না এবং খবরও এল প্রত্যাশিত রূপে। খারাপ খবর!

কী ছিল সেই সংবাদ?

জার্মানির মিউনিখ শহরে অলিম্পিকস গেমসে অংশগ্রহণকারী ইসরায়েলি খেলোয়াড়দের বন্ধক হিসাবে আটকে রেখে দিয়েছে কয়েক জন সন্ত্রাসবাদী।

'ওরা কারা? কী চাইছে?' বললেন গোল্ডা মেয়ার।

'জানা নেই ম্যাডাম। হতে পারে ওরা পিএলও-এর লোক। এই অপারেশনটার নাম শোনা যাচ্ছে ইকরিৎ অ্যান্ড বিরাম।'

'কোনো ড্যামেজ?'

সামনের মানুষটা চোখ নামিয়ে নেয়। উত্তর দেয় না।

বুকের ভেতরে ধড়াস করে উঠল মমতাময়ী মেয়ারের। উনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'টেল মি, ইফ এনি।'

'ম্যাডাম, এর মধ্যেই ওরা ৩ জন খেলোয়াড়কে মেরে দিয়েছে।'

নিজের দুই হাত বুকের কাছে এনে প্রার্থনার ভঙ্গীতে রেখে চোখ বুজে ফেললেন মেয়ার। তারপর জানতে চাইলেন, 'এখনও ক'জনকে ওরা হোস্টেজ করে রেখেছে?'

'ন' জন।'

ক্যাবিনেট মিটিং ডাকা হল তৎক্ষণাৎ। জার্মান গভর্নমেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক করল ইসরায়েল সরকার।

জানা গেল নতুন তথ্য— সন্ত্রাসবাদীরা ইসরায়েলের বিভিন্ন জেলে বন্দি হয়ে থাকা ২৩৪ জন উগ্রপন্থীর মুক্তি দাবি করছে। আর দাবি ছিল 'রেড আর্মি' নামক সংগঠনের দুই উগ্রবাদীকে জার্মানির জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হোক। এই উগ্রপন্থীদের প্রায় সবটাই ছিল প্যালেস্টাইনের ভিন্ন ভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সদস্য। এছাড়াও চাওয়া হল একটি

বিমান। সেই বিমানে করে সন্ত্রাসবাদীরা যে কোথায় যেতে পারে সে কথাও বোঝা সম্ভব হচ্ছিল না জার্মানদের।

গোল্ডা একজন অসামান্য বুদ্ধিমতী এবং বিচক্ষণ মহিলা ছিলেন। উনি পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে জার্মান সরকারের কাছে আপিল জানালেন যে, জার্মান গভর্নমেন্ট যেন ইসরায়েলের স্পেশ্যাল টিম সায়েরাত মটকলকে সেখানে গিয়ে অপারেশন চালানোর পারমিশন দেয়। এই টিম এ ধরনের অপারেশনের ব্যাপারে এক্সপার্ট।

কিন্তু রাজি হল না জার্মানরা। তাদের পক্ষ থেকে মেয়ারকে আশ্বাস দেওয়া হল, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা সবাইকে ছাড়িয়ে আনব এবং কোনো অপরাধীকে রেহাই দেওয়া হবে না।'

গোল্ডার মন শান্ত হল না। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করার মতো বন্দোবস্ত ও দেশে নেই। সাধারণ পুলিশের নাগালের বাইরের কাজ ছিল ওই রেসকিউ অপারেশন। জার্মানিতে এটাই ছিল প্রথম সন্ত্রাসবাদী হামলা। যে দেশে কাউন্টার টেররিজম বাহিনী নেই, তারা কীভাবে মোকাবিলা করবে তা সত্যিই প্রশ্ন উদ্রেককারী বিষয় ছিল।

ফলাফল?

যা ভয় করা হয়েছিল তা-ই ঘটল। জার্মান অথোরিটি মূর্খের মতো ডিল করার চেষ্টা করে অসফল হল এবং জার্মানির পদক্ষেপ আগে থেকেই অনুমান করতে পারা সন্ত্রাসবাদীর দল এক এক করে সকল ইসরায়েলি খেলোয়াড়কে হত্যা করল।

সবথেকে ভয়ানক বিষয় কী ছিল জানেন পাঠক? এই হত্যাকাণ্ডের সবটাই ওই নরপিশাচরা লাইভ টেলিকাস্ট করে দেখিয়েছিল। অভাবনীয় একটি ঘটনা!

ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হল ইসরায়েলে। দেশজুড়ে শোক, ক্ষোভ। নিজেদের দেশের মানুষকে এভাবে চোখের সামনে মরতে দেখে জনতা উন্মত্ত হয়ে উঠল। লাখ লাখ মানুষ পথে নামল। কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে গেল তেল আভিভের পথ। ফেস্টুন, পোস্টার, ব্যানারে লাল কালিতে লেখা কথাগুলো বলে দিচ্ছিল জনগণ কতখানি ক্ষুব্ধ হয়েছে। 'প্রতিশোধ চাই!' স্বর গুঞ্জরিত হতে শুরু করে দিল ইসরায়েলের আকাশে-বাতাসে।

শোকের আবহে ইসরায়েলের মাটিতে ফিরিয়ে আনা হল খেলোয়াড়দের শবদেহ। দেশের বড় বড় ব্যক্তিত্ব অন্তিম সংস্কারের স্থানে উপস্থিত হয়ে নিহতদের সম্মান জানালেন। কিন্তু সবাইকে অবাক করে একজন এলেন না।

কে বলুন তো?

দেশের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার।

কারণ কী ছিল?

গোল্ডা জানিয়েছিলেন যে তাঁর বোন মারা গেছেন। তাই তিনি উপস্থিত হতে অপারগ।

কিন্তু আসল ব্যাপার এটা ছিলই না। বাস্তবে গোল্ডা নিহত খেলোয়াড়দের

পরিবারবর্গের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ওঁদের পরিজনদের চোখে চোখ রেখে কথা বলবেন কীভাবে?

যে গোল্ডা মেয়ারকে সমগ্র বিশ্ব চেনে ‘আয়রন লেডি’ হিসাবে, সেই মেয়ার ভয় পাচ্ছিলেন। জাস্ট ইমাজিন!

মেয়ার এই ঘটনার পর থেকে রাতের পর রাত ঘুমোতে পারেননি। চোখের সামনে ভেসে উঠছিল নিহতদের মা, বোন, সন্তানদের মুখ।

এই সময়েই মোসাদের চিফ জ্বি জামির এবং ইসরায়েলের মিলিটারি ইনটেলিজেন্স চিফ এহরোন ইয়ারিভ মেয়ারের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেশ করলেন। আর সেটা দেখে চমকে উঠলেন আয়রন লেডি। উনি বললেন, ‘ইজ ইট সো?’

জামির উত্তরে বলেছিলেন, ‘ইয়েস ম্যাডাম!’

কী ছিল সেই রিপোর্টে?

পেশ করা তথ্য বলছিল এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল পিএলও গ্রুপ থেকে সদ্য তৈরি হওয়া একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন— ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর অর্গানাইজেশন।

ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর অর্গানাইজেশন! নৃশংসতার মূর্ত প্রতীক।

একবার বুঝে নেওয়া যাক এই বর্বর সংগঠনটির জন্মের ইতিহাস। ১৯৬৭ সাল। আরব লিগ-ইসরায়েলের যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। জর্ডনের কাছ থেকে ওয়েস্ট ব্যাংক ছিনিয়ে নিয়েছে ইসরায়েল। অসংখ্য ফিলিস্তিনি তখন বাস্তু হারিয়ে আশ্রয় নিল জর্ডনে। সেই সময়ে জর্ডনের শাসক ছিলেন কিং হুসেইন। তিনি ফিলিস্তিনিদের মুক্তি সংগ্রামকে শক্তি জোগালেন। ধীরে ধীরে ফিলিস্তিনিতে ভরে উঠতে লাগল জর্ডন। জর্ডনের পার্লামেন্টে প্রভাব বাড়াতে লাগল তারা। জর্ডনের নগরী আম্মান হয়ে উঠল ফিলিস্তিনিদের নয়া শক্তিকেন্দ্র।

ওদিকে ইসরায়েল আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। লক্ষ্য একটাই, ফিলিস্তিনি পিএলও-কে ধ্বংস করতে হবে। তারা আক্রমণ চালাল। আর এদিকে জর্ডন এবং পিএলও সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করল সেই আক্রমণ। এবারে গেম ড্র হয়ে গেল, দু’ পক্ষই দাবি করল তাদের জয় হয়েছে। আর এরপর থেকেই বদলাতে লাগল জর্ডনের রাজনৈতিক সমীকরণ। পিএলও-কে সাপোর্ট দিয়ে আসলে বাঘের পিঠে চড়ে বসেছিলেন কিং হুসেইন। বসে থাকতেও ভয় করে, আবার নামলেও বাঘের পেটে যাওয়ার ভয়। কট্টর ইসলামিক, জেহাদি মুখগুলো জর্ডনের শক্তি দখলের খেলায় নামল। তারা ফিলিস্তিনি আন্দোলনের জন্য ‘জেহাদ ট্যাক্স’ আদায় করতে শুরু করে দিয়েছিল। ছড়িয়ে পড়ছিল চরম অরাজকতা। একটা বিশৃঙ্খলা দিয়ে কখনো শৃঙ্খলাপরায়ণ পরিচালনা আশা করা যায় না। ক্রমশ বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিরা জর্ডনের রাজতন্ত্র নিয়েই প্রশ্ন তুলতে থাকে। তাদের স্লোগান ছিল— ‘জর্ডনের পথই তেল আভিভের পথ!’ অর্থাৎ জর্ডনের মসনদের দখল নেওয়ার মধ্যে দিয়েই ইসরায়েল দখলের চেষ্টার সূত্রপাত ঘটবে।

কিং হুসেইন পড়লেন সাংঘাতিক দোলাচলে। তিনি বুঝলেন, যদি কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে সেনাবাহিনী তাঁর প্রতি আস্থা হারাবে। সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। এমনিতেই দিনে দিনে বাড়ছিল কিডন্যাপিং, সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ, প্লেন ধ্বংস করে দেওয়ার মতো ঘটনা।

কিন্তু দোলাচলের কী ছিল?

হুসেইন ভয় পাচ্ছিলেন অন্য একটি কারণে, ফিলিস্তিনিদের ওপরে আক্রমণ করলে যদি মুসলিম দেশগুলো ক্ষেপে যায়! তাই তিনি আমেরিকার মাধ্যমে ইসরায়েলের কাছে সাহায্য চাইলেন। ইসরায়েল দেখল মুসলিম দেশগুলি আমাদের শত্রু এবং এক্ষেত্রে তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে লড়ে মরছে। তারা জর্ডনকে আশ্বাস দিল, সীমান্ত থেকে সেনা সরিয়ে নিয়ে আপনারা দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা মেটান, আমাদের তরফ থেকে কোনো হামলা করা হবে না।

১৯৭০ সালের পুরোভাগ থেকেই খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে জর্ডনের মাটিতে। একদিকে কিং হুসেইনের সেনা, অপর দিকে পিএলও-এর ফিদায়ে বাহিনী। কিং হুসেইনকে হত্যার একাধিক চেষ্টা করা হয়। তিনি প্রাণে বাঁচলেও একটি আক্রমণে তাঁর স্ত্রী নিহত হন। হুসেইন ঘোষণা করে দিলেন, ‘জর্ডন ইসরায়েলের বন্ধু। ফিদায়ে ইসরায়েলের উদ্দেশে রকেট ছোড়ায় জর্ডন দুঃখিত! ইসরায়েলকে নিশানা করে কাউকে আক্রমণ করতে দেখলেই শ্যুট অ্যাট সাইট অর্ডার দেওয়া হয়েছে।’

১৯৭০ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে ক্র্যাকডাউন। ট্যাঙ্ক নিয়ে আক্রমণ শুরু করে জর্ডনের বাহিনী। ভয়ানক প্রতিরোধের মুখে পড়ে পিছু হটতে থাকে ফিলিস্তিনি মিলিশিয়া। জর্ডন থেকে উচ্ছেদ করা হয় ফিলিস্তিনিদের, তারা লেবাননের দিকে সরে যায় এবং এখানে একটা অদ্ভুত তথ্য হল পাকিস্তানের তৎকালীন আর্মি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জিয়াউল হক জর্ডন আর্মিকে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। ইসরায়েল নিজের বায়ুসেনার শক্তি প্রদর্শন দ্বারা নিজের সমর্থন বুঝিয়ে দিয়েছিল। হাজার হাজার ফিলিস্তিনি মিলিট্যান্ট মারা পড়ল। তারা হারও মানল। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এই ক্র্যাকডাউন ইতিহাসে ‘ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর’ নামে কুখ্যাত।

আর এই ঐতিহাসিক ঘটনার পর পিএলও-এর মধ্যে থেকেই একটা শাখা জন্ম নিল, যার নাম ‘ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর অর্গানাইজেশন’। কেউ কেউ একটা দ্বিমত পোষণ করে বলেন, সরাসরি পিএলও থেকে নয় বরং ইয়াসের আরাফাতের ‘ফাতাহ্’ নামক জঙ্গি সংগঠনের ‘বি টিম’ ছিল ‘ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর অর্গানাইজেশন’ বা ‘বিএসও’।

ইতিহাসটা খতিয়ে দেখার পর ফিরে আসা যাক ইসরায়েল এবং বিএসও-এর টম অ্যান্ড জেরি খেলায়।

আমরা ঠিক কোথায় ছিলাম যেন?

ও হ্যাঁ, গোল্ডা মেয়ার জানতে পারলেন যে, মিউনিখ ম্যাসাকারের পিছনে বিএসও-এর হাত আছে।

মেয়ার জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এই বিএসও-ই কি জর্ডনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওয়াসফি টালকে হত্যা করেছিল?’

মোসাদ চিফ বললেন, ‘ইয়েস ম্যাম, দ্যাট ভেরি বিএসও!’

মেয়ার বললেন, ‘সবই বুঝলাম। আমি মিউনিখ ম্যাসাকারের শোধ নিতে চাই। আমার এই পদ আমার দেশের মানুষের কাছে ঈশ্বরতুল্য। তারা আমার কাছে বিচার চাইছে। ঘুমের ওষুধ খেয়েও দু’ চোখের পাতা এক করতে পারছি না আমি। প্রতিশোধ নিন!’

জামির জানালেন, ‘এত দিনে বিএসও-এর মেম্বাররা বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ আন্ডারকভার হিসাবে কাজ করছে। এদের ধরা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। আমরা পারব। শুধু আপনার সম্মতি চাই।’

গোল্ডা চোখ বুজে সামান্য ভাবলেন। তারপর কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে মোসাদ চিফকে নির্দেশ দিলেন, ‘সেন্ড ইয়োর বয়েজ!’

এই অপারেশনের নাম দেওয়া হল ‘র‍্যাথ অব গড’ অর্থাৎ, ‘ঈশ্বরের প্রকোপ’। আর দায়িত্ব দেওয়া হল মোসাদের কিডন টিমের মাইক হারারিকে। একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হল— ‘কমিটি এক্স’। চার জন সদস্যের কমিটি— গোল্ডা মেয়ার, জ্বি জামির, এহরোন ইয়ারিভ এবং ইসরায়েলের তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোশে দয়ান।

একেবারে পরিকল্পনা করে এক একজনকে টার্গেট করা হল। একটি হত্যার জন্য তিনটি ইউনিট ফিক্স করল কমিটি।

বলা হল, প্রথম ইউনিটে ছ’ জন সদস্য থাকবে। তাদের কাজ কী হবে? টার্গেটকে অন্তিমবার যে জায়গায় দেখা গেছে সেখানে গিয়ে পৌঁছানো। তারপর তাকে ফলো করে এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে, সে-ই ওই ব্যক্তি যাকে মোসাদ খুঁজছে। টার্গেটকে দিনরাত অনুসরণ করে তার ছবি তোলা হবে, সে কোথায় যায়, কার সঙ্গে মেশে, কারা তার বন্ধু, কোন বারে গিয়ে মদ খায়, কোন রেস্তোরাঁ তার প্রিয়— এসবের একটা লিস্ট বানানো দরকার। তারপর এসব তথ্য চলে যাবে মোসাদ হেডকোয়ার্টার্সে। এসবের ভিত্তিতেই মোসাদ সিদ্ধান্ত নেবে যে, টার্গেটকে প্রাণে মারা হবে নাকি হবে না।

দ্বিতীয় ইউনিটে থাকবে মাত্র দুজন লোক। তাদের কাজ হবে অপারেশন যে শহরে হবে, সেখানে গাড়ির বন্দোবস্ত করা, বাড়ি ভাড়া নেওয়া, হোটেল বুকিং করা, জাল আইডি প্রুফ ইত্যাদির অ্যারেঞ্জমেন্ট।

তিন থেকে চার জন লোক নিয়ে তৈরি হবে একটা কমিউনিকেশন ইউনিট বা থার্ড ইউনিট। এদের কাজ হবে অপারেশনের জায়গা থেকে মোসাদের তেল আভিভের হেড কোয়ার্টার্সে যোগাযোগের পুরো ব্যাপারটা দেখা।

ফার্স্ট ইউনিট অপারেশনের এক-দু’ সপ্তাহ আগে সেই দেশ ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। তারপর সেকেন্ড ইউনিট ক্লিনিং-এর কাজ করবে। মানে, ওই শহরে মোসাদের উপস্থিতির সমস্ত প্রমাণ লোপাট করাই হবে তাদের কাজ এবং এই সব কিছু ঠিকঠাক চললে অপারেশনের জন্য নির্ধারিত দিনের এক থেকে দু’ দিন আগে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে কিডন টিম। তারাও কাজ সেরে দু-চার ঘণ্টার মধ্যে দেশ থেকে বেরিয়ে আসবে।

এত কিছুর পরিকল্পনা করা হলেও ভিন দেশে গিয়ে অপারেশন চালানো যথেষ্ট কঠিন কাজ। তার ওপরে বিএসও এক নৃশংস সংগঠন। এদের বর্বরতার একটা ছোট্ট ঘটনা বলি বন্ধুরা, জর্ডনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওয়াসফি টালকে হত্যা করার পর যখন তাঁর দেহ থেকে রক্ত গড়িয়ে মেঝেতে পড়েছিল, তখন একজন হত্যাকারী সেই রক্ত জিভ দিয়ে চেটেছিল। অনুমান করুন ব্যাপারটা।

সব রকমের ঝুঁকি নিয়েই আরম্ভ হয়ে গেল অপারেশন র‍্যাথ অব গড। প্রথম অপারেশন পয়েন্ট হিসাবে বেছে নেওয়া হল রোম শহরকে। টার্গেটের নাম ওয়াএল জোয়াইটার। সে রোমে লিবিয়ান দূতাবাসে অনুবাদকের কাজ করত। পারদর্শী অনুবাদক।

তার পরিচিতবর্গের মধ্যে তার যা ভাবমূর্তি ছিল, তাতে সে সন্ত্রাসবাদী হতে পারে এ কথা কেউ বিশ্বাস করত না। বছর আটত্রিশের এই ফিলিস্তিনির আচার-আচরণও ছিল দারুণ নম্র, ভদ্র।

জোয়াইটার একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে থাকত। একদম সরল জীবনযাপন। মাসিক ১০০ লিবিয়ান দিনারে এমন বেশবাসই কাম্য। বন্ধুমহলে সে শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি বলেই পরিচিত ছিল। সকলেই জানতে যে, জোয়াইটার সন্ত্রাস, হিংসা ইত্যাদিকে ঘৃণা করে।

কিন্তু যে কথাটা কেউ জানত না তা হল এই আপাতনিরীহ দর্শন জোয়াইটার সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বিএসও-এর আন্ডারকভার এজেন্ট হিসাবে রোমে কাজ করছিল।

জোয়াইটারের কাজের একটা ছোট নমুনা দেখা যাক। সে রোমে ঘুরতে আসা দুই ব্রিটিশ তরুণীকে বোকা বানিয়ে একটি স্যুইস বিমানে বিস্ফোরণের ছক কষে। প্রথমে সে দুজন সুদর্শন ফিলিস্তিনি যুবকের প্রেমে ওই দুই তরুণীকে ফাঁসায়। তাদের সম্পর্ক বিছানা অবধি গড়ায়। ওই দুই ব্রিটিশ তরুণীকে এবার বলা হয় ইসরায়েলে পরিচিত এক মহিলার হাতে একটি টেপ রেকর্ডার পৌঁছে দিতে হবে। আসলে ওই টেপ রেকর্ডারের মধ্যে বোমা ছিল এবং সেখানে এমন একটি প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছিল যে, প্লেন একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছালেই ব্লাস্ট ঘটবে।

কিন্তু ধরা পড়ে গেল ওই দুই তরুণী এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পর সব সন্দেহের তির লক্ষ্য করতে থাকল রোমের এক সুদর্শন ফিলিস্তিনি যুবক, জোয়াইটারকে

মোসাদ এই সূত্রকে কাজে লাগাল। রোমে অবস্থিত লিবিয়ান এমব্যাসির বাইরে এরপর ঘন ঘন দেখা যেতে লাগল এক প্রেমিক যুগলকে। তারা সারাদিন ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একে অপরের ছবি তুলছিল। আসলে তারা একে অপরের ছবি তোলার নাটক করছিল মাত্র, ছবি তোলা হচ্ছিল জোয়াইটারের। জোয়াইটার যখনই এমব্যাসিতে ঢুকত বা বেরোত, তখনই তার ছবি তুলে নেওয়া হত।

ইতিমধ্যে ইসরায়েল থেকে মোসাদের আরও কিছু নতুন মুখ ট্যুরিস্ট হিসাবে এসে ভিড় করল রোমে। রোমে এসে হোটেল, গাড়ি সব ভাড়া নিল। ১৯৭২ সালের ১৬ অক্টোবর শুরু হয়ে গেল তাদের অ্যাকশন। সারাদিনের কাজ শেষ করে জোয়াইটার নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল। লিফট ইউজ করতে গেলে একটা নির্দিষ্ট স্লটে কয়েন ফেলতে হয়। রোজদিনের মতো সেই কাজটাই করল সে। সে খেয়াল করেনি অ্যাপার্টমেন্টের প্রবেশপথের মুখটা অন্য দিনের তুলনায় একটু বেশিই অন্ধকার। থার্ড ফ্লোর থেকে পিয়ানোর বিষাদ সুর ভেসে আসছিল। আর তখনই অন্ধকার থেকে দুজন আততায়ী বেরিয়ে এসে নিজেদের ব্যারেটা পিস্তল থেকে পর পর ১২টা গুলি দেগে দেয় জোয়াইটারের বুকে। কিন্তু সাইলেন্সার থাকায় কোনো শব্দ হল না, কেউ টের পেল না। নিজেদের অপারেশন সেরে তারা পাশেই পার্কিংয়ে রাখা একটা গড়িতে উঠে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফেরার হয়ে গেল রোম থেকেও। অপারেশন সাকসেসফুল!

নেক্সট স্টপ প্যারিস। ১৭৫ রুয়ে অ্যালেশিয়া স্ট্রিট। এই ঠিকানাতেই থাকে টার্গেট। টার্গেটের অ্যাপার্টমেন্টে ফোন বাজছিল। সে নিজেই গিয়ে রিসিভার তুলে নিল। ফোনের অন্য দিকে থাকা ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ‘ডক্টর মাহমুদ হামশারি?’

উত্তর গেল, ‘ইয়েস, স্পিকিং... ‘

ওদিক থেকে আর কোনো কথা ভেসে এল না। এদিকে হামশারি বললেন, 'হ্যালো, হ্যালো...

প্রবল একটা বিস্ফোরণ ঘটল হামশারির ঘরে।

একবার দেখে নেওয়া যাক কে এই হামশারি। প্যারিসে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হামশারি বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ পরিচিত মুখ ছিল। হামশারি ছিল পিএলও-এর প্রতিনিধি। ফরাসি মিডিয়াতে হামশারির ইমেজ বেশ সাফ ছিল। কিন্তু যে খবরগুলো কেউ জানত না, সেগুলোই জানত মোসাদ। হামশারি বেন- গুরিয়নকে গুপ্তহত্যার একটা ফেইলড অ্যাটেম্পটের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৯৭০ সালে একটি স্যুইস বিমানের বিস্ফোরণে ধ্বংস হওয়ার ঘটনাতেও হামশারির যোগ পাওয়া যায়।

খুব সুপরিকল্পিত ছকে ফেলে হামশারির অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করে মোসাদ টিম। একজন সদস্য এক ইতালিয়ান সাংবাদিকের ছদ্মবেশে তার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য তাকে একটি কাফেতে দেখা করতে বলে। হামশারি নিজের বাড়ি থেকে বেরোনো মাত্রই তার অ্যাপার্টমেন্টে টেলিফোনে একটি বিশেষ বোমা লাগানো হয়। পনেরো মিনিটের মধ্যে কাজ সেরে বেরিয়ে মোসাদের টিম। আর তার পরদিনই টার্গেটের নাম জিজ্ঞাসা করে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট সিগন্যালের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটানো হয় ওই টেলিফোনে। ব্লাস্টে হামশারির একটা পা উড়ে যায়। ভয়ানক আহত হামশারি রক্তক্ষরণে মারা যায়।

এভাবেই চলতে থাকে অপারেশন র‍্যাথ অব গড। ইসরায়েলে সরকার বদলেছে, প্রাইম মিনিস্টার পালটেছে, এসেছে নতুন মোসাদ চিফ কিন্তু ঈশ্বরের প্রকোপ থামেনি। এই অপারেশনের কয়েকটা নতুন দিক ছিল। যেমন ইসরায়েল এর আগে বা পরে যত অপারেশন করেছে তার খবর স্বীকারই করতে চাইত না। কিন্তু এক্ষেত্রে ইসরায়েল বুক ঠুকে স্বীকার করেছে। দুনিয়া জানুক এটাই চাইত ইসরায়েল। আসলে তারা বোঝাতে চাইছিল আমাদের দিকে ইট ছুড়লে, আমরা পাথর ছুড়ে তার জবাব দেব। এমনকী এই অপারেশনের প্রতিটা টার্গেটেড অ্যাসাসিনেশনের কয়েক ঘণ্টা আগে মোসাদ টার্গেটের পরিবারবর্গের কাছে ফুল আর সমবেদনাপত্র পাঠাত, যাতে লেখা থাকত— আ রিমাইন্ডার উই ডু নট ফরগেট অর ফরগিভ', আমরা ভুলিনি, ক্ষমাও করিনি।

আর ইসরায়েল ক্ষমা করে না বলেই ছাড় পায়নি আবদ আল-হির। আবদ আল-হির ছিল সাইপ্রাসে বিএসও-এর মাথা। সোভিয়েত ইউনিয়নে সন্ত্রাসবাদীদের নেটওয়ার্ক চালানোটাও ছিল হিরের দায়িত্ব। হিরের নামে রেড পেপার জারি করল মোসাদ। আর মোসাদ তাকে হত্যার অপারেশন চালানোর আগে সাহায্য নিল রাশিয়ান কেজিবি-এর।

১৯৭৩ সালের ২৪ জানুয়ারি। সোমবার। সকাল আটটার সময় নিজের হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল হির। তাকে গাড়িতে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের একজন ছিল কেজিবি এজেন্ট। অপরজনকে দেখতে রাশিয়ানদের মতোই লাগছিল, তবে পরিচয় অজানাই রয়ে গেছে। এটুকু নিশ্চিত ছিল যে, সেই ব্যক্তি আরব বা সাইপ্রিয়ট নয়। হিরকে সারাদিন তার হোটেল থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটি জায়গায় ব্যস্ত রাখার প্লট সফল হয়। আর ততক্ষণে কাজ সারা হয়ে গিয়েছিল। হিরের পাশের ঘরেই হানিমুনে আসা দুই ইসরায়েলি টুরিস্ট নিজেদের আসল রূপ ধারণ করল। হোটেলের ক্লিনিং স্টাফ কাজ সেরে যাওয়ার পরই হিরের ঘরে ঢুকে পড়ে দুই এজেন্ট। পূর্ব-পরিকল্পিত ভাবে একটা বোমা প্লান্ট করা হয় হিরের শয্যার ম্যাট্রেসের স্প্রিং-এর নীচে। রিমোট কন্ট্রোলড প্রেসার বম্ব। একবার শোওয়ার পর বোমা ফাংশনাল হয়ে গেলে বিছানা ত্যাগ করতে গেলে মৃত্যু অবধারিত। তারপর কেবল বেড ল্যাম্পটাকে ঠিক রেখে ঘরের সমস্ত লাইটের কানেকশন খারাপ করে দেওয়া হয়।

ঠিক সময়ে হিরকে হোটেলে ফিরিয়ে আনা হয়। হিরের পাশের ঘরের দুই এজেন্ট তখন হোটেলের বাইরে একটা গাড়িতে অপেক্ষারত। সময় আন্দাজ করে তাদের মধ্যে অ্যাভনের নামে এক এজেন্ট রিমোটের বাটন প্রেস করে। কিন্তু কিছু হয় না। সে অনুমান করে যে, সম্ভবত এখনও বোমার ওপরে শোয়নি হির। হয়তো বিছানার একধারে বসে মোজা খুলছে। খানিক পরে আবার বাটন প্রেস করে আবারও কিছু হয় না। ধৈর্য হারাতে থাকে সে ও তার হিট টিম। আবার রিমোটের বোতাম টেপে। আর এবার একটা সাংঘাতিক বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে হোটেল চত্বর। হির নিহত হয়।

ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর অর্গানাইজেশনও যে ঘাসে মুখ দিয়ে চলছিল না। তারা বুঝে গিয়েছিল যে ইসরায়েল তথা মোসাদ তাদের পিছনে উঠে-পড়ে লেগেছে। তারাও পালটা আঘাত করার জন্য প্রস্তুত থাকল, আর সময় ও সুযোগ পেতেই প্রত্যাঘাতও হানল।

২৬ জানুয়ারি, ১৯৭৩। মোশে হানান ইশায়ি নামে একজন ইসরায়েলি যুবক মাদ্রিদের একটা পাবে নিজের বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দেখাসাক্ষাৎ হল, ছেলেটি পাব থেকে বেরিয়েও এল। আর তখনই তার সামনে এসে দাঁড়াল দুজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি। ইশায়ির সঙ্গে থাকা বন্ধুটি ছুটে পালাল। আর সঙ্গে সঙ্গে আগত ওই দুই ব্যক্তি ইশায়িকে লক্ষ্য করে কয়েকটা বুলেট দেগে দিল। মুহূর্তে নিহত হল ইশায়ি।

মিডিয়া রিপোর্টের কল্যাণে এই গল্পটা সবার জানা। যে কথাটা চমকে দেওয়ার মতো তা হল ইশায়ির আসল নাম ছিল বারুচ কোহেন। সে মোসাদের একজন এজেন্ট ছিল। মাদ্রিদের ফিলিস্তিনিদের মধ্যে তার বিশেষ পরিচিতি গড়ে উঠেছিল। তার কাজ ছিল সেখান থেকে খবর সংগ্রহ করা। যে বন্ধুর সঙ্গে সে পাবে দেখা করতে এসেছিল, সে আসলে একজন ফিলিস্তিনি এবং সে-ই কোহেনকে খবর দিত। কিন্তু সেই বন্ধুই ডাবলক্রস করেছিল কোহেনের সঙ্গে। আর ফলাফল সামনে পড়েছিল— কোহেনের লাশ হয়ে। টম অ্যান্ড জেরির লুকোচুরিতে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর অর্গানাইজেশন মোসাদকে এক দানে মাত দিল। তারা হিরকে হত্যার প্রতিশোধ নিল আসলে।

এর পরপরই য়াদক অফির নামক এক মোসাদ এজেন্টকে ব্রাসেলসের একটা কাফেতে হত্যা করে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর অর্গানাইজেশন। একটা লেটার বম্বের মাধ্যমে হত্যা করা হয় লন্ডনের ইসরায়েলি দূতাবাসের অ্যাটাশে ডক্টর আমিকেও।

ইসরায়েলের চালে ভুল হচ্ছিল। আর নিজেদের ভুল ঠিক করার ব্যাপারে তাদের জুড়ি মেলা ভার। অ্যাটাক ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স— এই নীতিটাই মানে তারা। হিরের উত্তরসূরী হিসাবে সাইপ্রাসে নিযুক্ত এজেন্টকে হত্যা করে তারা শোধ তুলল এবং সেটাও সেই এজেন্টের নিয়োগের মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে করা হয়েছিল।

এরপর বিএসও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আরাফাত কখনোই বিএসও-এর সঙ্গে নিজের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সামনে না আনলেও তাঁর হয়ে অপারেট করত আলি হাসান সালামেহ। এই সালামেহই ছিল মিউনিখ ম্যাসাকারের মাস্টারমাইন্ড। আসব তার কথায়।

আগে চিনে নেওয়া যাক কে এই সালামেহ?

আলি হাসান সালামেহ ছিল ফিলিস্তিনের ফোর্স ১৭-এর প্রধান মুখ। আরাফাতের ডান হাত। সালামেহকে নিয়ে কিছু এমন কথা চলত যা তার জীবদ্দশাতেই তাঁকে কিংবদন্তীতে পরিণত করেছিল। তার জীবনযাত্রা দেখলে আজকের বিজয় মাল্যরাও লজ্জা পেয়ে যাবেন

আর কি! এমনই রঙিন ছিল প্লে- বয় সালামেহর জীবন।

সালামেহ ধনী পরিবারের সন্তান ছিল। তার পিতার নাম ছিল শায়েখ হাসান সালামেহ এবং শায়েখ হাসান সালামেহ ছিল ১৯৪৮ সালে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত একজন ফিলিস্তিনি সৈনিক। সুতরাং ইহুদি-বিদ্বেষটা ছিল তার রক্তে।

একের পর এক চাল ভেস্তে যাওয়া, নিজেদের সংগঠনের লোকের মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ আরাফাত এবং সালামেহ একটা বড় ধরনের প্রতিশোধের পরিকল্পনা করছিল। একটি হাইজ্যাকড বিমানকে বিস্ফোরকে বোঝাই করে তেল আভিভে নিয়ে গিয়ে ফেলার ছক কষে সালামেহ। দরকার ছিল একজন আত্মঘাতী পাইলটের। এটা ৯/১১-এরও অনেক আগের ঘটনা।

এই সময় প্যারিসের মোসাদ এজেন্টদের কাছে এক ব্যক্তির গতিবিধি বেশ সন্দেহজনক ঠেকে। সেই লোকের ফটো মোসাদ হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়। নাম— বসিল আল-খুবায়শি। পেশায় আইনজীবি তথা বেইরুটে আমেরিকান ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। সুতরাং, মান্যগণ্য ব্যক্তি। মান্যগণ্য হলে হবেটা কী, জোয়াইটার ও হামশারির মতো ইনিও একজন বিপজ্জনক মানুষ। অন্তত তার রেকর্ড তো তাই বলছিল। বিএসও-এর একজন প্রবীণ সদস্য।

১৯৫৬ সালে খুবায়শি ইরাকের শাসক কিং ফয়জলকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার কনভয়ের পথে বোমা রেখেছিল। কিন্তু বোমাটা আগেই ফেটে যাওয়ায় তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। খুবায়শি লেবানন হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পালায়।

খুবায়শি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ারকে দু' বার হত্যার চেষ্টা করে। একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেয়ারের সফরের সময় এবং পরের বার প্যারিসে। দু' বারই ব্যর্থ হয় তার প্রয়াস।

খুবায়শি এরপরে 'পপুলার ফ্রন্ট ফর লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইন' বা পপুলার ফ্রন্টে যোগ দেয়, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিল জর্জ হাবাশ। এটা ছিল পিএলও- এরই একটা অংশ। ১৯৭২ সালের লড এয়ারপোর্টে আরব ও জাপানি সন্ত্রাসবাদীদের হামলাতেও তার হাত ছিল। ২৬ জন মারা গিয়েছিল সেদিন 1 এরপর খুবায়শি ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর গ্রুপে যোগ দেয়।

এ হেন আল খুবায়শিকে প্যারিসে দেখার পরই সন্দেহ হয় নিশ্চয়ই সে আত্মঘাতী হামলার ছক কষছে। ওই সময়ে খুবায়শির ঠিকানা ছিল রুডি আরকেডসের ছোট্ট একটি হোটেল।

মোসাদ এজেন্টরাও তক্কে তক্কে ছিল। এপ্রিলের ৬ তারিখ, ১৯৭৩ সাল। খুবায়শি ক্যাফে ডি লা পে থেকে রাতের খাবার খেয়ে হেঁটে হোটেলে ফিরছিল। চার জন মোসাদ এজেন্ট অপেক্ষা করছিল গাড়িতে বসে। কুবায়েশিকে দেখতে পাওয়া মাত্র দুজন তার দিকে এগিয়ে যায়। বন্দুক তাক করাই ছিল। ঠিক তখনই আরেকটা গাড়ি আল-খুবায়শির পাশে এসে দাঁড়ায়। আর গাড়ির ভেতর থেকে এক সুন্দরী মহিলা খুবায়শির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন। এজেন্টরা কিছু করে ওঠার আগেই খুবায়শি সেই মহিলার সঙ্গে গাড়িতে উঠে চলে গেল। তারপর অবশ্য এজেন্টরা বুঝতে পারল যে, ওই মহিলা ছিল একজন প্রস্টিটিউট। শিকার হাতের কাছে এসেও ফস্কে যাওয়ায় এজেন্টদের হাত কামড়ানো ছাড়া অন্য কোনো উপায় তখন ছিল না।

মোসাদ টিমের লিডার নির্দেশ দিলেন, ‘অপেক্ষা করো, ও ব্যাটা তো কাজ সেরে আবার ফিরবেই।’ হলও তাই। প্রায় কুড়ি মিনিট পর গাড়িটাকে আবার ফিরতে দেখা গেল। খুবায়শি গাড়ি থেকে নেমে ওই সুন্দরীকে বিদায় জানিয়ে হাঁটা দিল হোটেলের পথে। আর ঠিক তখনই অন্ধকার থেকে দুজন লোক তার পথ আগলে দাঁড়াল।

খুবায়শিও এক জিনিস! সে ততক্ষণে আঁচ করে ফেলেছে যে, কী হতে চলেছে। উত্তেজিত হয়ে সে চিৎকার করতে শুরু করল, ‘না, না... আমাকে মেরো না!’

ন’টা বুলেট তার শরীরে বিদ্ধ করে মোসাদ এজেন্টরা সেখান থেকে বিদায় নিল।

সালামেহর কেশাগ্রও তখন স্পর্শ করতে পারেনি মোসাদ। সে ছিল বেইরুট হেডকোয়ার্টারে। সেখানে বসেই সালামেহ চুপচাপ কাজ চালাচ্ছিল। তার নির্দেশে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের টিম থাইল্যান্ডে ইসরায়েলি এমব্যাসি কবজা করে। কিন্তু থাই প্রশাসন ও মিশরীয় রাষ্ট্রদূতের চাপে তাদেরকে পিছু হটতে হয়।

কিন্তু দমে না সালামেহ। তারপরের অপারেশনটা আরও মারাত্মক আকার নিয়ে সামনে এল। সুদানের রাজধানী খার্তুমে তারা সৌদি এমব্যাসিতে হামলা চালায়। সেখানে তখন একজন ইউরোপিয়ান দূতের ফেয়ারওয়েল পার্টি চলছিল। ইউএস রাষ্ট্রদূত, ইউএস মিশনের ডেপুটি চিফ এবং বেলজিয়ামের অ্যাম্বাসডরকে নির্মমভাবে হত্যা করে সালামেহরা। আততায়ীদের গ্রেপ্তার করা হয় বটে কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তাদের ছেড়েও দেয় সুদানের সরকার।

আর নয়! ইসরায়েল এবার ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর অর্গানাইজেশনকে খতম করার জন্য উঠে-পড়ে লাগল। নতুন করে বর্ষিত হল ঈশ্বরের প্রকোপ। একটা নতুন নামও উঠে এল—‘অপারেশন স্প্রিং অফ ইয়ুথ’।

এপ্রিলের প্রথমেই বেইরুটে বিভিন্ন দিক থেকে মোসাদ এজেন্টরা এসে পৌঁছতে থাকল। অবশ্যই পর্যটকের বেশে। মোট ছ’ জন। এজেন্টরা সবাই শহরের রাস্তাঘাট ঘুরে ঘুরে দেখে নিল।

৯ এপ্রিল, ১৯৭৩। ন’টা মিসাইল বোট ও পেট্রল ভেসেল ইসরায়েলের সমুদ্র থেকে আরও গভীর সমুদ্রের দিকে চলে গেল। এই বোটগুলিতে রয়েছে সেরি কম্যান্ডো সদস্যরা। তাদের কাছে রয়েছে চার জনের ছবি। প্রথম জন আবু য়ুসুফ, ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের সুপ্রিম কমান্ডার। দ্বিতীয় জন কামাল আদওয়ান, ফাতাহ্-এর টপ অপারেশন কমান্ডার। তৃতীয় জন ফাতাহ মূল মুখপাত্র। আর চতুর্থ ব্যক্তির নাম ছিল আলি হাসান সালামেহ। প্রথম তিন জনের ঠিকানা থাকলেও চতুর্থ জন কোথায় আছে কেউ জানত না।

রাতের অন্ধকারে রাবারের ডিঙিগুলো বেইরুটের নির্জন সমুদ্রতটে ভিড়ল। তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল ছ’টা গাড়ি। গাড়িগুলো আগে থেকেই ভাড়া করে রেখেছিল পর্যটকের বেশে আসা মোসাদ এজেন্টরা। কমান্ডোরা যে যার পূর্বনির্ধারিত গাড়িতে উঠে বসল। মুহূর্তের মধ্যে গাড়িগুলো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তবে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল গাড়িগুলো। কয়েক জন গেল পপুলার ফ্রন্টের হেডকোয়ার্টারের দিকে, আর বাকিরা গেল ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের লিডারদের বাসস্থানের দিকে।

পপুলার ফ্রন্টের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছতেই প্রতিরোধের মুখে পড়ল মোসাদ এজেন্ট ও কম্যান্ডোরা। সেখানকার গার্ডরা গুলি চালাতে আরম্ভ করে দিল।

দুজন ইসরায়েলি কমান্ডো মারাও পড়ল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা হেডকোয়ার্টারে প্রবেশ করতে সফল হয় এবং বিস্ফোরক লাগিয়ে তারা সেখান থেকে বেরিয়েও আসে। প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণে ধ্বসে পড়ল বিল্ডিং।

সায়েরাত মটকলের কমান্ডোরা রু ভারদুনের বিল্ডিংয়ে হামলা চালাল। কামাল আদওয়ান, কামাল নাসের ও আবু য়ুসুফের অ্যাপার্টমেন্টে প্রায় একই সময়ে ঢুকে পড়ল কমান্ডোরা। একই বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন তলায় ছিল তাদের অ্যাপার্টমেন্ট। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের গুলি করে হত্যা করল কমান্ডোরা।

এই অ্যাপার্টমেন্টগুলো থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র মিলল। তারপর দ্রুত গতিতে গাড়িতে করে সমুদ্রতটের দিকে চলল টিম, যেখানে তাদের জন্য ডিঙিগুলো অপেক্ষা করছিল। অপারেশন সাকসেসফুল। পপুলার ফ্রন্টের হেডকোয়ার্টার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের তিন জন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে খতম করে দিতে পেরেছিল ইসরায়েলিরা।

কিন্তু সেদিন সালামেহকে মারতে পারেনি ইসরায়েলি কম্যান্ডোরা। আসলে তারা হদিশই পায়নি সালামেহর। জানতেও পারেনি যে, রু ভার্দুনের সেই অ্যাপার্টমেন্ট থেকে মাত্র ৫০ গজ দূরের অপর একটি অ্যাপার্টমেন্টে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল সালামেহ।

পরের দিন আবু য়ুসুফের জায়গায় ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের প্রধান হল আলি হাসান সালামেহ।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে দুজন সুন্দরী ফরাসি ভদ্রমহিলা লড এয়ারপোর্টে জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করে ইসরায়েলে ঢুকতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন। তল্লাশি করে তাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক পাউডার মেলে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনার মূল চক্রী মোহাম্মদ বাউদিয়ার খোঁজ মেলে। বাউদিয়া একজন আলজেরিয়ান। সে প্যারিসের একটা থিয়েটারের ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করত এবং নিজেও ছিল একজন অভিনেতা। তার বাস্তব জীবনের অভিনয়ও এবার ধরা পড়ে গিয়েছিল মোসাদের কাছে।

পরের মাসেই তার খোঁজে মোসাদ এজেন্টদের পাঠানো হয়। অভিনেতা হওয়ার সুবাদে ছদ্মবেশ ধরার কায়দা ছিল তার সহজাত। মোসাদের বেইরুট অভিযানের পর সে আরও সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। একবার তো তার পিছু নিয়ে তার প্রেমিকার বাড়ির সামনে অবধি পৌঁছে যায় এজেন্টরা। কিন্তু বাউদিয়া যেন জাদুকর। ভেলকি দেখাল। সেখান থেকে সে একজন মহিলার ছদ্মবেশে বেরিয়ে আসে। এভাবে টম অ্যান্ড জেরির খেলা চলতে থাকে। শেষমেষ ২৯ জুন তার গাড়িতে রাখা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাকে মারে মোসাদ।

বাউদিয়াকে মারার পরই খবর আসে যে আলি হাসান সালামেহ নরওয়ের একটা ছোট শহর লিলেহ্যামারে আছে। কয়েক দিনের মধ্যেই মাইক হ্যারারির নেতৃত্বে একটা কিডন হিট টিমকে পাঠানো হয় লিলেহ্যামারে।

এজেন্টরা শহরের একটা হোটেলের সুইমিং পুলের ধারে সালামেহকে দেখতে পায়। ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তারা নিশ্চিত হয় যে এ-ই সালামেহ। কোনো সন্দেহের অবকাশই ছিল না। কিন্তু একজন এজেন্টের খানিকটা খটকা লাগায় সে বলল, ‘লোকটাকে আমি নরওয়েবাসীদের ভাষায় কথা বলতে শুনেছি। সালামেহ তো এই ভাষা জানে না। তাহলে…’ তাকে কথা শেষ করতে দেয় না বাকিরা। তারা সালামেহকে সব জায়গায় ছায়ার মতো অনুসরণ করতে থাকে। সালামেহকে একজন ফরাসি মহিলার সঙ্গেও কথা বলতে দেখা

যায়। তিনি আবার গর্ভবতী ছিলেন।

এবার সালামেহকে মারার প্ল্যান ঠিক করা হল। ইসরায়েল থেকে আরও এজেন্ট এল। মোসাদের প্রধান জ্বি জামিরও এলেন। প্ল্যান এক্সিকিউট করার দায়িত্ব দেওয়া হল জোনাথন ইনগ্লেবি, রল্ফ বেয়ার ও জেরার্ড এমিলে লাফন্ড-কে। এজেন্টদের জন্য হোটেল ভাড়া করা হল। ব্যবস্থা হল ভাড়া গাড়িরও।

২৯ জুলাই, ১৯৭৩। সালামেহ নিজের সঙ্গিনীকে নিয়ে একটা সিনেমা দেখে ফিরছিল। বাস থেকে নেমে একটা রাস্তা ধরে হাঁটছিল ওই যুগল। আচমকা একটা সাদা গাড়ি পাশে ব্রেক করে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজা খুলে বন্দুক হাতে কয়েক জন বেরিয়ে এল এবং নিমেষে তারা গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিল সালামেহর শরীর।

অপারেশন সফল। এবার এজেন্টদেরকে নরওয়ে ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হল। কিন্তু বিপত্তি শুরু হল এরপর থেকেই। শুটিং প্লেসের কাছাকাছি একজন ভদ্রমহিলা গাড়িটাকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং তিনি গাড়ির রঙ, কোম্পানির নাম মনে রেখে দিয়েছিলেন। এদিকে একজন পুলিস অফিসার লিলেহ্যামার ও ওসলোর মাঝামাঝি একজন সুন্দরী মহিলাকে গাড়ি চালাতে দেখে গাড়ির রঙ ও তার লাইসেন্স নম্বর নোট করে রাখেন। কাকতালীয়ভাবে এটাই ছিল সেই গাড়িটা। পরের দিন গাড়িটা এয়ারপোর্টের কার রেন্টাল ডেস্কে জমা দিতে গেলে গাড়ি ব্যবহারকারীদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়।

এরপর ক্রমে আরও এজেন্ট গ্রেপ্তার হল। জিজ্ঞাসাবাদের সূত্র ধরে পুলিশ ওসলোর একটা অ্যাপার্টমেন্টে রেইড করে। সেখান থেকে প্রচুর কাগজপত্র উদ্ধার হয় এবং তাতে ইসরায়েলি এমব্যাসির সিকিউরিটি অফিসার ইগাল ইয়ালের জড়িত থাকার প্রমাণ মেলে।

পরের দিন সমস্ত খবর প্রকাশিত হয় মিডিয়ায়। মোসাদের দক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা তখন মাটিতে মিশে যাওয়ার উপক্রম।

আরেকটা খবর প্রকাশিত হয় এবং সেই খবরটাই সবচেয়ে বেশি মারাত্মক। সেটা ছিল— মোসাদ ভুল লোককে হত্যা করেছে!

লিলেহ্যামারে যাকে হত্যা করা হয়েছিল, তার নাম আহমেদ বুশিকি। সে ছিল আরব অরিজিনের একজন ওয়েটার। কাজের খোঁজে নরওয়ে এসেছিল। নরওয়ের এক ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করেছিল বুশিকি। তার স্ত্রী সাত মাসের গর্ভবতী ছিল। এই খবর বিশ্বের সব দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক এজেন্টদের দীর্ঘমেয়াদি জেল হয় আহমেদ বুশিকিকে খুন করার অপরাধে। ইসরায়েল তার পরিবারকে ৪ লক্ষ মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়। গোল্ডা মেয়ার জামিরকে 'রাথ অফ গড' বন্ধ করার নির্দেশ দেন। সে নির্দেশ অবশ্য কার্যকর করা যায়নি, কারণ ঠিক তখনই 'য়ম কিপ্পুর ওয়র' শুরু হয়।

আলি হাসান সালামেহ অধরাই রয়ে গেল। ১৯৭৭ সালের ৮ জুন সালামেহ ১৯৭৫ সালের মিস ইউনিভার্স জর্জিনা রিজককে বিয়ে করেন। সালামেহর লাইফস্টাইল ভারী অদ্ভুত ছিল। একজন সন্ত্রাসবাদী নেতা হিসাবে সেগুলো খাপ খায় না। কার রেসিং, ফ্যাশন ইভেন্টে হাজির থাকা, বিচ পার্টি, মহিলাসঙ্গ নিয়ে মেতে থাকত প্লেবয় সালামেহ। তার দুর্দান্ত ফ্যাশন সেন্সের জন্য তাকে 'রেড প্রিন্স' বলা হত।

নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে অদ্ভুত উদাসীন ছিল সালামেহ। সে বলত, 'আমার কপালে যা লেখা আছে তা হবেই। মরার হলে সেদিন কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না।' কিন্তু

এভাবে উদাসীন থাকা সত্ত্বেও টানা আট বছর ধরে সালামেহর পিছু নিয়েও মোসাদ কিছু করতেই পারছিল না।

মোসাদ একাধিক বার চেষ্টা করেও তাকে ছুঁতে পারছিল না। যেন মরীচিকা! জীবিত এক ভ্রম! চেষ্টা চলতে থাকল। জানা গেল ১৯৭৪ সালের ১২ জানুয়ারি পিএলও-এর নেতাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য সালামেহ সুইজারল্যান্ডের একটি চার্চে যাবে। মোসাদের টিম সেখানে পৌঁছে অ্যাকশন আরম্ভ করে দিল। তিন জনকে মারল তারা। সেই তিন জন আরবি হলেও কেউই সালামেহ ছিল না।

এবার লন্ডনে সালামেহকে ট্রেসও করে ফেলল মোসাদ। তাকে মারার জন্য এগোবে কি এমন সময়ে এক দল আমেরিকান মাতাল তাদের ঘিরে ফেলে। দু'দলের সংঘর্ষে মাঝখান থেকে একজন মোসাদ এজেন্টই নিহত হয়। আর এই ফাঁকে সালামেহ সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচে I

এবার মোসাদ বুঝে গিয়েছিল কেউ না কেউ খবর পৌঁছে দিচ্ছিল সালামেহর কাছে। ১১ নভেম্বর, ১৯৭৪। মোসাদ খবর পেল যে, স্পেনের তারিফায় একটি বিচ হাউসের পার্টিতে উপস্থিত থাকবে। খবর ঠিক ছিল। কিন্তু সেখানে অভিযান চালাতে গিয়ে ভয়ানক প্রতিরোধ সামলাতে হল মোসাদকে। সালামেহর আরব রক্ষীরা সেই সময়কার সবথেকে উন্নত হাতিয়ার একে ৪৭ নিয়ে আক্রমণ করেছিল। মোসাদের তিন জন এজেন্ট নিহত হয়। সালামেহর কিছু হয়নি।

এদিকে ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদীরা প্লেন হাইজ্যাকিং ও সন্ত্রাসবাদী হামলার মাধ্যমে ইসরায়েলিদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তখন প্রধানমন্ত্রীর পদে রয়েছেন মেনাকিম বিগিন। তিনি সালামেহকে হত্যা করার জন্য আবার নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু এখানে একটা 'কিন্তু' কাজ করছিল। আর সেই 'কিন্তু'র নাম ছিল 'সিআইএ'। সিআইএ এবং সালামেহর সম্পর্ক বেশ ভালো ছিল। এতটাই ভালো ছিল যে, ইয়াসের আরাফাতের পক্ষ থেকে সালামেহকেই সিআইএ-এর ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেলের সঙ্গে মরক্কোয় সাক্ষাতের জন্য পাঠানো হয়। সালামেহ কথা দিয়েছিল যে ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদীরা আমেরিকান নাগরিকদের কোনো ক্ষতি করবে না। আর সিআইএ তার পরিবর্তে সালামেহকে ধরিয়ে দিয়েছিল একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক, আর বলেছিল, 'তোমার সুরক্ষার দায়িত্ব আমরা নিলাম।'

আর এরপর সালামেহ নিজের কথা রেখে সম্পর্কটাকে আরও পরিণত করে তুলল। আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার হেনরি কিসিঞ্জার মধ্যপ্রাচ্যে চলেছিলেন। সালামেহ সেই সময়ে একটা খবর পেল, কিছু ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদী কিসিঞ্জারের ফ্লাইট নামামাত্রই তাকে হত্যার ছক কষেছে। গোপনে সালামেহ সিআইএ-কে খবর দিল। সে যাত্রা রক্ষা পেল কিসিঞ্জার এবং তাকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সালামেহর ১৭ জন ব্যক্তিগত রক্ষীকে ব্যবহার করা হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবে গদগদ হয়ে পড়ল সিআইএ। সে হয়ে উঠেছিল মধ্যপ্রাচ্যে সিআইএ-এর সবথেকে বিশ্বাসের ব্যক্তি।

বুঝতেই পারছেন বন্ধুরা, সিআইএ-এর এই ছাতা সরানোর দরকার আগেই ছিল। ইসরায়েল এবার সেই খেলাই খেলল। তারা জানাল, আমরা সালামেহকে মারতে চলেছি। তোমরা বলো, ও কি তোমাদের লোক?

সিআইএ পড়ল উভয় সংকটে। একদিকে এক শক্তিশালী বন্ধু-রাষ্ট্র, অপর দিকে মধ্যপ্রাচ্যের এক বিশ্বস্ত বন্ধু। কিন্তু শেষ অবধি তারা বলে দিল, সালামেহ আমাদের লোক

নয়। ডেথ ওয়ারেন্ট জারি হয়ে গেল।

খবর মিলল যে, সালামেহ বেইরুটে আছে। এজেন্টদের পাঠানো হল বেইরুটে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন এরিকা মেরি চেম্বার্স। বেইরুটে তিনি সালামেহর অ্যাপার্টমেন্টের কাছাকাছি একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন। একটি ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশনের স্বেচ্ছাসেবীরূপে তিনি ওখানে গরিব বাচ্চাদের সাহায্য করার কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন। নিজের অ্যাপার্টমেন্টের জানালা থেকে তিনি রোজ লক্ষ করতেন একেবারে বাঁধা সময়ে একটা সেভ্রোলে স্টেশন ওয়াগন ও তার পিছু পিছু একটা ল্যান্ড রোভার জিপ বেরিয়ে যায়। তিনি ওই গাড়িগুলোর বেরোনোর ও ঢোকার সময় নোট করে রাখতে থাকলেন। বাইনোকুলার লাগিয়ে একদিন তিনি সেভ্রোলে গাড়ির পিছনের সিটে সালামেহকে দেখতেও পেয়ে গেলেন। চেম্বার্স লক্ষ করলেন যে, প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়েই গাড়িগুলি যাওয়া-আসা করছে। আর এটাই ছিল মোসাদের বাজিমাত করার সবচেয়ে বড় পয়েন্ট। রুটিন ফলো করেছ কি মরেছ!

১৯৭৯ সালের ১৮ জানুয়ারি পিটার স্ক্রাইভার নামের একজন ব্রিটিশ পর্যটক বেইরুটে এসে মেডিটেরানি হোটেলে রুম ভাড়া নিলেন। আর ভাড়া করলেন একটা নীল রংয়ের ফোক্সওয়াগন গাড়ি। সেদিনই রোনাল্ট কোলবার্গ নামে এক কানাডিয়ান পর্যটক রয়াল গার্ডেন হোটেলে রুম নিলেন ও একটা সিমকা ক্রিসলার গাড়ি ভাড়া নেন। প্রত্যেকেই ছিল মোসাদের এজেন্ট। তারা দুজনেই লেনাকার এজেন্সি থেকে গাড়ি ভাড়া নেন।

এরিকা চেম্বার্সও একটা গাড়ি ভাড়া নিলেন মাউন্টেন ট্রিপের উদ্দেশে একটা ডাটসুন কার।

সেদিন রাতেই ইসরায়েলি মিসাইল বোট বেইরুট এবং জনিয়েহ বন্দরের মাঝামাঝি সমুদ্রতটে পৌঁছাল এবং বিস্ফোরকের বাক্স রেখে চলে গেল। কোলবার্গ ও স্ক্রাইবার আগে থেকেই সেখানে মজুত ছিল। তারা ফোক্সওয়াগনে তুলে নিল সব বিস্ফোরক।

২১ জানুয়ারি পিটার স্ক্রাইভার তার নীল রংয়ের ফোক্সওয়াগন রাস্তার এমন একটা জায়গায় পার্ক করল, যাতে সেটা এরিকা চেম্বার্সের রুম থেকে দেখা যায়। ওই রাস্তা দিয়েই সালামেহর গাড়ি যাওয়া-আসা করত। গাড়িটা পার্ক করার পর সে একটা ক্যাব বুক করে সোজা এয়ারপোর্টে গিয়ে সাইপ্রাসের ফ্লাইট ধরে।

বিকেল ৩:৪৫-এ রোজকার মতো আলি হাসান সালামেহ তার সেভ্রোলেতে চেপে বেরোল। পিছনে তার বডিগার্ডের ল্যান্ড রোভার।

এরিকা চেম্বার্স তার অ্যাপার্টমেন্টের জানালা দিয়ে তাদের আসতে দেখলেন। তার পাশে দাঁড়িয়েছিল এজেন্ট মোলাড। হাতে একটা রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস। সেভ্রোলে যখন নীল ফোক্সওয়াগনটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই মোলাড তার রিমোটের বোতাম টিপল। বিস্ফোরণে উড়ে গেল ফোক্সওয়াগন, আর তার সঙ্গে উড়ে গেল সেভ্রোলে গাড়িটাও। প্রচণ্ড শব্দে অ্যাপার্টমেন্টের জানালার কাচ ভেঙে পড়ল। চারদিকে তখন ছড়িয়ে আছে গাড়ির টুকরো অংশ ও আর সেভ্রোলের ভেতর থাকা যাত্রীদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ।

ইয়াসের আরাফাতের কাছে টেলিগ্রাম গেল। সংবাদ পেয়ে নাকি আরাফাত কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। সালামেহ তাঁর প্রাণপ্রিয় ছিল।

সেই রাতেই জনিয়েহ সমুদ্রসৈকতে মোলাড ও এরিকা চেম্বার্স রাবারের ডিঙিতে

করে পৌঁছালেন মূল জাহাজে, যা সমুদ্রতট থেকে অনেকটা দূরে অপেক্ষা করছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তারা ইসরায়েল পৌঁছে গেলেন।

ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের ইতি এখানেই। ইতি পড়ল অপারেশন র‍্যাথ অব গড-এও।

আয়রন ডোম

'নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অব ইনভেনশন'- আমরা সবাই এই কথাটা জানি। কিন্তু যদি এখন বলা হয় যে, যুদ্ধই আবিষ্কারের চাবিকাঠি! তাহলে হয়তো কেউ মানবে না। কেই বা যুদ্ধবাজ তকমা নিজের কপালে লাগাতে চাইবে?

যদি একজন ইসরায়েলি নাগরিককে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এখনও অবধি আপনার দেশের বিগত দশকের সেরা আবিষ্কার কোনটা, তাহলে সবচেয়ে বেশি যে উত্তরটা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তা হল— আয়রন ডোম।

আয়রন ডোম কী? কেনই বা তা দরকার?

এ কথা জানতে হলে আমাদের উঁকি দিতে হবে ইতিহাসের পাতায়।

১৯৭৩ সাল। আরব-ইসরায়েলের যুদ্ধ চলল। 'য়ম কিপ্পুর ওয়র'। ওই বারেই প্রথম ব্যালিস্টিক মিসাইলের ব্যবহার হল ওই অঞ্চলে। প্রথমে মিশর তিনটে স্কুড মিসাইল দাগল ইসরায়েলের দিকে। সিরিয়া যুদ্ধ চলাকালীন ফ্রগ-সেভেন নামে আর্টিলারি রকেট ছোড়া শুরু করে উত্তর ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে। আর ইসরায়েল সিরিয়াকে এর জবাব দিয়েছিল বায়ুসেনা পাঠিয়ে। সিরিয়ার কয়েকটা টার্গেটকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছিল ইসরায়েল। এরপর সিরিয়া আর রকেট ছোড়ার পথে যায়নি। কারণ তারা বুঝে গিয়েছিল যে, ইসরায়েল প্রত্যেক আঘাতের উত্তরে প্রত্যাঘাত করবেই। চোখের বদলে চোখই হয়ে উঠেছিল ইসরায়েলের নীতি। আর এই আক্রমণ-নীতি প্রয়োগ করে তারা এই যুদ্ধে সফলও হয়েছিল। তাই পরবর্তীকালে মিসাইল ও রকেটের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার তাগিদ তাদের মনে জন্মায়নি।

১৯৮০ সালে শুরু হয় ইরাক ও ইরানের যুদ্ধ, যা প্রায় আট বছর ধরে চলেছিল। এতে দুই দেশের সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ এই যুদ্ধ কেবল দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। দুটো দেশই একে অপরের শহরগুলোকে লক্ষ্য করে ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুঁড়ছিল। ১৯৮৮ সালে যুদ্ধ যখন শেষের দিকে, তখন ইরাক ইরানকে লক্ষ্য করে ২০০ টা ব্যালিস্টিক মিসাইল ফায়ার করে। প্রায় ২,০০০ জন মানুষের মৃত্যু হল এবং এই ঘটনার ফলে ইরান একপ্রকার বাধ্য হয়েই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব স্বীকার করে নেয়।

ইরাক-ইরান কনফ্লিক্ট থেকেই কিন্তু শিক্ষা নিতে শুরু করল ইসরায়েল। কারণ এই রাষ্ট্র সবার আগে ভাবে। নিজের মাটি এবং নিজের মানুষদের সুরক্ষিত করে তোলাই ইসরায়েল রাষ্ট্রের এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। ব্যালিস্টিক মিসাইলের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা শুরু করল ইসরায়েল।

প্রতিপক্ষ একবার ব্যালিস্টিক মিসাইল ফায়ার করার পর তাকে ঠেকানোর কোনো উপায় জানা থাকে না। ফলে যা ক্ষতি হওয়ার, তা হবেই। ইরাক- ইরানের যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নিরপরাধ সাধারণ মানুষের মৃত্যুর মিছিল ইসরায়েলকে ভাবতে বাধ্য করল। আটের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রিগান ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স নিয়ে উঠে-পড়ে লাগেন। তিনি মিত্র রাষ্ট্রগুলিকে আহ্বান করেন স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভে (যার আরেক নাম স্টার ওয়র্স) অংশগ্রহণ করার জন্য। আমেরিকার লক্ষ্য তখন সোভিয়েত ইন্টারকন্টিনেন্টাল নিউক্লিয়ার ব্যালিস্টিক মিসাইল প্রতিহত করার মতো একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা। বলা বাহুল্য, ইসরায়েলের কাছে এর উপযুক্ত কোনো পরিকল্পনা বা জ্ঞান

কিছুই ছিল না। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী তখন য়িত্জাক রাবিন। তিনি আমেরিকার এই প্রকল্পে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঘনিষ্ঠ মহলে এই ব্যাপারে একটাই কথা বলেছিলেন, 'এই সুযোগে আমরা আমেরিকার নেকনজরে আসতে পারব। কারণ আরব দুনিয়ার সঙ্গে লড়াইতে আমেরিকাকে পাশে পেলে একটা বিরাট ব্যাপার হবে।' আর আরেকটা ব্যাপারও এর মধ্যে ছিল। ইসরায়েলের শত্রু আরব দেশগুলোর প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ ছিল ইউএসএসআর বা সোভিয়েত ইউনিয়ন।

তবে এক্ষেত্রে একটা ক্যালকুলেটিভ রিস্ক নিয়েছিল ইসরায়েল। কারণ ইসরায়েলের এই পদক্ষেপকে বাহানা করে সোভিয়েতের পক্ষে আরব দেশগুলোকে আরও বেশি অস্ত্র সরবরাহ করার পথ প্রশস্ত হল এবং সোভিয়েত ভূখণ্ডে বসবাসকারী ইহুদিদের পক্ষে ইসরায়েলে ইমিগ্রেট করা আরও কঠিন হয়ে উঠতেই পারত।

রাবিন তার রিসার্চ টিমকে আদেশ করলেন, 'প্ল্যান রেডি করো!' উজি রুবিন নামে এক প্রতিভাবান এঞ্জিনিয়ারকে এই প্রোজেক্ট দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত করা হল। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে কয়েকটি পরিকল্পনার খসড়া তৈরি হয়ে গেল। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের নাম ছিল 'অ্যারো'। এই প্রকল্পে এমন একটা ইন্টারসেপ্টর তৈরির কথা বলা হয় যেটা ব্যালিস্টিক মিসাইলকে গুলি করে ধ্বংস করতে পারবে। ঠিক যেভাবে ফাইটার জেটকে ফায়ার করে নীচে নামানো হয়, সেভাবেই ভেবে নিয়ে এগোনো হচ্ছিল। তবে হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছিল যে, মিসাইলটাকে ধ্বংস করতে হবে ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেকটাই উঁচুতে, যাতে নীচে থাকা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষতি না হয়।

প্রোজেক্ট 'অ্যারো'-এর ডেভেলপার ছিলেন ডভ রাভিভ। তাঁর বক্তব্য ছিল পরিষ্কার, 'আয়তনের দিক থেকে ইসরায়েল এমনিতেই ছোট একটা দেশ। এর ফলে শত্রুর পক্ষে ঘরে বসেই ইসরায়েলের যে কোনো প্রান্তে মিসাইল দিয়ে আঘাত হানা সম্ভব। তাই যে প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে, তা যেন নার্ভ রিফ্লেক্সের গতিতে কাজ করতে পারে।'

রুবিনের নেতৃত্বে একটা টিম ওয়াশিংটনে গিয়ে আমেরিকানদের টেবিলে নিজেদের প্রস্তাব রাখল। প্রোজেক্ট 'অ্যারো'-এর কথা শুনে আমেরিকানরা বিস্মিত হয়ে যায়। তাদের বিস্ময় আরো বেড়ে যায় এর খরচের কথা জানতে পেরে। কারণ মার্কিনদের ধারণা ছিল যে, এ ধরনের প্রোজেক্টে খরচ হতে পারে কম করে ৫০০ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু রাভিভ যখন বললেন, 'গোটা প্রোজেক্টের খরচ পড়বে মাত্র ১৫৮ মিলিয়ন ডলার', তখন আমেরিকার পক্ষ থেকে বলা হল, 'এই প্রোজেক্টে আমরা টাকা ঢালব।'

ওদিকে ওয়াশিংটনের এই অতি উৎসাহকে ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফ কিন্তু ভালো চোখে দেখছিল না। আইডিএফ-এর চিফ অব স্টাফ য়হুদ বারাক সরাসরি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে এই প্রকল্পের বিরোধিতা করেন। তাঁর মত ছিল, 'ইসরায়েলের উচিত ট্যাঙ্ক, ফাইটার জেট আর যুদ্ধজাহাজ কেনা। মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে তো আর যুদ্ধ জেতা যাবে না।'

অপর দিকে ইসরায়েলি এয়ারফোর্সের এর কমান্ডার ডেভিড ইভরি আবার মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমের পক্ষে ছিলেন। যদিও ইসরায়েলের যুদ্ধ জয়ের নীতি ছিল একটাই, আক্রমণের জবাবে পালটা আক্রমণ করে শত্রুকে বিধ্বস্ত করা, কিন্তু তাঁর মতে ডিফেন্স করাটাও সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সফল ডিফেন্সের দ্বারাও যুদ্ধজয় সম্ভব।

এভাবেই টানাপোড়েন চলতে থাকল। এর মধ্যেই ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট ইরাকি সেনা কুয়েত আক্রমণ করে। আমেরিকা এবং অন্যান্য ৩৩টি দেশের সম্মিলিত সেনা

ইরাককে কুয়েত থেকে হটাবার জন্য ইরাকের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এত বড় কোয়ালিশন আর কখনো গঠন হয়নি। ইসরায়েল কিন্তু এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি এবং তারা তা করেনি আমেরিকার ইশারাতেই। কারণ একটাই, আরব দুনিয়া ইসরায়েলের অংশগ্রহণ কোনোভাবেই মেনে নিত না।

ইসরায়েলের সঙ্গে ইরাকের সম্পর্কটা চিরকালই অহি-নকুলের। তাই ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেন আগে থেকেই ইসরায়েলকে হুমকি দিয়ে রেখেছিল— 'যদি ইসরায়েল নাক গলাতে আসে, তবে ইসরায়েলের অর্ধেকটা আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হবে।'

আসলে ইরাক ইসরায়েলকে উসকাতে চাইছিল। সাদ্দাম চাইছিলেন, ইসরায়েল ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামুক। কারণ আরব দেশগুলো কখনোই ইসরায়েলের সাহায্য নিয়ে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। হয় তারা যুদ্ধ থেকে সরে যাবে অথবা ইরাকেরই পক্ষে যোগ দেবে। তাই ইরাক যে কোনো মূল্যে ইসরায়েলকে যুদ্ধে জড়াতে চাইছিল। কী অদ্ভুত যুদ্ধনীতি!

যুদ্ধ শুরুর পরের দিনই ইরাক ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে আট আটটা আল- হুসেইন মিসাইল নিক্ষেপ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইজরায়েল এই প্ররোচনায় পা দিল না। যে ইসরায়েল তার আগের ৪০টা বছরে মারের বদলে পালটা মার দেওয়ার নীতিতে চলেছে, সেই ইসরায়েল এই প্রথম বার কাউকে পালটা আক্রমণ করল না।

কিন্তু থামল না ইরাকও। তারা ৩৯টা স্কুড মিসাইল ইসরায়েলের জনবসতিপূর্ণ এলাকাকে টার্গেট করে নিক্ষেপ করল। ইসরায়েলের সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য আমেরিকা প্যাট্রিয়ট মিসাইল এয়ার ডিফেন্স ব্যাটেলিয়ন পাঠাল, আর তার সঙ্গে পাঠাল দুই ব্যাটারি প্যাট্রিয়ট মিসাইল। স্কুড মিসাইল হানায় তেল আভিভ ও হাইফাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রায় ৩,৩০০ অ্যাপার্টমেন্ট ও বেশ কিছু বিল্ডিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় ১,১৫০ জন নাগরিককে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করে হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করে ইসরায়েলি গভর্নমেন্ট। প্রতি রাতে হোটেলের খরচই ছিল প্রায় ২০,০০০ মার্কিন ডলার। আর সবচেয়ে বড় ক্ষতি ছিল ৭৪ জন মানুষের প্রাণহানি।

এই যুদ্ধের পর 'প্রোজেক্ট অ্যারো'কে ইসরায়েল খুব গুরুত্ব সহকারে দেখতে শুরু করে। এই প্রোজেক্টে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আমেরিকাও তার বরাদ্দ বাড়িয়ে দেয়। আরও কয়েক বছর পর ইসরায়েলি বায়ুসেনা নিজেদের প্রথম অ্যারো মিসাইল ব্যাটারি পেল। ইসরায়েলই এমন প্রথম দেশ যারা একটি কার্যকরী ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম তৈরি করে। য়হুদ বারাক একটা সময় অবধি এর তীব্র বিরোধী ছিলেন, তিনি অবধি নিজের ভুল স্বীকার করে নেন। এই প্রথম বার ইসরায়েলের কাছে ইরাক ও সিরিয়ার মিসাইলকে আটকানোর উপায় হাতে এসে গেল। কিন্তু ইসরায়েলের কপালে ঈশ্বর হয়তো শান্তি শব্দটিই রাখেননি, কারণ এবার ইরাক কিংবা সিরিয়া নয়, আক্রমণটা এল সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে। ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে।

স্ড্রেট শহরের মেয়র এলি ময়াল। এই ছোট্ট শহরটি ইসরায়েলের দক্ষিণে অবস্থিত এবং গাজা ভূখণ্ড থেকে এর দূরত্ব মাত্র এক কিমি। নিজের বাড়ির বারান্দায় বসে মরুভূমির উষ্ণ বাতাস উপভোগ করছিলেন মেয়র সাহেব। হঠাৎই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে জানালার কাচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল! এরপর আরেকবার! খানিক দূরে ধোঁয়া বেরোতে দেখেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মেয়র সাহেব ছুটলেন ধোঁয়ার উৎস খুঁজতে। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখলেন একটা গর্ত তৈরি হয়েছে, আর গর্তটা থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে

একটা ধাতব নলের মতো অংশ। ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সের একজন আধিকারিকও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি ময়ালকে বললেন, 'মনে হচ্ছে গাজা স্ট্রিপ থেকে দুটো রকেট ছোড়া হয়েছে। আপনি এখুনি কাউকে কিছু বলবেন না, প্লিজ!'

এর অর্থ খুব পরিষ্কার ছিল। হামাস জঙ্গিদের হাতে রকেট পৌঁছে গিয়েছিল! বিগত শতাব্দীর অন্তিম দশক থেকে হামাস আত্মঘাতী হামলা চালানো শুরু করেছিল গোটা ইসরায়েল জুড়ে। সেটাকে নানা ভাবে প্রতিহত করছিল ইসরায়েল। অনেকাংশে ঠেকানো যাচ্ছিল ওই ধরনের আক্রমণ। ইসরায়েলের বিশ্বাস ছিল যে, হামাস জঙ্গিদের হাতে রকেটের মতো বিপজ্জনক অস্ত্র নেই এবং উল্লেখিত রকেট-হামলার আগে পর্যন্ত ডেরট খুব শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ শহর হিসাবেই পরিচিত ছিল। কিন্তু নতুন দান চেলে দিয়েছিল হামাস। যেহেতু ইসরায়েলের বায়ুসেনা ও স্থলসেনার সঙ্গে পেরে ওঠা হামাসের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রকেট আক্রমণ হামাসের পক্ষে অনেক বেশি কার্যকরী।

হামাস এই রকেটের নাম দিয়েছিল 'কাসাম'। প্রথম দিকে কাসামের রেঞ্জ ছিল মাত্র এক মাইল। ২০০৮ সাল নাগাদ এর রেঞ্জ বেড়ে হয় ২৬ মাইল। ২০১২ সালে হামাসের হাতে আসে ইরানের তৈরি অত্যাধুনিক রকেট, যা গাজাপট্টি থেকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত তেল আভিভে আঘাত হানতে সক্ষম। ২০১৪ সাল পর্যন্ত গাজা ভূখণ্ড থেকে ১২,০০০-এরও বেশি রকেট ইসরায়েলের দিকে নিক্ষেপ করেছে হামাস। এদিকে দক্ষিণে লেবানন থেকে রকেট ফায়ার করছে হিজবুল্লাহ জঙ্গিরা।

এর আগে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী সিমন পেরেস মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টনের সঙ্গে ১৯৯৬ সালে মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম তৈরির জন্য একটা চুক্তি সাক্ষর করেন। 'নটিলাস' নামের লেসার নির্ভর এই সিস্টেম তেমন কার্যকরী না হওয়ায় এর ব্যবহারও বন্ধ হয়ে যায়। ২০০৪ সালে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ড্যানি গোল্ডকে ইসরায়েলের রক্ষা মন্ত্রকের রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট বিভাগের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করা হয়। তাঁর মূল ধ্যানজ্ঞান ছিল একটাই—গাজাপট্টি থেকে ইসরায়েলের উদ্দেশে রকেট আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা। ২০০৪- এর আগস্ট মাসে তিনি ইসরায়েলি ডিফেন্স কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাদের প্রত্যেককে বলেন, 'একটা করে আইডিয়া উদ্ভাবন করুন।' কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ২৪টা পরিকল্পনা জমা পড়ল। গোল্ড ও তাঁর টিম প্রত্যেকটা পরিকল্পনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন।

এদের মধ্যে একটা প্রোজেক্ট ছিল আমেরিকানদের আদলে, যেটা তারা ইরাকে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোকে রকেট ও মর্টারের আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্য ব্যবহার করত। এর ক্যানন একটা মিসাইলকে লক্ষ্য করে মিনিটে ৪,০০০ রাউন্ড ফায়ার করতে পারত।

'কিন্তু একটা রকেটের পিছনে ৪,০০০ রাউন্ড ফায়ার করাটা কি যুক্তিযুক্ত?' এই কথাই বলেছিলেন গোল্ড।

প্রথমত, এটা মশা মারতে কামান দাগার মতো ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, এভাবে ফায়ার করলে গাজায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষের ক্ষতি হতে পারত। তাই এই পরিকল্পনা বাতিল করে দিলেন গোল্ড।

আরেকটা প্রোজেক্ট ছিল নটিলাসেরই একটু উন্নততর সংস্করণ, যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'স্কাইগার্ড'। কিন্তু এটাও গোল্ডের মনে ধরল না।

সমস্যা কী ছিল?

এর একটা বড় অসুবিধা ছিল যে, এর লেসার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে কাজ করে না, আর গোটা জিনিসটা এত বড় যে একে প্রয়োজন অনুসারে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়াটা একটা বড় হ্যাপা।

গোল্ডের টিম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি চষে ফেলল। কিন্তু তেমন কোনো লাভ হল না। তার ওপরে আবার গোল্ডের কঠোর নির্দেশ ছিল— -জিনিসটা হতে হবে সস্তা।' অনুসন্ধান জারি রইল। শেষমেষ ২০০৫ সালে এসে গোল্ডের মনে হল যে, এবার তিনি মনের মতো জিনিসটি খুঁজে পেয়েছেন।

'রাফায়েল'। ইসরায়েল সরকারের একটি অন্যতম সংস্থা। পাঠকবন্ধুরা, চিন্তিত হবেন না, ইসরায়েলের রাফায়েলের সঙ্গে ফরাসি ফাইটার এয়ারক্রাফ্ট র‍্যাফেলের কোনো সম্পর্ক নেই। 'সারফেস টু সারফেস' মিসাইলের জন্য গোটা বিশ্ব একে এক ডাকে চেনে।

এদের পরিকল্পনা কী ছিল?

একটু অন্যরকম। দ্য নেম ইজ 'আয়রন ডোম'। আয়রন ডোমের তিনটি অংশ। প্রথম অংশটি হল একটা ইন্টারসেপ্টর মিসাইল, যা শত্রুপক্ষের মিসাইলকে ধ্বংস করতে সক্ষম। দ্বিতীয় অংশটি হল একটি শক্তিশালী রাডার, যেটা শত্রুপক্ষ রকেট নিক্ষেপ করা মাত্রই তা ডিটেক্ট করে ফেলবে এবং তৃতীয় অংশটি হল ব্যাটেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, যার কাজ শত্রুর ছোড়া রকেটের গতিপথ আগে থেকেই অনুমান করা এবং রকেট কোথায় আঘাত হানবে তারও প্রায় সঠিক অনুমান করে ফেলা। এর ফলে জনবহুল এলাকায় যখন কোনো রকেট আঘাত হানতে যাচ্ছে, তখন সাইরেন বাজিয়ে সেখানকার লোকজনকে সতর্ক করে দেওয়া সম্ভব হবে, আর ইন্টারসেপ্টর মিসাইল নিক্ষেপ করে ধ্বংস করে দেওয়া যাবে শত্রুর শক্তিশেল। আবার অপর দিকে, যে মিসাইলগুলো ফাঁকা জায়গাতে আছড়ে পড়বে, তাদের জন্য কোনো ইন্টারসেপ্টর মিসাইলও অপচয় করতে হবে না।

গোল্ড এই সিস্টেম পাওয়ার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। তবে তিনি নিজের শর্ত থেকে সরে আসেননি— প্রতিটা ইন্টারসেপ্টর হতে হবে সস্তা। তিনি বললেন, 'যদি এটা সস্তা না হয়, তাহলে শত্রুরা রকেট ছুড়ে ছুড়েই আমাদেরকে ভিখারী বানিয়ে দেবে।' দামি কথা! তাই নয় কি?

এবার একটা দুঃসাহসী পদক্ষেপ নিয়ে বসলেন গোল্ড। তিনি রাফায়েলকে পুরোদমে আয়রন ডোম তৈরির জন্য আদেশ দিয়ে দিলেন। আসলে তিনি যে পদে আসীন ছিলেন, তাতে এই আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা বা অধিকার তাঁর মোটেই ছিল না।

কারা দিতে পারতেন এই আদেশ?

আদেশ দেওয়ার অধিকার ছিল শুধুমাত্র আইডিএফ প্রধান এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর হাতে। স্বাভাবিক ভাবেই অডিটে ধরা পড়ল গোল্ডের এই কীর্তিকলাপ। সেই রিপোর্টে বেশ চাঁছাছোলা ভাষায় গোল্ডকে আক্রমণ করা হল। কিন্তু বিধাতাপুরুষ যার সঙ্গে আছেন, তাঁকে আর কে মাত করবে? কারণ যত দিনে অডিট রিপোর্ট বেরিয়েছিল, তত দিনে আয়রন ডোম নিজের কামাল দেখাতে শুরু করে দিয়েছিল!

এবারে আসা যাক আয়রন ডোম নির্মাণের পর্বে। ২০০৫ সালে রাফায়েলের চেয়ারম্যান ছিলেন ইলান বিরান। তিনি গোল্ডের মতোই কাউকে খুঁজছিলেন, যিনি অনায়াসে

এই প্রকল্পে সরকারি বরাদ্দ নিশ্চিত করবেন। গোল্ডের সঙ্গে মিটিংয়ের পর তিনি তাঁর এঞ্জিনিয়ার ও মিসাইল এক্সপার্টদের নিয়ে বসলেন। একটাই প্রশ্ন সকলের সামনে রেখেছিলেন— 'স্বল্প মূল্যে এটা করা কি সম্ভব?'

সবার নজর গিয়ে পড়েছিল একজনেরই দিকে। গ্লোসি ড্রাকার, রাফায়েলের মিসাইল বিভাগের প্রধান। পঁয়ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি রাফায়েলে কাজ করছিলেন। রাফায়েল 'পাইথন' নামে এমন একটা মিসাইল আবিষ্কার করেছিল যেটা একবার টার্গেট নিশ্চিত করে দিলে তাকে আঘাত হানবেই। এই পাইথন মিসাইল ছুড়ে ইসরায়েলি এয়ারফোর্সের পাইলটরা শত্রুপক্ষের বিমান দেখতে না পেলেও তাকে ধ্বংস করে দিতে পারত।

ড্রাকার বললেন, 'মিসাইল ছুড়ে যদি যুদ্ধবিমান ধ্বংস করা যায়, তাহলে মিসাইল ছুড়ে মিসাইল ধ্বংস করাই বা যাবে না কেন?'

ড্রাকারের কথায় অবশ্য সেদিন অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। কারণ টার্গেট হিসাবে যুদ্ধবিমান ও মিসাইলকে কোনো ভাবেই তুলনা করা যায় না। যুদ্ধবিমান আকারে অনেক বড় হয়ে থাকে। একটা ১৭০ মিমির রকেটকে যদি ধ্বংস করতে হয়, তাহলে কাজটা নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জিং

আবার প্রশ্ন তুললেন ড্রাকার, 'কাজটা দুঃসাধ্য হতে পারে, কিন্তু অসাধ্য নয়!'

বিরান ড্রাকারকে খুব ভরসা করতেন। তিনি ড্রাকারকে একটা টিম তৈরি করে কাজ শুরু করতে বলে দিলেন।

কাজ আরম্ভ হল। খরচ কম রাখার জন্য সস্তায় কাঁচামালের খোঁজ শুরু করল টিম। সরকারি সাহায্য পুরোপুরি না পাওয়ার জন্য কাজ চলছিল ঢিমে তালে। ২০০৬ সালের ১২ জুলাই, হিজবুল্লাহ জঙ্গিরা ইসরায়েলে প্রবেশ করে দুজন আইডিএফ-এর সেনাকে অপহরণ করে। এর জবাবে ইসরায়েলি ট্যাঙ্ক সীমানা পার করার সঙ্গে সঙ্গেই নীচে রাখা অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইনের বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী অলমার্ট হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ঠিক এই সময়েই ইসরায়েল উপলব্ধি করল যে, রকেট হামলা কী মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। ৩৪ দিনের মধ্যে হিজবুল্লাহ দেগে বসল ৪,৩০০ টা রকেট। প্রায় ১০ হাজার মানুষ ঘরছাড়া হল। যুদ্ধ শেষের কয়েক দিন পর রক্ষামন্ত্রী আমির পেরেট্জ তেল আভিভে জরুরি বৈঠক ডাকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন মিসাইল ডিফেন্সের খবরাখবর। পেরেট্জ দীর্ঘ দিন স্ট্রেটে বসবাস করেছেন এবং তিনি সেখানকার প্রাক্তন মেয়র। স্পেরটে আগেই তিনি রকেট হামলার অভিজ্ঞতার সম্মুখীনও হয়েছেন। বৈঠকে তিনি বললেন, 'আয়রন ডোমই হবে এখনকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্ট। যত দ্রুত সম্ভব এই প্রোজেক্ট সম্পূর্ণ করতে হবে!'

এই যুদ্ধের ফলে ইসরায়েলের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী অলমার্টকে প্রথম বার আয়রন ডোমের প্রোজেক্টের কথা জানানো হল। আইডিএফ-এর প্রথম সারির কর্তারা সবাই ছিলেন এই প্রোজেক্টের বিরুদ্ধে। তাই অলমার্ট চাপে পড়ে গেলেন। ব্যাকফুটে চলে গিয়ে তিনি তখন এই প্রোজেক্টে টাকা ঢালতে অস্বীকার করলেন।

সরকারি সাহায্য না পাওয়া সত্ত্বেও রাফায়েল কিন্তু আয়রন ডোম তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ড্রাকার এই প্রোজেক্টের ম্যানেজার হিসাবে উজিকে চাইছিলেন। কিন্তু উজি

তখন সস্ত্রীক চিলিতে ছুটি কাটাতে ব্যস্ত। ড্রাকার ফোন ধরলেন উজিকে, 'তোমাকে আমাদের দরকার। এখুনি ফিরে এসো!' উজি নিজের স্ত্রীকে কোনোরকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছুটির প্ল্যান কাটছাঁট করে দেশে ফিরলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই উজি প্রোজেক্টের ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। 'এই প্রোজেক্টে অসম্ভব বলে কোনো শব্দ নেই,' উজি তাঁর সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে বললেন। এদিকে শত বিরোধ সত্ত্বেও গোল্ড নিজের মতো চেষ্টা চালাতে লাগলেন। আবার তিনি নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে ২০০৬ সালের নভেম্বরে রাফায়েলকে পুরোদমে প্রোডাকশন চালানোর কন্ট্রাক্ট দিলেন।

২০০৭ সালের গোড়ার দিকে পেরেন্জ রাফায়েলের মিসাইল কারখানায় হাজির হলেন ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। আয়রন ডোমের জন্য ওকালতি করার আগে তিনি দেখে নিতে চাইছিলেন যে, বাস্তবে ঠিক কী হচ্ছে কারখানায়। ড্রাকার তাঁকে সমস্ত খুঁটিনাটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন।

পেরেটজ বললেন, 'আমার মনে হয় দিনে তিনটে শিফট চালালে ভালো হয়।' ড্রাকারের উত্তরটা ছিল, 'আমরা এখানে একটাই শিফটে কাজ করি, আর সেটা ২৪ ঘণ্টার শিফট।'

বলাই বাহুল্য যে, পেরেটজ খানিকক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেছিলেন। তাঁকে অবাক করার জন্য অবশ্য আরও বিষয় বাকি ছিল। তিনি তো জানতেনই না যে, শনিবার, যেদিন সমস্ত ইহুদিরা ছুটি কাটায়, সেদিনও রাফায়েলে কাজ চলে। এর জন্য তাঁরা রাব্বিদের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি অবধি নিয়েছে। গোটা দেশ তখন এমন একটা বিপদের মধ্যে, যে একমাত্র আয়রন ডোমই পারত ওই বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে। সুতরাং, ওই পরিস্থিতিতে আরাম করার কোনো প্রশ্নই ছিল না।

ওদিকে গোটা দেশে আয়রন ডোম প্রকল্পের বিরোধীরা প্রচার চালাতে লাগল যে, এক একটা ইন্টারসেপ্টর বানাতে খরচ পড়বে ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ মার্কিন ডলার এবং এই বিপুল খরচের ফলে দেশটা দেউলিয়া হয়ে যেতে বসেছে। এসবের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটল। ২০০৭ সালের জুন মাসে পেরেকে সরিয়ে য়হুদ বারাককে প্রতিরক্ষামন্ত্রী করা হল। বারাক কিন্তু গোড়া থেকেই আয়রন ডোমের বিপক্ষে ছিলেন। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি গোল্ড ও তাঁর টিমকে নির্দেশ দিলেন আয়রন ডোমের পাশাপাশি স্কাইগার্ড লেসার সিস্টেম তৈরি করা যায় কিনা সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে।

গোল্ড রীতিমতো বিরক্ত হলেন। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম বিশ্বের সব দেশেই করতে হয়। তাই গোল্ডও বারাকের মতে সায় দিলেন। আখের বস্ বলে কথা! রাফায়েলের কর্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল, কারণ হাওয়ায় একটা খবর ভাসছিল- স্কাইগার্ড প্রোজেক্টে যদি সরকার টাকা ঢালে, তাহলে আয়রন ডোমের সমস্ত প্রোজেক্টটা মাঠে মারা যাবে।

'ওরকম কিছু ঘটবে না! চিন্তার কোন কারণ নেই। ওসব স্কাইগার্ড ফার্ড দিয়ে কিস্যু হবে না। এই মুহূর্তে আয়রন ডোমের কোনো বিকল্প নেই,' গোল্ড তাদের আশ্বাস দিলেন।

প্রোজেক্টের কাজ এগোচ্ছিল। আরেকটা নতুন সমস্যার উদয় হল। যদি আয়রন ডোম সফলভাবে বানিয়ে ফেলাও হয়, পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যাটারি আর ইন্টারসেপ্টর মোতায়েন করার জন্য চাই প্রচুর অর্থ।

উপায় কী?

ওয়াশিংটনে যোগাযোগ করা হল। প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। এর কয়েক সপ্তাহ পরে আমোস গিলাডের নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি প্রতিনিধি দল পেন্টাগন পৌঁছল। ডিফেন্স সেক্রেটারির অধীনে মেরি বেথ লং তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকুরিটি অফ ডিফেন্স ফর ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন। লং কোনোমতেই আর কোনো বাড়তি অর্থ ইসরায়েলের হাতে দিতে রাজি ছিলেন না। কারণ মাত্র কয়েক মাস আগেই ইসরায়েলের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে চুক্তি করেছিল, তাতে ইসরায়েল প্রতি বছর তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাবে বলে ঠিক হয়েছিল এবং এই অনুদান চলার কথা ছিল আগামী ১০ বছরের জন্য। লং সাফ জানালেন যে, যদি আয়রন ডোমের জন্য ইসরায়েলের অর্থের দরকার হয়, তাহলে যে তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার তারা বছরে পাচ্ছে সেখান থেকেই ব্যবহার করুক। কিন্তু সেখানেও বাধা। কারণ সরকার তো আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছে যে ওই অর্থ দিয়ে কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট ও মিসাইল কেনা হবে। আরেকটা ব্যাপার হল যে, লং-এর ডিপার্টমেন্ট কেবল এমন অস্ত্রেই ফান্ড দিতে পারে যেটা পরীক্ষিতভাবে সফল। আর আয়রন ডোম তো তখনও পুরোপুরি তৈরিই হয়নি। তবুও একটা সুযোগ মিলল। ইসরায়েলের আয়রন ডোমের প্রোজেক্টটাকে যাচাই করার জন্য তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রবিন র‍্যান্ডকে দায়িত্ব দিলেন।

একটা ট্রাকে করে একটি আয়রন ডোম লঞ্চার ইসরায়েলের দক্ষিণে মিশর সীমান্তে পরীক্ষার জন্য আনা হল। ইন্টারসেপ্টর মিসাইলের নাম দেওয়া হয়েছিল 'তামির'। এত দিনের পরিশ্রমের ফসল যুদ্ধক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী হবে তারই পরীক্ষা। ইন্টারসেপ্টর লঞ্চ করার জন্য তৈরি হল। অপারেটর কাউন্টডাউন শুরু করল: ৫... ৪... ৩... ২... ১। রাফায়েলের টিম, আইডিএফ আধিকারিক, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কর্তা— সবার নজর তখন টিভির পর্দার দিকে। অপারেটর লঞ্চ বাটন টেপার পরও কিছু হল না। আবার প্রেস করা হল লঞ্চ বাটন। এবার আরো জোরে। নাহ্, মিসাইল কোনো সাড়া দিল না! ড্রাকারের তো তখন মাথায় হাত। মিডিয়াতে সব জানাজানি হয়ে গেছে ততক্ষণে। প্রোজেক্টটা কি ব্যর্থ হয়ে গেল? এত দিনের সব পরিশ্রম কি জলে গেল?

সবকিছু গুটিয়ে আবার রাফায়েলের কারখানায় নিয়ে আসা হল। কয়েক দিনের ভেতরই সমস্যাটা শনাক্ত করা গেল। একটা তার কোনো ভাবে খুলে গিয়েছিল। তাতেই এই গড়বড়। নতুন করে আশার আলো জাগলো। দু' সপ্তাহ পরে। আবার সেই টেস্ট রেঞ্জে নিয়ে আসা হল 'তামির'কে। অপারেটর লঞ্চ বাটন প্রেস করল। না, এবার আর কোনো গন্ডগোল নয়। তামির আকাশে উঠল ঠিক যেমনটা চাওয়া হচ্ছিল।

এবার আসল পরীক্ষা বাকি। একটা মিসাইলকে ইন্টারসেপ্ট করে ধ্বংস করে দেখাতে হবে। তবে তো সবাই মানবে এর ক্ষমতা।

২০০৯ সালের কোনো এক দিন। সকাল ১১টা বাজতে একটু বাকি। একটা ডামি কাত্যুসা রকেট লঞ্চ করা হল। জঙ্গিরা এই রকেটই ব্যবহার করে বেশিরভাগ সময় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে। সবার চোখ তখন অপারেটরের স্ক্রিনের ওপর। স্ক্রিনে সঙ্গে সঙ্গে 'এনিমি রকেট লঞ্চ' ডিটেক্ট হল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তামিরকে লঞ্চ করা হল। এক রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি! একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হল। তামির কাত্যুসা মিসাইলকে ধ্বংস করে দেখাল!

একাধিক বার চলল এই টেস্ট। জেনারেল রবিন র‍্যান্ড সবকিছুর ওপরেই নজর রেখেছিলেন। তাঁর ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। আয়রন ডোম প্রায় ৮০% রকেটকেই

ইন্টারসেপ্ট করতে পারল, যা তার কাছে একদম অপ্রত্যাশিত ছিল।

২০০৮ সালে বারাক ওবামা ইজরায়েল আসেন। তখনও অবশ্য তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হননি। তিনি তখন রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী। তিনি স্ট্রেট গিয়ে দেখলেন 'রকেট মর্গ', যেখানে জঙ্গিদের ছোড়া রকেটের অবশেষ সংরক্ষণ করে রাখা আছে। 'আমার ঘরে যদি কেউ এভাবে আক্রমণ করে, তাহলে আমার সর্বশক্তি দিয়ে আমি তা প্রতিহত করব,' স্ট্রেটের রকেট মর্গে দাঁড়িয়ে এটাই ছিল ওবামার উক্তি। স্পেরটে যাওয়ার পর তাঁর ধারণাই বদলে গিয়েছিল। রকেট হামলার ফলে ইসরায়েল যে কতটা জেরবার তার সম্যক ধারণা ওবামার ছিল না। তিনি ঠিক করেন যে, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রূপে নির্বাচিত হলে তিনি ইসরায়েলকে রকেটের বিরুদ্ধে একটা সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অবশ্যই সাহায্য করবেন।

আমেরিকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ইসরায়েলের পক্ষে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ২০০৯ সালে বারাক ওবামা আমেরিকার ৪৪তম রাষ্ট্রপতি রূপে নির্বাচিত হলেন। সেই বছরই এপ্রিলে প্রফেসর কলিন কালকে মিডল ইস্টের ডেপুটি অ্যাসিস্টেন্ট ডিফেন্স সেক্রেটারি পদে বসানো হয়। তিনি ছিলেন বিদেশনীতি বিশেষজ্ঞ। যুদ্ধরত এলাকাগুলোতে শান্তি ফেরানোর দায়িত্ব দেওয়া হল কালের কাঁধে। আর ওবামা বিশেষ ভাবে চাইছিলেন শান্তি স্থাপনের জন্য ইসরায়েল ও প্যালেস্টাইনকে এক টেবিলে বসাতে। ইসরায়েল ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক থেকে তখনই সেনা সরাতে চায়নি। কয়েক বছর আগে গাজা থেকে সেনা সরিয়ে যে ভুল তারা করেছিল, তারা তার পুনরাবৃত্তি চাইবে না এটাই স্বাভাবিক ছিল। তাই আয়রন ডোম একটা সমাধানের পথ হতে পারত। কাল আয়রন ডোমের ব্যাপারে বেশ আগ্রহী ছিলেন। তিনি ন্যাশনাল সিকুরিটি কাউন্সিলের মিডল ইস্ট পলিসির প্রধান ড্যান শাপিরোর কাছে এই ব্যাপারটা উত্থাপন করলেন। এই ড্যান শাপিরো খুব শীঘ্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসাবে ইসরায়েলে যাচ্ছেন। দুজনে আলোচনা করে আয়রন ডোম প্রোজেক্টকে যাচাই করার জন্য একটা টিম পাঠালেন ইসরায়েলে। এই টিম ফিরে এসে আয়রন ডোমের ভূয়সী প্রশংসা করে। কাল দেখলেন যে, এবার কিছু একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে।

২০০৯-এর জুন মাসে তিনি নিজেই ইসরায়েল গেলেন। লেবাননের সীমানা ও গাজা ভূখণ্ডের সীমানা এলাকায় গেলেন। সেখানে তিনি দেখলেন কীভাবে রকেট হামলার ফলে সাধারণ ইসরায়েলি নাগরিকদের জীবন বিপন্ন। তিনি আমেরিকা ফিরেই সঙ্গে সঙ্গেই আয়রন ডোমের জন্য ২০০ মিলিয়ন ডলার আয়রন ডোম ফান্ডিংয়ের জন্য সুপারিশ করলেন। তাঁর যুক্তি ছিল সোজাসাপটা। আয়রন ডোম মোতায়েন হলে ইসরায়েলের নাগরিকরা সুরক্ষিত থাকবে। ফলে ইসরায়েলেরও পালটা আক্রমণে যাওয়ার দরকার পড়বে না। শান্তি স্থাপনের জন্য এটা একটা বড় পদক্ষেপ হতে পারে।

অবশেষে সমস্ত বাধাবিপত্তি পেরিয়ে ২০১১ সালের মার্চ মাসে আইডিএফ-এর বীরসেবা নামক জায়গার বাইরে প্রথম আয়রন ডোম মোতায়েন করে। বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না। ৭ এপ্রিল আয়রন ডোম তার প্রথম শিকার করল এবং কয়েক দিনের মধ্যেই ধ্বংস করল আরও ৮টা রকেট। আয়রন ডোম আসার পর পুরো খেলাটাই ঘুরে গেল। গাজা থেকে ফায়ার করা রকেটগুলোর মধ্যে প্রায় ৯০% রকেটই আয়রন ডোম বিধ্বস্ত করে দেখাল। আর এর ফলে আইডিএফ-এর গাজাতে সেনা অভিযানের মাত্রাও কমতে থাকল। ২০১২তে আইডিএফ গাজাতে কোনো সেনা অভিযানই করেনি। ২০১৪তে করেছিল একটা ছোট অপারেশন। আমেরিকা ও ইসরায়েল সম্মিলিতভাবে আয়রন ডোম তৈরি করছে এখন। ২০১৮ সালের এপ্রিল থেকে এখন পর্যন্ত আমেরিকা ইসরায়েলের আয়রন ডোমের জন্য খরচ করেছে ১.৩৯৭ বিলিয়ন ডলার। আয়রন ডোমের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। ইসরায়েল প্রথম বাইরের দেশ হিসাবে আজারবাইজানকে আয়রন ডোম

বিক্রি করে ২০১৬ সালে। রোমানিয়া এবং ভারত আয়রন ডোম কেনার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। কাতার, বাহরিন এবং সৌদি আরব আয়রন ডোম কেনার জন্য আগ্রহী।

একটা আয়রন ডোম ব্যাটারি ১৫০ বর্গ কিমি এলাকা সুরক্ষিত করতে পারে। ইসরায়েলে ২০১৯ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত ১০টা ব্যাটারি সক্রিয় ছিল। আরও ৫টা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে ইসরায়েলের। এই ৫টা হাতে এলে মোটামুটি পুরো দেশটাই মিসাইল হামলার হাত থেকে সুরক্ষিত করা যাবে।

আয়রন ডোম যখন প্রথম মোতায়েন করা হয়, তখন ইসরায়েলের তরফে ভাবা হয়েছিল যে, রকেট হামলা করে ইসরায়েলের ক্ষতি করতে না পেরে হামাস হয়তো রকেট হামলা বন্ধ করে দেবে।কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ইসরায়েলের শত্রুরা তাদের রকেট ও মিসাইলের ভাণ্ডার বাড়িয়েই চলেছে। ইসরায়েলের ইন্টেলিজেন্সের তথ্য অনুযায়ী হিজবুল্লাহ জঙ্গিদের কাছে মজুদ আছে ১,০০,০০০-এরও বেশি মিসাইল ও রকেট। হামাসের কাছে আছে প্রায় ১০,০০০। হিজবুল্লাহর কাছে আজ আরও লং রেঞ্জের মিসাইল রয়েছে, যা টার্গেটকে একেবারে নির্ভুলভাবে আঘাত করতে পারে।

ইসরায়েলে এখন মাঝারি রেঞ্জের মিসাইল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তৈরি হচ্ছে 'ডেভিড'স্ স্লিং সিস্টেম' আর লং রেঞ্জের মিসাইলের জন্য ডেভলপ হচ্ছে 'অ্যারো ইন্টারসেপ্টর সিস্টেম'।

২০১১ সালের পর আয়রন ডোম ৮৫% রকেট আক্রমণ সফলভাবে প্রতিহত করেছে। আয়রন ডোমেরও রকেট হামলা প্রতিরোধ করার একটা সীমাবদ্ধতা আছে।

সেটা কেমন ব্যাপার?

মানেটা এরকম, একটা আয়রন ডোম এক ঘণ্টায় যতগুলো মিসাইল বা রকেট ইন্টারসেপ্ট করতে পারে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক রকেট ছুড়লেই কিছু রকেট টার্গেটে আঘাত হানবেই। এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আর তার সুযোগ নিয়েই জঙ্গিরা ইসরায়েলে ধ্বংসলীলা চালাতে চাইছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ২০১৯ সালের মে মাসের ৫ তারিখ, সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে আসদদকে টার্গেট করে ১১৭টা রকেট ফায়ার করে জঙ্গিরা। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, কারণ আয়রণ ডোমের ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছিল ব্যাপারটা।

তাহলে প্রশ্ন হল, এর শেষ কোথায়? শান্তির পরিবেশ কি কোনো দিন বাস্তব হবে না ইসরায়েলের জন্য?

উত্তর এখনও অজানা। তবে একটা জিনিস ইসরায়েল শিখে গেছে। সেটা হল বিপদে পড়লে নতুন কিছু আবিষ্কার করে বিপদ থেকে নিজেকে টেনে তোলা। প্রাক্তন মিসাইল ডিফেন্স এজেন্সির প্রধান যে কথাটি বলেছিলেন, সেটাই আজ সবথেকে বেশি প্রাসঙ্গিক— আমরা হয় আবিষ্কার করব, না হয় নিশ্চিহ্ন হব!

আপনার টুথপেস্টে কি বিষ আছে

অপারেশন এন্টাবে ইসরায়েলের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় পর্ব। সুধী পাঠক, সেই অপারেশনের বিবরণ হয়তো পরে কখনো, কোথাও দেওয়া সম্ভব হবে। শুধু জেনে রাখুন, এক দল ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদী একটি ফ্রেঞ্চ এয়ারবাসকে উগান্ডায় হাইজ্যাক করে নিয়ে গিয়েছিল এবং ইহুদি যাত্রীদের বন্ধক বানিয়ে রেখেছিল। দুর্ধর্ষ একটি রেসকিউ অপারেশনের মাধ্যমে সেই সব যাত্রীদের ছাড়িয়ে আনা হয়। তারই নাম ছিল অপারেশন এন্টাবে। আর এই হাইজ্যাকিংয়ের মাস্টারমাইন্ড ছিল যে ব্যক্তি, তার নামটা এই অধ্যায়ে ছেয়ে থাকবে, মেঘের মতো। নাম তার ওয়াদি হাদ্দাদ।

ইসরায়েল নিজের শত্রুদের কথা বিশ্বাস করে এবং তাদের ভোলে না। হাদ্দাদের কুকর্ম ভোলেনি ইসরায়েল। বদলা নিয়েছিল। হাদ্দাদকে কষ্ট দিয়ে মেরেছিল তারা।

কিন্তু কীভাবে?

বিষের প্রয়োগে।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই আপনার ভ্রূ কুঁচকে যাচ্ছে হয়তো। মুখে ফুটে উঠছে বিরক্ত ভাব। আপনি হয়তো ভাবছেন, এই বিশ্বের নানা প্রান্তে হাজার একটা মানুষকে বিষের প্রয়োগে হত্যা করা হয়। সেগুলোর বেশিরভাগটাই কোনো ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কাজ নয়, আবার কিছু কিছু ঘটনায় ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির যোগ মেলেও। কিন্তু বিষের প্রয়োগ দ্বারা হত্যা অতি সাধারণ একটি বিষয়। আর এমন একটি বিষয়কে আলাদা করে গুরুত্ব দিয়ে অধ্যায়ে পরিণত করার কী আছে?

আছে আছে। এগোনো যাক।

অপারেশন এন্টাবে'র ঠিক দেড় বছর পরে বিষক্রিয়ায় ওয়াদি হাদ্দাদের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর সময়ে হাদ্দাদ ইরাকে ছিল। ইরাকের ইনটেলিজেন্স এজেন্সি তথা ইরাকি ফোর্সের নজরদারিতে থাকা হাদ্দাদকে কীভাবে বিষ দিল ইসরায়েল? ইসরায়েলের মাটি থেকে হাজার হাজার কিমি দূরে থাকা একটা মানুষকে বিষের প্রয়োগে মারা কি অতই সহজ কাজ ছিল?

হাদ্দাদের মৃত্যুর পর পোস্টমর্টেম হয়েছিল। দেশ-বিদেশের বড় বড় ডাক্তারেরা তবুও খুঁজে বের করতে পারলেন না যে ঠিক কোন বিষ দেওয়া হয়েছে হাদ্দাদকে। এই হল ইসরায়েল তথা তার গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের বিশেষত্ব, যে কাজটা করার পর দুনিয়াবাসীকে জানাতে হবে তা সদর্পে জানায়, আর যেটা গোপনে রাখতে হবে তা গোপনেই রাখে। লক্ষ চেষ্টা করলেও সেই ইতিহাস খুঁড়ে বের করে আনার সাধ্য কারো নেই।

তবে এসবের আগে মোসাদের হাতে নিহত এই মহামানবটিকে একটু চিনে নেওয়া যাক। জন্মসূত্রে আবু হানি নাম থাকলেও শত্রু-মিত্র সকলেই একে চেনে ওয়াদি হাদ্দাদ হিসাবে। ফরসা, গোলগাল চেহারার মানুষটাকে দেখলে কেউ ভাবতেই পারবে না তার কুকর্মের কথা। আসুন জেনে নিই পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন নামক সন্ত্রাসবাদী সংস্থার এই নেতার কালো ইতিহাসটাকে—

-ইসরায়েলের নাগরিক এবং সম্পত্তির ওপরে একাধিক বার আক্রমণ।

-ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর গ্রুপকে সমানে ইসরায়েল-বিরোধী কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ করা।

-ডসন'স ফিল্ড হাইজ্যাকিং, ১৯৭০ সাল।

-১৯৭৫ সালের ২১ ডিসেম্বর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে ওপেক কনফারেন্সে সন্ত্রাসবাদী হামলার পরিচালনা।

-এন্টাবে হাইজ্যাকিং, ১৯৭৬ সাল।

কিন্তু কয়েকটা বড় প্রশ্নও ওঠে : ইয়াসের আরাফাতের এই চেলাকে মারার সিদ্ধান্ত ঠিক কখন নিল ইসরায়েল? কেনই বা নিল? ইয়াসের আরাফাতকেই বা শেষ করার চেষ্টা করা হল না কেন?

আসলে ইয়াসের আরাফাত জাতিসংঘের মঞ্চ থেকে ভাষণ দেওয়ার পর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁকে হত্যা করার একাধিক সুযোগ পেয়েও ইসরায়েল সরে এসেছে। স্নাইপারের নিশানায় পেয়েও তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল ইসরায়েল। কারণ তাঁকে হত্যা করলে আন্তর্জাতিক বিরোধ আসতে পারত। এছাড়াও ইসরায়েলের পক্ষ থেকে আমেরিকাকে কথা দেওয়া হয়েছিল যে, ইয়াসেরকে তারা হত্যা করবে না। অবশ্য সেই কথা কতখানি রক্ষিত হয়েছে তা-ও আমরা দেখে নেব পরবর্তীতে।

যাইহোক, এসব রাজনৈতিক টালবাহানা করতে করতেই একটা সময়ে ইসরায়েলের হিটলিস্ট থেকে আরাফাতের নামটা মুছে দিয়ে লিখে ফেলা হল ওয়াদি হাদ্দাদের নাম।

আমরা ফিরে আসব মানুষরূপী এই শয়তানের নিধনপর্বে। এন্টাবে হাইজ্যাকিং পর্বের পরে প্রায় আঠারো মাস কেটে গিয়েছিল। বাগদাদ, বেইরুটে মজায় দিন কাটাচ্ছিল হাদ্দাদ। আর ওদিকে হিটলিস্টের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য ইসরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদ নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিল। লক্ষ্য তখন হাদ্দাদ। কিন্তু একটা বড় সমস্যা ছিল। বাগদাদ, দামাস্কাস কিংবা বেইরুটের মাটিতে বোমা-বন্দুক চালিয়ে হাদ্দাদকে নিকেশ হয়তো করা যেত, কিন্তু তারপর সেখান থেকে মোসাদ এজেন্টদের প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসা ছিল কার্যত অসম্ভব।

তাহলে কী উপায়?

এমন কোনো পন্থার প্রয়োজন ছিল যাতে হাদ্দাদের মৃত্যুকে স্বাভাবিক মনে হয়। যেমন: অসুস্থতা কিংবা গাড়ি দুর্ঘটনা এবং এসব ক্ষেত্রেও যদি কোনো ভাবে হাদ্দাদ প্রাণে বেঁচে যেত ও তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জন্মাত তবে কার্যরত এজেন্টদের জান কয়লাই হত বলে মনে করেছিল ইসরায়েল তথা মোসাদ কর্তৃপক্ষ।

মোসাদ কাজ করে গোড়া মেরে। ঠিক হল বিষ প্রয়োগ করা হবে। যার ফলে মনে হবে হাদ্দাদ অসুস্থ হয়ে মারা গেছে। এক্ষেত্রে তারা হাদ্দাদের সংস্থার সর্ষের মধ্যেই ভূত ঢোকাল। হাদ্দাদের কাছের কোনো লোককে কাবু করে ফেলল তারা। সেই ব্যক্তির নাম পরেও সামনে আসেনি। মোসাদের খাতায় অবশ্য তার নাম হিসাবে লেখা হয়েছিল 'এজেন্ট স্যাডনেস'। হাদ্দাদের বাসগৃহ এবং অফিসে এই এজেন্ট স্যাডনেসের গতিবিধি ছিল অবাধ।

খাবারের মধ্যে বিষ দেওয়া যেতে পারত, পানীয়ের মাধ্যমেও বিষের প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু তা করা হল না। কারণ এভাবে হঠাৎ বিষক্রিয়াতে হাদ্দাদ অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই অসুস্থতাকে 'স্বাভাবিক নয়' ধরে এগিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ হয়ে যেত। এ ধরনের কোনো ঝুঁকিই নেয়নি মোসাদ।

তাহলে কীসে দেওয়া হল বিষ?

দাঁতের মাজনে, টুথপেস্টে।

বিশ্বস্ত সূত্র বলছে, ১৯৭৮ সালের ১০ জানুয়ারি হাদ্দাদের টুথপেস্টের টিউবটাকে সরিয়ে ঠিক অমনই একটা টিউব রেখে দেয় এজেন্ট স্যাডনেস। আর ওই মাজনের মধ্যেই বিষ ছিল। প্রাণঘাতী বিষ!

তেল আভিভের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের অবস্থিত নেস জিওনার ইসরায়েল ইনস্টিটিউট ফর বায়োলজিক্যাল রিসার্চ, ইসরায়েলের এই জাতীয় অপারেশনের জন্য ঘাতক বিষ তৈরি করে। ইসরায়েলের বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারকে সেই ১৯৫২ সাল থেকে সামলাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান। নিখুঁত ভাবে।

হাদ্দাদ যখনই দাঁত মাজত, তখনই মাজনের মধ্যে থাকা মারাত্মক ওই বিষ অতি অল্প মাত্রায় ওর মুখের মধ্যেকার মিউকাস পর্দা ভেদ করে মিশে যেত ওর রক্তে। এভাবে রক্তে অল্প অল্প করে মিশতে থাকা বিষ এক সময়ে নিজের খেলা দেখাতে আরম্ভ করে দেয়। অসুস্থ হয়ে পড়ে ওয়াদি হাদ্দাদ।

ইরাকের সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এই জঙ্গি নেতাকে। প্রাথমিক ভাবে হাদ্দাদ চিকিৎসকদের জানিয়েছিল যে, জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই খাওয়ার পর থেকে ওর তলপেটে ব্যথা হচ্ছিল। সঙ্গে কমছিল খিদেও। ওজন কমে গিয়েছিল ১০ কেজির মতো।

ডাক্তারেরা বললেন হেপাটাইটিস। পরের দিকে সংক্রমণ ছড়াল। জ্বর। অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হল। কাজ হল না। মাথার চুল ঝরতে লাগল। জ্বর বাড়ল। এবার ভ্রূ কোঁচকালেন চিকিৎসকেরা। সন্দেহ করা হল যে, সম্ভবত বিষ দেওয়া হয়েছে হাদ্দাদকে।

আরাফাতের ডান হাত হাদ্দাদ। সে অসুস্থ হলে তো আরাফাত চিন্তিত হবেনই। স্বাভাবিক উদ্বেগ নিয়ে তিনি যোগাযোগ করলেন স্টাসির সঙ্গে। ইস্ট জার্মানির এই সিক্রেট সার্ভিস কিন্তু সমানে ইসরায়েলের শত্রু প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন সন্ত্রাসমূলক কাজ, সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোকে সাহায্য করত। কখনো জাল পাসপোর্ট বানিয়ে দিত, কখনো দিত আশ্রয়, আবার কখনো অস্ত্র জোগাত তাদের।

১৯৭৮ সালের ১৯ মার্চ হাদ্দাদকে ইস্ট জার্মানিতে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ওয়াদি হাদ্দাদের জীবনের অন্তিম এই ফ্লাইটের আগে তার সঙ্গীরা তার ব্যাগ গুছিয়ে দিয়েছিল। সঙ্গে যত্ন করে তুলে দিয়েছিল ওই বিষাক্ত মাজনের টিউবটাকেও।

মোসাদের কাছে খবর এল, পূর্ব জার্মানিতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলেও হাদ্দাদকে বাঁচানো আর সম্ভব হবে না। ডাক্তাররা বলে দিলেন, 'হি ইজ আ ডেড ম্যান ওয়াকিং।'

আহমেদ দৌকলি ছদ্মনাম দিয়ে হাদ্দাদকে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মোসাদের কাছে খবর আসা আটকানো সম্ভব হয়নি। দেহের ভেতরে- বাইরে নানা স্থানে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। হার্টের পেরিকার্ডিয়ামে হেমোরেজ দেখা দিল। চোখে, টনসিলে, ফুসফুসের আবরণে, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ আরম্ভ হল। প্রস্রাবে আসতে থাকল কাঁচা

রক্ত। রক্তে হু হু করে কমতে থাকল অণুচক্রিকার সংখ্যা।

অজস্র টেস্ট করা হল। ব্লাড, ইউরিন, বোন ম্যারো, এক্স রে কিন্তু কিস্যু হল না। হবে কী করে? বিষটাকেই তো চিহ্নিত করা যাচ্ছিল না।

কেউ বলছিলেন র‍্যাট পয়জন। কারো মত ছিল ভারী কোনো মৌল ব্যবহার করা হয়েছে হয়তো। থ্যালিয়াম প্রয়োগের কথাও উঠল। শোনা যায়, হাদ্দাদ যন্ত্রণার চোটে এমন উন্মত্ত ভাবে চিৎকার করত যে সারা হাসপাতাল জুড়ে শোনা যেত তার আর্তনাদ। কড়া ডোজের ট্রাংকুইলাইজার দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হত ইসরায়েলের এই মহাশত্রুকে।

দশ দিন ধরে চিকিৎসার সবরকম চেষ্টা চালানোর পর অবশেষে হার মানল হাদ্দাদ। যবনিকা পাত হল আরাফাতের পোষা কুকুরের জীবনে। অটোপসি রিপোর্ট বলছে, ব্রেইন ব্লিডিং, নিউমোনিয়া এবং প্যানিমাইলোপ্যাথির ফলে মৃত্যু হয়েছিল।

তখন গুজব ছড়িয়েছিল বিষটা নাকি দেওয়া হয়েছিল চকোলেটের মাধ্যমে, কারণ হাদ্দাদ চকোলেট খেতে খুব পছন্দ করত। কিন্তু পরে বিশদ গবেষণায় সেই তত্ত্বকে খারিজ করে এই টুথপেস্ট থিওরি এসেছে এবং সম্ভবত তা ভুল নয়।

ইসরায়েল বা মোসাদ কখনোই হাদ্দাদকে হত্যা করার দায় স্বীকার করেনি। তবে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে ব্যাপারটাকে ‘খুশির খবর’ বলে প্রকাশ করা হয়েছিল। কারণ ইসরায়েল বলে থাকে, ‘যাদের হাতে ইহুদিদের রক্ত লেগে থাকে আমরা তাদের ছেড়ে কথা বলি না।’ হাদ্দাদকেও ছেড়ে কথা বলা হয়নি!

একটি হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে

মার্চ মাসের সন্ধে। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস। উকলে ডিসট্রিক্টের ২৮ অ্যাভিনিউ ফ্রাংকোইস ফোলির একটি লাক্সারি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। সাত তলার একটা ফ্ল্যাটের দরজার বাইরে উলটে পড়ে আছে ফুলদানি। কতগুলো ডাঁটিসমেত ফুল ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র। একটা কালো রঙের গালচের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে এক ভদ্রলোকের লাশ। রক্ত শুকিয়ে চাপ হয়ে বসেছে গালচের ওপর। দাগ বোঝা যাচ্ছে না, কালচে রঙের গালিচায় জমাট বাঁধা রক্তের কালো দাগ, বোঝা যাবেই বা কীভাবে? ঠিক যেমন পুলিশ ধরতে পারছে না হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে কারা আছে।

ব্রাসেলস পুলিশ শেষ অবধি একটা সিন তৈরি করতে সক্ষম হয়। তাদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ভদ্রলোক নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পকেটে চাবি হাতড়াচ্ছিলেন। সন্ধে নেমে আসছিল দ্রুত। তার আগেই গণ্ডাখানেক চাবির মধ্যে থেকে আসল চাবিটা বের করে আনতে চাইছিলেন উনি।

পকেটে অতগুলো চাবি থাকার কারণ কী?

নিজের বাড়ির সুরক্ষা ব্যবস্থাটা একটু বেশিই আঁটোসাঁটো করে রেখেছিলেন ভদ্রলোক। অবশ্য করবেন না ই বা কেন? মাস কয়েক আগে, শীতকালে ওঁর বাসাতে অনুপ্রবেশ করেছিল কেউ বা কারা। না, কিছু চুরি যায়নি। যারা ওঁর অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেছিল, তারা কেবল সমস্ত আসবাব ভেঙেচুরে রেখে গিয়েছিল, ওলটপালট করে দিয়ে গিয়েছিল হাতের সামনে পাওয়া সমস্ত জিনিস। কী অদ্ভুত, তাই না?

এ ধরনের অনুপ্রবেশ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ তবে কী ছিল?

সাবধান করা। হ্যাঁ, ওই ভদ্রলোককে সাবধান করে দেওয়া।

কিন্তু কে এই ভদ্রলোক? কারাই বা সতর্ক করতে চাইছিল ওঁকে?

জেরাল্ড বুল। ডক্টর জেরাল্ড বুলকে সতর্ক করে দিতে চাইছিল কেউ বা কারা। সতর্ক হয়েও উঠেছিলেন উনি। আর তাই হাজার একটা তালা-চাবি ব্যবহার করে সিকিওর করেছিলেন বাসার দরজা। সেই চাবিই হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন নিজের কোটের পকেটে। আর সেই সময়েই পিছন দিক নিঃশব্দে এগিয়ে এল একজন ব্যক্তি। অন্ধকার থেকে তার পিছু পিছু বেরিয়ে এল আরও দুটি ছায়ামূর্তি।

প্রথম জন বলল, ‘হ্যালো ডক্টর! মে উই হেল্প ইউ?’

প্রশ্নটা শুনে অবশ্য ঘাড় ঘোরাবার সময়টুকুও পাননি ডক্টর বুল। তার আগেই সাইলেন্সার লাগানো ৭.৬৫ পিস্তল থেকে পাঁচ পাঁচটা গুলি এসে বিদ্ধ করল ডক্টরের মাথা। মাটিতে আছড়ে পড়লেন ডক্টর জেরাল্ড বুল।

১৯৯০ সালের ২২ মার্চ ডক্টর বুলের নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল একজন একনায়কের স্বপ্ন এবং এখানেই জন্ম নিল সবথেকে বড় প্রশ্ন: কে বা কারা ছিল এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে?

কেউ বলল, এমআই ৬ হত্যা করেছে বুলকে। কেউ কেউ আঙুল তুলল সিআইএ-এর দিকে। ইরান, অ্যাঙ্গোলার মতো রাষ্ট্র চলে এল সন্দেহের তালিকায়। এমন কথাও রটে গেল

ইরাকের একনায়ক সাদ্দাম হোসেনের কোপে পড়েই নিহত হয়েছেন বুল। কিন্তু এই সব কিছুর নেপথ্যে একটা নাম বার বার উঠে এসেছে— মোসাদ। যদিও এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে মোসাদের উপস্থিতির কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজও মেলেনি।

এই রহস্যময়তাই পুরো ঘটনাটাকে করে তুলেছে আকর্ষণীয়। কারো কাছে এই গাথা জয়ের, কেউ বা শুনেছে শুধুই নিজের পরাজয়ের কাহিনি। এই পুরো ঘটনা পরম্পরাকে প্রথম থেকে না জানলে বোঝাও যাবে না।

১৯৬৫ সাল। জেরাল্ড বুল তখন বছর সাঁইত্রিশের যুবক, কানাডায় মন্ট্রিয়েলের ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির একজন সম্ভাবনাময় অধ্যাপক। বুলের নাম ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল একজন জিনিয়াস হিসাবে। হবে নাই বা কেন? মাত্র তেইশ বছর বয়সে কানাডার ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করার মতো প্রতিভাকে একটাই শব্দে সম্মান দেওয়া যেতে পারে— জিনিয়াস।

ক্লাস শেষ করে লাইব্রেরির দিকে এগোচ্ছিলেন বুল। এমন সময় পিছন থেকে মহিলা কণ্ঠে কেউ ডাকলেন, 'হ্যালো জেরাল্ড...

ফিরে তাকালেন বুল। সামনে দেখতে পেলেন এক ষাটোর্ধ্ব মহিলাকে। ভদ্রমহিলার দিকে এগিয়ে গিয়ে বুল বললেন, 'হ্যালো। আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না?'

'আপনি আমাকে চিনবেন না। তবে আমি আপনাকে ঠিকই চিনেছি। ইউ আর জিনিয়াস জেরাল্ড!'

লজ্জায় মাথা নীচু করে নিলেন বুল। মুখে বললেন, 'লোকে ওই বলেই ডাকে। তা আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি ম্যাডাম?'

ভদ্রমহিলার কথার টানে ধরা পড়ছিল যে, উনি একজন জার্মান। নিজেকে পরিচয় দিলেন ফ্রিজ রউসেনবার্জারের আত্মীয়া হিসাবে।

'রউসেনবার্জার? ফ্রম ক্রুপ ইন্ডাস্ট্রিজ?' প্রশ্নের সুরে বললেন বুল।

'হ্যাঁ....

খানিকক্ষণ অবাক ভাবে জেরাল্ড বুল তাকিয়ে রইলেন ওই ভদ্রমহিলার দিকে। তারপর বললেন, 'কিন্তু ম্যাডাম, আপনি আমাকে কেন খুঁজছেন?'

এরপর শুরু হল আরেক জিনিয়াসের হারানো পাণ্ডুলিপির কথা বলা। ভদ্রমহিলা নিজের পারিবারিক সূত্রে একটি ম্যানুস্ক্রিপ্ট খুঁজে পেয়েছিলেন। তাতে ছিল এমন এক বন্দুকের নির্মাণ কৌশল এবং চালনার পদ্ধতি, যার সাহায্যে বহু দূরের লক্ষ্যকে ভেদ করা সম্ভব। এমনকী সম্ভব মহাকাশে রকেট প্রেরণ করাও।

সুপারগান— এক কিংবদন্তী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে মিথ হয়ে যাওয়া এই শব্দবন্ধকে নিয়ে মানুষের ভয়, আগ্রহ, কৌতূহল কোনোটারই সীমা ছিল না। আর এর সূত্রপাত হয়েছিল ১৯১৮ সালের ২৩ মার্চ। প্যারিস শহরের প্লেস ডি লা রিপাবলিকের কাছে বিধ্বংসী একটি গোলা এসে পড়ে। এক ঘণ্টা পরে আরও একটা। আট জন নিহত হলে নিদারুণ আতঙ্কে ভুগতে থাকে প্যারিসের বাসিন্দারা। সীমান্ত থেকে বেশ দূরবর্তী এলাকায় বলে প্যারিসের অধিবাসীদের মনে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে কখনোই এত চিন্তা দানা বাঁধেনি। কিন্তু এবারে

গল্পটা বদলে যাচ্ছিল। প্যারিস ডিসট্রিক্টের কম্যান্ডার চেলে ফেললেন শহর সংলগ্ন জঙ্গল। ওঁর ধারণা ছিল জার্মান বাহিনী লুকিয়ে থেকে এসব কাণ্ডকারখানা ঘটাচ্ছে। কিন্তু কোনো সূত্র মিলল না। কেউ কেউ বলছিল, হয়তো এয়ারশিপ বা জেপ্পেলিনে চড়ে বোমা ফেলে পালিয়েছে জার্মান সেনারা। কিন্তু কেউ তো তেমন কিছু প্রত্যক্ষ করেনি। তাই সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হল।

বিভীষিকা কিন্তু থামল না। এই ঘটনার পর ২৯ মার্চ গুড ফ্রাইডের দিনে প্যারিসের সেন্ট গারভেইস চার্চে আঘাত হানল অদৃশ্য প্রতিপক্ষ। আক্রমণের ফলাফল ছিল মারাত্মক— ৯১ জন নিহত হয় এবং আহত ব্যক্তির সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়ায় কয়েকশো।

কিছুতেই কোনো সূত্র মিলল না। কল্পবিজ্ঞানের গল্পের পাতা থেকে উঠে এল এক বিশালাকার বন্দুকের থিওরি। সুপারগান! কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো তথ্য দিতে পারল না।

যুদ্ধ সম্পাত হল। এবার বেরিয়ে আসতে লাগল নানা খুচরো কথা। জার্মানি নাকি সত্যিই সুপারগান আবিষ্কার করে ফেলেছিল এবং তার মাধ্যমেই চালিয়েছিল ওই আক্রমণ। জার্মানির সম্রাট তখন দ্বিতীয় উইলহেম। তাই লোকমুখে ওই বন্দুকের নাম দাঁড়াল 'উইলহেম গান'। শোনা গেল, জার্মানির ক্রুপ ইন্ডাস্ট্রিজই তিন তিনটি সুপারগান বানিয়েছিল। ক্রুপ ইন্ডাস্ট্রিজের তৎকালীন ডিরেক্টর অব ডিজাইন ছিলেন ফ্রিজ রউসেনবার্জার। স্বাভাবিক ভাবেই সুপারগানের নকশা তাঁর আয়ত্বে ছিল। যুদ্ধ শেষ হলে ক্রুপ ইন্ডাস্ট্রিজের পক্ষ থেকে তিনটি বন্দুককে মালগাড়িতে করে গোপন কোনো স্থানে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। এক একটি বন্দুককে স্থানান্তরিত করতে ৮০ জন সৈন্য লেগেছিল বলেও জানা যায়। একটি বন্দুককে প্রতিপক্ষ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। সেটাকে নষ্ট করার সময়ে বিস্ফোরণ ঘটে এবং ৫ জন সৈন্য ও নিহত হয়। বাকি দুটির হদিশ আর মেলেনি।

এখানেই থমকে যায় 'সুপারগান পর্ব'। ১৯৬৫ সালে জেরাল্ড বুলের সঙ্গে ওই জার্মান ভদ্রমহিলার সাক্ষাৎকারের পর থেমে দাঁড়ানো সেই অধ্যায়ের চাকা আবার গড়াতে আরম্ভ করে দেয়। নিজের স্বপ্নকে পূরণের পথে এগোতে থাকেন বুল। ভদ্রমহিলার দেওয়া পাণ্ডুলিপিটাকে ভিত্তি করে লিখে ফেললেন একটা আস্ত বই। বিষয়— উইলহেম গান বা সুপারগান।

থিওরি নাহয় মিলল। এবার দরকার ছিল প্র্যাকটিকাল করে দেখার। তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় ছিল বিপুল অর্থ। ইউনাইটেড স্টেটস এবং কানাডার সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্য করা হল। নিজের বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ফান্ডিং পেলেন ডক্টর বুল। বার্বাডোজের কোনো একটি দ্বীপে সফল পরীক্ষা করে দেখালেন বুল। কয়েকশো শ্রমিক, এঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদদের সাহায্য নিয়ে উনি বানিয়ে ফেললেন ৩৬ মিটার লম্বা সুপারগান। ২০০ পাউন্ড ওজনের মিসাইলকে ২৫০ কিমি উচ্চতা অবধি ছোড়া বা ৪,০০০ কিমি পরিধির মধ্যে ফায়ার করতে সফল হলেন বুল। সকলে চমৎকৃত হলেন। আমেরিকার সাম্মানিক নাগরিকত্ব দিয়ে দেওয়া হল বুলকে। কিন্তু বাধ সাধল মিডিয়ায় এই সুপারগানের বহুল প্রচার। ইন্টারন্যাশনাল নিউজ হয়ে গেল। ইউএস এবং কানাডা সরকার তখন বিপদে পড়ে এই প্রোজেক্টের ফান্ডিং বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল। বুল তখন অস্ত্রের বেআইনি কারবার আরম্ভ করেন। আমেরিকা আর ইসরায়েলের জন্য বানান আর্টিলারি শেল। লং রেঞ্জ শট নেওয়ার মতো বন্দুক বানিয়ে বিক্রি করতে থাকেন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশকে। বিষয়টা ইউনাইটেড নেশনসের নজরে আসে। আইনত নিষিদ্ধ একটা ব্যবসা চালানো হচ্ছে দেখে ইউএন বাধা দেয়। সিআইএ প্রথম থেকে সব কিছু জানা সত্ত্বেও ইউএন-এর বার্তা দেখা মাত্র পুরো ব্যাপারটা থেকে একটা দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা আরম্ভ করে দিল। কিন্তু ধোঁয়া যখন

উঠেছেই তখন আগুনও দেখাতে হবে। ইউনাইটেড নেশনসের চাপে পড়ে বলির পাঁঠা করা হল ডক্টর জেরাল্ড বুলকে। বুলকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে মোকদ্দমা চালাল ইউএস গভর্নমেন্ট। ছ' মাসের কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৫৫,০০০ ইউএস ডলারের জরিমানা করা হল বিজ্ঞানীকে।

ভয়ানক মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন বুল। উনি চরম নৈরাশ্যের মধ্যে ডুবে যেতে থাকেন। আমেরিকা ছেড়ে বুল ফিরে আসেন বেলজিয়ামে। নিজের কোম্পানি খুলে বসেন। আর স্বপ্ন দেখতে থাকেন— 'একদিন সুপারগান বানিয়েই ছাড়ব!'

নিজের স্বপ্নটাকে পূরণ করার জন্য যে কোনো চরম মূল্য দিতেও উনি রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। শয়তানের কাছে নিজের আত্মা বিকিয়ে দিতেও পিছপা ছিলেন না ডক্টর বুল। দুনিয়ায় কোনোদিনই এ ধরনের কাজের জন্য শয়তানদের অভাব ঘটেনি, এবারেও ঘটল না। বুল হাত বাড়াতেই সঙ্গী পেয়ে গেলেন ইরাকের একনায়ক সাদ্দাম হোসেনকে।

সাদ্দাম হোসেন তখন মধ্যগগনের সূর্য। প্রখর তেজ, প্রবল প্রতাপ নিয়ে শাসন করে চলেছেন ইরাকের ভূমি। আটের দশকে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল ইরাকের। অস্ত্রের প্রয়োজন স্বাভাবিক ভাবেই ছিল। অস্ট্রিয়া থেকে ২০০ জিসি ৪৫ বন্দুক চোরাপথে জর্ডনের আকাবা বন্দরে পৌঁছে দিলেন বুল। সুবিধা পেল ইরাকি বাহিনী। আর এখান থেকেই সাদ্দামের নয়নের মণি হয়ে উঠলেন জেরাল্ড।

কিন্তু সাদ্দাম হোসেনের লক্ষ্য আরও বড় ছিল। কিছু দিন আগেই ইসরায়েল ইরাকের তামুজ পরমাণু কেন্দ্রটিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তাতেও হাল ছাড়েননি সাদ্দাম। ইরাককে পরমাণু শক্তিধর দেশে পরিণত করা হয়ে উঠেছিল ওঁর ধ্যান, জ্ঞান।

বুলের সঙ্গে কথোপকথন চলার পর বুল সাদ্দামকে জানালেন, 'আমি আপনাকে সুপারগান বানিয়ে দিতে পারি। সেই সুপারগান দিয়ে আপনি যেমন মহাকাশে রকেট পাঠাতে পারবেন, তেমনই পারবেন বহু দূরের শত্রুকে মিসাইল দিয়ে আঘাত করে ধরাশায়ী করে দিতেও।'

'ইসরায়েলকে ধ্বংস করতে পারবে আপনার সুপারগান?' জিজ্ঞাসা করেছিলেন সাদ্দাম হোসেন।

'ও তো তখন বাচ্চা ছেলের হাতের মোয়া।'

গুরুত্ব বোঝা মাত্রই বুলকে তাঁর প্রকল্পের জন্য ফান্ডিং বরাদ্দ করে দিলেন সাদ্দাম। আরম্ভ হল প্রোজেক্ট ব্যাবিলন। ঠিক হল, এবারে বন্দুকটি হবে ১৫০ মিটার দীর্ঘ। কিন্তু এত বড় প্রকল্পে নামার আগে একটা প্রোটোটাইপ বানিয়ে নিয়ে মাঠে নামতে চাইলেন বুল। আর সেই প্রোটোটাইপ বানানোর প্রকল্পের নাম দিলেন 'বেবি ব্যাবিলন' এবং বানিয়েও ফেললেন একটি পঁয়তাল্লিশ মিটার লম্বা বন্দুক। সাদ্দাম বুঝলেন ইরাকের মরুভূমি থেকে এবার এমন ঝড় উঠবে, যা রীতিমতো কাঁপিয়ে দিয়ে যাবে সমগ্র বিশ্বকে।

সুপারগান তৈরি করার জন্য দরকার ছিল বিভিন্ন ধরনের উপকরণ এবং সাজসরঞ্জামের। ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তের স্টিল প্লান্টে দরকার মতো স্টিল টিউবের বরাত দিল ইরাক। সেই সময়ে ইরাকের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সুসম্পর্ক ছিল না। লাগু ছিল নানা নিষেধাজ্ঞা। সুইজারল্যান্ড, ইংল্যান্ড, স্পেন, হল্যান্ডের মতো প্রযুক্তিগত ভাবে উন্নত দেশে অর্ডার দিল ইরাক, কিন্তু প্রতিটা বরাতই পড়ল প্রতিবেশী দেশ জর্ডনের নামে। খাতায়-কলমে

জর্ডনের পক্ষ থেকে বলা হল, একটি সুবিশাল পাইপলাইনের নেটওয়ার্ক বানানোর জন্যই দরকার এই টিউবগুলো।

ঘাসে মুখ দিয়ে কেউ চলে না। তাই তেল সরবরাহ করার নেটওয়ার্ক বানানোর গল্পটা সকলেই ধরে ফেলল। কিন্তু পাইপ সরবরাহকারী প্রতিটা দেশই কেবল নিজেদের স্বার্থ দেখল এবং পুরো ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মাল সরবরাহ করে চুপ রয়ে গেল। একের পর এক অ্যাসাইনমেন্টে স্টিল পাইপগুলো এসে পৌঁছাতে লাগল জর্ডনে। তারপর বেশ নিরাপদেই প্রবেশ করলে ইরাকের মাটিতে।

সুপারগান কোন জায়গায় বসানো হবে তা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল আগেই। পশ্চিমের একটি পাহাড়ের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে বসিয়ে লক্ষ্যবিন্দুতে রাখা হয়েছিল ইসরায়েলকে।

কাজ চলছিল জোর কদমে। আর এর মধ্যে মধ্যেই জেরাল্ড বুল উন্নত করে তুলছিলেন ইরাকের অস্ত্রভাণ্ডার। স্কুড মিসাইলকে উন্নত করার কাজটা সারছিলেন। দুটি স্বয়ংক্রিয় বন্দুক বানিয়েছিলেন। একটার নাম আল-ফাও, আরেকটার নাম আল-মজনুন। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল ইসরায়েল, কারণ খাঁড়িতে যুদ্ধ বাঁধলে উন্নত অস্ত্রের ভাণ্ডার নিয়ে ইরাক যে যথেষ্ট বেগ দিতে পারে তা বুঝতে ইসরায়েলি কর্তাদের আর কিছুই বাকি ছিল না। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল ইরানও। ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময়ে বুলের তৈরি অস্ত্র ইরাককে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিল। এম আই সিক্স, সিআইএ-এর মতো গুপ্তচর সংস্থাগুলিও বুলের ওপরে নজর রেখেছিল। ইরাকের শক্তি বৃদ্ধি করার পাশাপাশি নিজের শত্রুও বাড়িয়ে চলেছিলন ডক্টর জেরাল্ড বুল।

ওদিকে স্টিলের পাইপের সরবরাহ অব্যাহত ছিল। বরাত মাফিক আসতে থাকা একটি শিপমেন্টকে তুরস্কের কাস্টমস অফিসারেরা আটকাল। সেই অফিসারদের মধ্যে একজন অফিসারকে ইসরায়েলেই মোসাদের এজেন্টরা আগে থেকেই হানি ট্র্যাপে ফাঁসিয়ে রেখেছিল। সুন্দরীর জালে ফেঁসে থাকা সেই অফিসারের মুখ থেকে তথ্য পেয়ে যায় মোসাদ। আরম্ভ হয়ে যায় বুলকে ট্র্যাক করার কাজ।

প্রাথমিক ভাবে বুলকে সাবধানবাণী দেওয়ার কাজ করেছিল মোসাদ। ১৯৯০ সালের শীতকালে একাধিক বার বুলের ব্রাসেলসের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে মোসাদ এজেন্টরা সব তছনছ করে দেয়। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল বুলকে বোঝানো যে, তুমি কোথায় থাকো তা আমরা জানি, আর তোমার বাড়িতে ঢুকে তোমার ক্ষতি করাটা আমাদের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। তাই তুমি প্রোজেক্ট ব্যাবিলন নিয়ে আর এগিও না।

কিন্তু এসবে আমল দেননি বুল। উনি নিজের প্রোজেক্ট চালিয়ে যেতে থাকেন। সুপারগানের অংশগুলোকে জোড়া লাগিয়ে জন্ম দিতে থাকেন বিশ্বের এক নতুন ত্রাসকে। ইসরায়েলের কাছে বিষয়টা ক্রমশ ভয়ানক হয়ে উঠছিল। অনেক চর্চার পর শেষ পর্যন্ত ১৯৯০ সালের ২০ মার্চ ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী য়িৎজাক শামির মোসাদের তৎকালীন চিফ নাহুম আডমোনিকে বলেন, ‘সেন্ড ইয়োর বয়েজ!’ ইঙ্গিত সাফ ছিল— ‘বুলকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও!’ ৩ জন হিটম্যানের একটি টিম ব্রাসেলসে পাঠানো হয়। বুল নিহত হন। আজ অবধি কেউ এই হত্যার দায় স্বীকার করেনি।

সরাসরি কাউকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা না গেলেও কাজের পদ্ধতি মোসাদের সঙ্গে দারুণ ভাবে মিলে যায়। নিখুঁত কাজ সারার পরে মিডিয়াতে খবর প্লান্ট করে দেওয়ার কাজটা মোসাদের মতো অন্য কেউ করতেই পারে না। এক্ষেত্রেও ছড়িয়ে দেওয়া হয় নানা নিউজ। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, প্রচারিত হয় সাদ্দাম

হোসেনের সঙ্গে সুপারগানের প্রোজেক্ট নিয়ে বনিবনা না হওয়ার ফলেই বুলকে হত্যা করিয়েছিলেন সাদ্দাম। বাকি কথা খোদাই জানবেন!

ফর ইউ, গ্র্যান্ডপা

১২ এপ্রিল, ২০১০ টাইমস অব ইসরায়েল ছাপল: ‘ফর ইউ, গ্র্যান্ডপা’ এবং এরপর শিরোনামে উঠে আসা মানুষটার অসংখ্য প্রশংসকের জন্ম হল।

সেদিন খবরের কাগজের কলামটির লেখক অমোস শবিত লিখেছিলেন যে, মির ডাগান জীবনে যত বড় কাজ করেছেন, তার প্রতিটার উৎসর্গ-পুরুষ ছিলেন একজনই— ওঁর মাতামহ বা দাদু। আদরের ‘গ্র্যান্ডপা’!

১৯৪২ সাল। হিটলারের বিশেষ বাহিনী শুত্যুস্তাফল’ পোল্যান্ডকে পর্যুদস্ত করে দিল। গুলি করে মারা হল অগুনতি মানুষকে। আর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঠিক আগে একটা ছবি তোলা হয়েছিল।

কী ছিল সেই ছবিতে?

সেই ছবি ছিল এক ইহুদি বৃদ্ধের। নাম বের এরলিক স্লুশনী। তাঁর পিঠের ওপর আরেক জন ইহুদিকে তুলে গুলি করে মারা হয় দুজনকেই।

এই হত্যার ঠিক তিন বছর পর নিহত এরলিকের মেয়ে সোভিয়েতগামী একটি রিফিউজি ভর্তি ট্রেনের মধ্যে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। শিশুটির নাম রাখা হয় মির হুবারম্যান। সে-ই বড় হয়ে পরিচিত হল মির ডাগান নামে।

মির ডাগান— প্রতিশোধ এবং প্রতিরোধের শিক্ষার বিষয়টা ছিল ওঁর শৈশবের খেলার সঙ্গী। যেন জিজাবাইয়ের শিবার শিবাজি হয়ে ওঠার কাহিনি।

এরলিক সুশনীর ওই ছবি আমৃত্যু বয়ে নিয়ে বেরিয়েছেন মির ডাগান। ডাগানের জীবনে নিজের দাদুর অন্তিম দৃশ্য এতটাই প্রভাব ফেলেছিল যে, সেনাতে থাকাকালীন যখন, যেখানে ওঁর বদলি হয়েছে, তখন সেখানকার নতুন অফিসে গিয়ে চাকরিতে যোগ দেওয়ার প্রথমদিনে উনি নিজের দফতরে এই ছবিটা টাঙিয়েছেন। উপস্থিত সহকর্মীদের বলেছেন ছবির পিছনে থাকা মর্মান্তিক ইতিহাসের কথা।

ঠিক এমনই একটা কিসসা তখনও শোনানো হয়েছিল, যখন ২০০২ সালের আগস্টে ডাগান প্রথম বারের জন্য মোসাদ চিফ হলেন। ১৩ সেপ্টেম্বরের টাইমস অব ইসরায়েল পত্রিকায় ডাগানকে নিয়ে একটা বাক্যের শিরোনাম ছাপা হল: ‘শ্যারন রেইজড ডাগান’।

আসুন, ফিরে যাই এই শিরোনামের কয়েক মাস আগের একটি শিরোনামে। ১৮ জানুয়ারি, ২০০২। টাইমস অব ইসরায়েলের পক্ষ থেকে কলামিস্ট রন লেশেম লিখেছিলেন — ‘মোসাদ ইন ডিপ ফ্রিজ’।

একই বছরের মাত্র কয়েক মাসের আড়াআড়িতে প্রকাশিত দুটি সংবাদ শিরোনাম স্পষ্ট করে দেয় যে, ডাগান এমন একটা সময়ে মোসাদের দায়িত্ব পেয়েছিলেন, যখন মোসাদ ডুবতে বসেছিল। মোসাদের আন্তর্জাতিক চিত্র ক্রমশ ম্লান হয়ে পড়ছিল, একের পর এক ফেইলড মিশন, এজেন্টরা ধরা পড়ছিল, তাদের হত্যা করা হচ্ছিল।

ওই পর্বে মোসাদ জর্ডনে লুকিয়ে থাকা একজন ‘হামাস’ নেতাকে টার্গেট করেছিল, কিন্তু সে পালিয়ে বাঁচতে সক্ষম হয়। এই বইতে মোসাদের কিসসাকাহিনি যত গড়াবে, ততই আপনারা এই কথা ভেবে অবাক হবেন যে, মোসাদের টার্গেটও পালিয়ে বাঁচতে পারে!

বাস্তবে কিন্তু এমনটাই ঘটেছিল ওই ডামাডোলের পর্বে।

কিন্তু এটাই সত্য। যদি চিফ কমজোর হয়, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানও দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য। জর্ডনে এই ফ্লপ অপারেশনের পর ইসরায়েলের সরকারের ভয়ানক নিন্দা হয়। পরভূমে চলা এই মিশনের জন্য রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। ক্ষুণ্ণ হয়েছিল জর্ডন গভর্নমেন্ট।

তো এমন একটা পরিস্থিতিতে 'ডিপ ফ্রিজড' মোসাদের দায়িত্বে আনা হল ডাগানকে: 'শ্যারন রেইজড ডাগান'।

অ্যান্ড হোয়াট আবাউট ডাগান রাইজড?

— ডাগান রেইজড কেওজ!

যে সংবাদপত্রটি ২০০২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর 'শ্যারন রেইজড ডাগান' লিখল, সেই কাগজেই ২০০৩ সালের ৭ মে হেডলাইন ছাপল: 'ডাগান রেইসড ক্যাওজ'। অল্প কয়েক মাস অন্তর বদলাতে থাকা সংবাদপত্রের শিরোনামের এই শৃঙ্খলা প্রমাণ করে দেয় যে, অযোগ্য থেকে যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে করে মোসাদ হয়ে উঠছিল ক্ষুরধার।

কেওজ কী? কোথা থেকে এল এই শব্দ?

'Chaos'... মহাকবি হোমারের ইলিয়ড থেকে ধার নেওয়া একটি শব্দ। স্পার্টা আর ট্রোজানের মধ্যে হওয়া যুদ্ধে যুযুধান যাবতীয় দৈবিক এবং আসুরিক চরিত্রদের সৃষ্টি করেছিলেন হোমার। তাদের মধ্যেই একটি চরিত্র ছিল, কেওজ।

কেওজ-এর কাজ ছিল বিপক্ষের সৈন্যদলের ব্যবস্থাকে তছনছ করে দেওয়া বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। প্রতিপক্ষের সেনার পঙক্তি ভেঙে দেওয়া, তাদের নিয়ত সমূহকে ছত্রভঙ্গ করা, বূ্যহ ভেদ করা ইত্যাদিই ছিল কেওজের ভূমিকা।

হোমার মহাকবি। তাঁর মহাসাহিত্যের প্রভাব ভাষায়, সমাজে দেখা যে দেবেই এ কথা বলা বাহুল্য। কালান্তরে, কেওজ-এর এমনই প্রভাব পড়ল যে, এই শব্দটি 'মহাবিশৃঙ্খলা'র সমতুল্য হয়ে উঠল।

তাহলে আমরা কী বলতে পারি?

'ডাগান রেইজড কেওজ' বলতে বোঝানো যায়: 'ডাগান মহাবিশৃঙ্খলার জন্ম দিয়েছেন'।

কী ধরনের মহাবিশৃঙ্খলা?

মধ্যপ্রাচ্যে মহাবিশৃঙ্খলা। তছনছ করে দিয়েছিলেন প্রতিপক্ষকে। ডাগানকে পর্যবেক্ষণ করলে মিল পাওয়া যায় চাণক্যের সঙ্গে। ছল, বল কিংবা কৌশল, যেখানে যেটা দিয়ে সম্ভব, সেখানে সেটাকেই অস্ত্র রূপে ব্যবহার করেছিলেন মির ডাগান। 'সবার উপরে রাষ্ট্র সত্য—- এটাই ছিল ডাগানের এক এবং অদ্বিতীয় মন্ত্র! ডাগানের এই মন্ত্রের ইতিবাচক পরিণাম হিসাবে ইসলামিক মৌলবাদ দীর্ঘ দিন ধরে অত্যাধুনিক পারমাণবিক অস্ত্রে হাত দেওয়ার সুযোগ পায়নি।

বিপক্ষ দেশের বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্রের পরীক্ষণকে বিপর্যস্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে

ডাগান হয়ে উঠেছিলেন নম্বর ওয়ান! ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন প্রকল্প নাশ করার জন্য ওঁর পরিকল্পনা ছিল ওদেশের একের পর এক নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্টকে গুপ্তহত্যা করা এবং মোসাদ সেই কাজটাও সুচারু পদ্ধতিতে সম্পন্ন করেছিল।

২৩ জুলাই, ২০১১

ইরানের রাজধানী তেহরান। সময়: বিকেল ৪:৩০। তেহরানের দক্ষিণ প্রান্তের একটি জনবসতি পূর্ণ এলাকা। রাস্তার নাম 'বানি হাশমি স্ট্রিট'। মূল পথের ধারেই একটা বাড়ির দোরগোড়ায় এসে নামলেন ওই বাড়ির মালিক। কলিং বেল প্রেস করলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুটি পৃথক মোটরবাইকে সওয়ার হয়ে আসা দুজন আততায়ী নিজেদের অটোম্যাটিক মেশিনগানের সব ক'টা গুলি দেগে দিয়ে গেল ওই ব্যক্তির দেহে।

নিহত ব্যক্তি কিছু বুঝে ওঠার সময়ই পাননি। উনি কে ছিলেন? পদার্থবিদ্যার এক বিশারদ।

ওঁর অপরাধ কী ছিল?

উনি নিজের অধীত বিদ্যা এবং কৌশলের প্রয়োগ দ্বারা ভবিষ্যতে ইসলামিক মৌলবাদ তথা সন্ত্রাসবাদকে সশক্ত করে তোলার চেষ্টা করছিলেন। উনি ছিলেন ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পের অন্যতম একটি মুখ, নিউক্লিয়ার ওয়্যারহেডকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য অত্যাবশ্যকীয় ইলেকট্রনিক স্যুইচের ডিজাইনার।

ওই বৈজ্ঞানিকের নাম ছিল, প্রফেসর দারিউশ রেজোইনিজাদ। তবে এভাবে আততায়ী দ্বারা হামলায় নিহত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে নাজিদই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন না, ছিলেন না অন্তিম ব্যক্তিও। ওঁর ওপরে হওয়া এই হামলার আগে ২০১০ সালে একই দিনে দুটি পৃথক জায়গায় দুজন বৈজ্ঞানিকের ওপরে আক্রমণ হয়।

২৯ নভেম্বর, ২০১০

উত্তর তেহরান। একটা কালো রঙের গাড়ি এগিয়ে চলেছে হাইওয়ে ধরে। চালকের আসনে বসে আছেন মাজিদ শহরিয়ারি। ঠিক পিছনের সিটে ওঁর স্ত্রী ঘাসেমা। সদা নিজের গবেষণা এবং অধ্যাপনার কাজে ব্যস্ত থাকেন মাজিদ। উনি শাহিদ বেহেস্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

সন্ধে নেমে গেছে বেশ খানিকটা আগেই। ঘড়ির কাঁটা বলছে, পৌনে আটটা বাজে। এয়ার কন্ডিশনড গাড়ির ভেতরে হালকা তালে বাজছে আরব্য সুর।

ঘাসেমা বললেন, 'আহ, এমন মধুর সন্ধ্যায় লং ড্রাইভের মজাই আলাদা!'

'ডার্লিং, রাত যে এখনও বাকি!' উত্তরে একটা হাসি সমেত কথাটা ভাসিয়ে দিলেন মাজিদ।

হ্যাঁ, রাত বাকি ছিল। বাকি ছিল বিভীষিকাও। ওঁরা খেয়াল করেননি যে, শুনশান পথ ধরে ওঁদের গাড়ির পিছু নিয়ে চলতে থাকা দুটো মোটরবাইকের মধ্যে একটা যান গতি বাড়িয়ে চলে এল ওঁদের গাড়ির সমান্তরালে। তারপর বাইকের পিছনের সওয়ার টুক করে কিছু একটা আটকে দিল গাড়ির সামনের ডান দিকের দরজায়।

এতক্ষণে ব্যাপারটা নজরে আসে মাজিদের। গাড়ির গতি কমাতে শুরু করলেন উনি। গাড়িটার ঠিক পিছনে থাকা বাইকের দ্বিতীয় আরোহী এবার নিজের পরিধানের মধ্যে থেকে একটা ছোট রিমোট বের করে আনলেন। তার নির্দিষ্ট বোতামে চাপ দিতেই সশব্দে ঘটে গেল বিস্ফোরণ।

যে বাইকের সওয়ার গাড়িটায় বিস্ফোরক লাগিয়েছিল সেই বাইকটাও ব্লাস্টের প্রাবল্যে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল। তাকে উদ্ধার করল ব্যাকআপ বাইকের দুই সওয়ার। আর ততক্ষণে কাজ সারা হয়ে গেছে। ইহলোক ত্যাগ করেছেন ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পের অন্যতম স্তম্ভ মাজিদ শহরিয়ারি।

ঠিক তারই কিছুক্ষণ আগে তেহরানের ইউনিভার্সিটি স্কোয়ারের কাছে একটি মোটরবাইক গিয়ে ধাক্কা মারে প্রফেসর ফেরেয়দুন আব্বাসির পিয়োজো ২০৬ মডেলের গাড়িতে। ওই সময়ে গাড়ির ভেতরেই আব্বাসি সস্ত্রীক বসে ছিলেন। বাইকটা আসলে গাড়িবোমা ছিল। কেবল গাড়িবোমা দিয়েই নয়, গাড়ির পিছন দিকের উইন্ডশিল্ডে আগে থেকেই লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল একটা সি-ফোর বিস্ফোরক। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন আব্বাসি।

এই হামলার পর ডক্টর আব্বাসি দীর্ঘ সময়ের জন্য মেডিক্যাল লিভে চলে যান।

উদাহরণের সূচি বেশ লম্বা, তার মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটাই বলা সম্ভব।

১২ জানুয়ারি, ২০১০

প্রফেসর মাসুদ আলি মহম্মদি নিজের বাড়ির বাইরে পা রাখা মাত্রই নিহত হন। এই ঘটনাটি ঘটে সন্ধে ৭:৩০ নাগাদ। স্থান উত্তর তেহরানের কাছেই, শরিয়তি স্ট্রিট।

যদিও বা ইরানের ইনটেলিজেন্স এজেন্সি, আজও অবধি এমন কোনো ক্লু খুঁজে বের করতে পারেনি যার মাধ্যমে এ কথা বলা সম্ভব হয় যে, এই গুপ্তহত্যাগুলোর পিছনে ছিলেন মির ডাগান বা মোসাদ। তবে বার বার ইসলামিক বিশ্বের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সরকারি রিপোর্টে একটাই তত্ত্বকে ধোঁয়া দেওয়া হয়েছে— এই হত্যাগুলির পিছনে 'জিওনিস্ট'রা ছিল, অর্থাৎ ইহুদিরা।

এভাবেই সফল হতে থাকল একের পর এক মিশন। মির ডাগান এবং তাঁর সমার্থক মোসাদের নাম শুনে বিশ্বের তাবড় তাবড় সন্ত্রাসবাদীদের বুক কেঁপে উঠতে লাগল। ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য সানডে টাইমস ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ এর সংস্করণে লিখল: 'মির ডাগান, দ্য মাস্টারমাইন্ড বাহাইন্ড মোসাদ'স সিক্রেট ওয়ার!'

এই আর্টিকেলটি লিখেছিলেন উজি মহনেহমি। ভদ্রলোক একজন ইসরায়েলি সাংবাদিক, মিডল-ইস্টের রাজনীতি, কূটনীতির একজন বিশেষজ্ঞও বটে।

আর্টিকেলটি শুরু হয়ে ডাগানের নিরামিষ খাদ্যাভ্যাসের কথা দিয়ে। সেখানে এ কথাও লেখা হয় যে, ডাগান একজন চিত্রশিল্পী। রং নিয়ে খেলা ওঁর পুরোনো অভ্যেস এবং এই আর্টিকেল গিয়ে শেষ হয় সেই শিল্পীর গুপ্তচর হয়ে ওঠা দিয়ে, তাঁর 'স্পাই ইন চিফ' হয়ে ওঠার মাধ্যমে।

এই আর্টিকেলটি প্রকাশিত হওয়ার ঠিক তিন দিন আগে, লন্ডন টাইমস পত্রিকায় ডাগানকে নিয়ে বেশ কিছু কথা প্রকাশিত হয়। সেখানে ওঁকে বলা হয়েছিল, 'স্ট্রিট-ফাইটার'।

লেখা হয়েছিল: দ্য পাওয়ারফুল, শ্যাডোয়ি মোসাদ চিফ মির ডাগান ইজ আ স্ট্রিট-ফাইটার!

পাকিস্তানের মতো একটি ঐতিহাসিক চোর-রাষ্ট্রের কথা তো আমরা কমবেশি সকলেই জানি। মোসাদ চিফকে নিয়ে লেখা লন্ডন টাইমসের এই নিউজ বেরোনোর ঘণ্টা পাঁচের মধ্যেই পাকিস্তানি সংবাদপত্র দ্য নেশন সেটাকে টুকে নিয়ে লিখল: 'মোসাদ চিফ মির ডাগান ইজ আ স্ট্রিট-ফাইটার!'

তবে এক্ষেত্রে দ্য নেশনের করা এই স্টোরির থেকে বেশি কভারেজ পেয়েছিল সেই মামলা, যা লন্ডন টাইমসের পক্ষ থেকে দ্য নেশন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল।

আর এই স-অ-ব কিছু চলতে থাকার মাঝে হঠাৎ করেই একদিন দুনিয়ার সবথেকে সাহসী মানুষদের পঙিক্ততে থাকা ডাগানের শরীরে বাসা বাঁধল মারণব্যাধি, লিভার ক্যান্সার।

আমেরিকা, জার্মানির মতো চিকিৎসা শাস্ত্রে উন্নত দেশের চিকিৎসকেরা কেউই ডাগানের মতো ব্যক্তিত্বের চিকিৎসা করাতে রাজি হলেন না। এমনকী ডাগানকে ভারতে এনেও চিকিৎসার ব্যাপারে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু প্রতিটা ক্ষেত্রেই বাধ সাধছিল প্রাক্তন মোসাদ কর্তার স্টেটাস। কেউ রিস্ক নিতে চাননি।

খবর ছড়িয়ে পড়ল বেলারুসের চিকিৎসা ব্যবস্থার শরণ নিয়েছেন ডাগান। কিন্তু সেই খবরকেও নস্যাৎ করে দেওয়া হল ডাগানের পরিবারের পক্ষ থেকে। সম্ভবত হিজবুল্লাহর মতো জঙ্গি গোষ্ঠীর আক্রমণ এড়াতেই এমনটা করা হয়।

কিন্তু নিজের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে ইসরায়েলের মতো একটি উন্নত দেশের বাইরে কেন আসতে হয়েছিল ডাগানকে?

কারণ ইসরায়েলের নিয়ম অনুসারে ৬৫ বছরের ওপরের কোনো ব্যক্তির লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট আইনসিদ্ধ নয় এবং চিকিৎসার সময়ে ডাগানের বয়স ছিল ৬৭ বছর।

যাই হোক, চিকিৎসার জন্য শ্রেষ্ঠ বিশারদ আনা হয়। প্যারিস ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টারের চিকিৎসক ডানিয়েল আজৌলে বেশ কয়েক জন অভিজ্ঞ ইসরায়েলি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপস্থিতিতে ডাগানের লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করেন।

কিন্তু এত প্রয়াস সত্ত্বেও চার বছরের বেশি বাড়ানো যায়নি ডাগানের আয়ু। ২০১৬ সালের মার্চ মাসে ডাগান মারা যান। ডাগান চলে গেলেও ইসলামিক মৌলবাদকে যে ধাক্কা উনি দিয়ে গেছেন, তা সামলাতে ওদের এখনও অনেক দিন সময় লাগবে।

মির ডাগানের মোসাদ নাকি মোসাদের মির ডাগান?

কী শিরোনাম দেওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে আমরা দ্বিধায় ছিলাম। বলা ভালো, এখনও দ্বিধাগ্রস্তই আছি। যে মোসাদকে আজ আমরা দেখি, তা যতটা 'ইসরায়েলের মোসাদ', তার চেয়েও অনেক বেশি 'ডাগানের মোসাদ'।

প্রাইম মিনিস্টার য়িত্যাক রাবিন ১৯৯৪ সালেই চেয়েছিলেন যে মোসাদের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিক ডাগান। কিন্তু জীবনভর যুদ্ধ করে আসা মির ডাগানের ইচ্ছা ছিল নিজের ছোটবেলার একটা সাধ পূরণ করা।

কী সেই সাধ?

মোটরবাইকে চড়ে বিশ্বভ্রমণ করার সাধ!

ডাগানের জন্মপর্বের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। ওঁর বেড়ে ওঠার পরিবেশের ভয়াবহতার স্তরটা কিন্তু ভাবার মতোই বিষয়। এতটাই ভয় ছিল ইহুদিদের ইহুদি হওয়ার পরিচয় নিয়ে যে, প্রত্যেকে নিজের নিজের গোত্রনাম বদলে ফেলেছিল। বালক মির হুবারম্যান হয়ে গেল 'ডাগান'... 'মির ডাগান'।

শরণার্থী শিবির আর বিপদের পর বিপদের ছায়ায় ঘেরা নবীন রাষ্ট্র ইসরায়েলের বুকে বড় হতে থাকল মির ডাগান। শিক্ষার সুযোগ প্রায় ছিলই না। ওই কাঁচা বয়সে যে হাতে কলম তুলে নেওয়ার কথা ছিল, সেই হাতেই বালক ডাগান ছুরি তুলে নিয়েছিল।

ছুরি কিন্তু অস্ত্র নয়, শস্ত্র। এক্ষেত্রে ভারতীয় সনাতন পরম্পরা অনুসারে অস্ত্র এবং শস্ত্রের পার্থক্যটুকু বুঝে নেওয়া যাক। যে আয়ুধ বা হাতিয়ার প্রহারের আগে এবং পরে প্রয়োগকারীর হাতেই রয়ে যায়, তা শস্ত্র। যেমন গদা, ছুরি ইত্যাদি। আর যে আয়ুধ প্রহারের সময় দূর থেকে নিক্ষেপ করা হয়, তা হল অস্ত্র। যেমন তির। আবার কয়েকটি হাতিয়ার দু' ভাবেই ব্যবহার করতে পারা সম্ভব। সেগুলো শস্ত্র এবং অস্ত্রের গণ্ডিতে অবাধে বিচরণ করার ক্ষমতা রাখে।

ছুরিকে শস্ত্র থেকে অস্ত্রের পরিধিতে এনে ফেলেছিলেন ডাগান। উনি ছুরি ছুড়ে মারার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা উদ্ভাবন করে ফেলেছিলেন। একটি পরীক্ষা পর্বে ইসরায়েলের 'সায়েরাত মটকল'-এর আধিকারিকেরা অবধি ওঁর এই ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যান।

ডাগান ইসরায়েলের সর্বশ্রেষ্ঠ কম্যান্ডো ইউনিট সায়েরাত মটকলের অংশ হয়ে উঠতে পারেননি বটে, কিন্তু নির্ভুল লক্ষ্যে ওঁর ছুরি নিক্ষেপ করার ক্ষমতার কথা রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে যায় এবং তারপর থেকে পাশ্চাত্যের সিনেমা জগতে বিভিন্ন অ্যাকশন ফিল্মে বেশ কয়েক দশক ধরে একটা দুটো করে ছুরি ছুড়ে মারার সিন থাকার ব্যাপারটা বাঁধা-ধরা হয়ে যায়।

ডাগান প্যারাট্রুপার্সের সিলভার উইং পেয়েছিলেন। ১৯৬৩-১৯৬৬ এই চার বছর ইসরায়েলের নিয়মানুসারে দেশের জন্য আবশ্যকীয় সৈন্য-সেবা প্রদানের পর ডাগান সেনাবাহিনীতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তত দিনে উনি হয়ে উঠেছিলেন 'সিজেন' মির ডাগান বা 'সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট'।

ডাগানের দুর্ধর্ষ মনোভাব দেখলে মনে হয় ওঁর শৈশব যেন লাইব্রেরিতে থিওরি পড়ে কেটেছে এবং যৌবন কেটেছে ল্যাবরেটরিতে, প্রয়োগ করে। আর যা কিছু শিখেছেন, তা উজাড় করে দিয়ে গেছেন মোসাদকে, ইসরায়েলকে।

১৯৬৭ সাল। 'ছ' দিনের যুদ্ধ' বা 'সিক্স ডে'জ ওয়ার' চলছিল। একজন প্লাটুন কম্যান্ডার রূপে সিনাই মোর্চার হয়ে লড়ছিলেন ডাগান। যুদ্ধ চলাকালীন মিশরের সেনা দ্বারা নির্মিত একটি বারুদে ভর্তি সুড়ঙ্গে ডাগানের পা পড়ে যায়। উনি মারাত্মক ভাবে আহত হন। তিন মাসের জন্য হাসপাতালেও ভর্তি হয়ে থাকতে হয়েছিল ডাগানকে।

তরতাজা একজন যুবক। দেশাত্মবোধে ভরপুর। নিজের সৈন্য-সেবার জন্য উনি তখন পদক প্রাপ্তির পথে। একজন যুবতীর কাছে এগুলোই কি প্রেমে পড়ার জন্য যথেষ্ট কারণ হতে পারে না? হয়েও ছিল! হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থাতেই ওই হাসপাতালের এক নার্স বিনার সঙ্গে ওঁর প্রণয় হয়। সেই প্রণয় পূর্ণতা লাভ করে পরিণয়ে।

১৯৭১ সাল অবধি ডাগানের জীবন মোটামুটি সরলরেখায় চলেছিল। শান্তই ছিল বলা চলে। কিন্তু ১৯৭১ সালের গরমকালের এক সন্ধ্যায় গাজা ভূখণ্ডের সংলগ্ন একটি এলাকায় দুই ইহুদি শিশুর নির্মম হত্যার পর বদলে গেল ডাগানের জীবনপ্রবাহ।

পাঁচ বছরের অবিগাইল, আর আট বছরের মার্ক, একটি লকড গাড়িতে বসে নিজেদের বাবা-মা'র জন্য অপেক্ষা করছিল। আর তখনই এক দল ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী এসে ওই গাড়িটার কাচ ভেঙে তার মধ্যে একটা হ্যান্ড গ্রেনেড ফেলে দিয়ে যায়।

জেনারেল শ্যারন এই ঘটনায় ভয়ানক ভাবে মর্মাহত হন। উনি তৎক্ষণাৎ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে নেওয়ার ডাক দেন। ডেকে পাঠানো হয় ওঁর যুবাকালের সঙ্গীদের, যাঁরা ছ' দিনের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন।

আর তাঁদের মধ্যেই একজন ছিলেন মির ডাগান। ইসরায়েলের সামরিক আলোচনার একটা বড় দিক হল সেখানে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মত তথা অমত বিনিময়ের সম্পূর্ণ সুযোগ পান অধঃস্তনেরা। নানা কথার পর যখন ডাগানের বলার সুযোগ আসে, তখন উনি বলতে শুরু করেছিলেন, 'শ্যারন স্যর, যদি আমরা লেবাননের প্যালেস্টাইন মুক্তি মোর্চার সদস্য হিসেবে বেথ লোহিয়াতে ঢুকি, আর তারপর… '

কথা সম্পূর্ণ করার আগেই থামিয়ে দেওয়া হয় ডাগানকে। শ্যারন ওঁকে সবার সামনে তিরস্কারও করেন। কিন্তু শ্যারনের মনের ভেতরে কোনো একটি বিন্দুতে কেউ যেন বলছিল, 'এই ছেলেটা ঠিকই বলছিল।'

এরপর অনেক তর্কাতর্কি হয়, শেষমেশ গ্রিন সিগন্যাল পান মির ডাগান। অপারেশনের নাম দেওয়া হয় 'স্যুইফ্ট'।

অপারেশন স্যুইফ্টের কথা তো হবেই, তার আগে জেনে নেওয়া যাক 'বেথ লোহিয়া' ব্যাপারটা কী?

গাজা স্ট্রিপ বা ভূখণ্ডের দক্ষিণ ভাগের একটি জায়গার নাম বেথ লোহিয়া। এই স্থান সন্ত্রাসবাদীদের দুর্ভেদ্য গড় ছিল। ১৯৭০ সাল নাগাদ বিপক্ষের সকলেই জানত যে, ওখানে গিয়ে পড়া মানে মরণ বাঁধা। বেথ লোহিয়ার মাটিতে কেবল একটাই জিনিস শত্রুপক্ষের কাউকে সুরক্ষিত রাখতে পারত, আর তা ছিল তার পরিচয়ের গোপনীয়তা। আত্মপরিচয় গোপন করে কেউ যদি প্যালেস্টাইন মুক্তি মোর্চার সঙ্গে নিজের যোগ প্রমাণ করতে পারত, তাহলে তাকে 'মরহাবা' বলে স্বাগত জানানো হত। নাহলে অগুনতি ক্ষুধার্ত রাহিয়ান কালশনিকভ নিজেদের নখদন্ত বের করে তেড়ে আসত অনুপ্রবেশকারীর দিকে।

ব্যাপারটা পুরো ছকে ফেলেছিলেন মির ডাগান। ছাব্বিশ বছরের এক তরতাজা যুবক, যার দলের নেতৃত্বে জেনারেল এরিক শ্যারন। প্রাথমিক ভাবে শ্যারন ডাগানকে একজন অনভিজ্ঞ কিন্তু উৎসাহী যোদ্ধা বলে মনে করলেও পরে বুঝেছিলেন যে, হিসেবে ভুল ছিল।

এবার অপারেশন স্যুইফ্টকে রূপায়নের পালা এল। যোজনা তৈরি হল। দুটি দলে ভাগ হয়ে গেল টিম। ঠিক হল, একটি দল যাবে ইসরায়েলি সেনার বেশে এবং অন্য দলটি লেবাননের মুক্তিযোদ্ধাদের ছদ্মবেশ ধারণ করবে। ইসরায়েলের সৈনিকদের কাছে খুব ছোট একটি যুদ্ধ জাহাজ থাকবে, আর লেবাননের সন্ত্রাসবাদীর বেশে থাকা ছেলেদের কাছে থাকবে একটি জীর্ণ-শীর্ণ নৌকা।

ভূমধ্যসাগরের ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে থাকা একটি ইসরায়েলি সমুদ্রপোত দুটি

দলকেই জলে নামিয়ে দেবে। দুটি দলই তারপর এগিয়ে যাবে গাজা স্ট্রিপের দিকে। প্রথমে ভগ্নপ্রায় নৌকাটি গিয়ে থামবে গাজার সাগরতটে। মুক্তিযোদ্ধার বেশধারীরা লাফিয়ে নামবে নৌকা থেকে, পিছু পিছু আসা ইসরায়েলি জাহাজ তখনই তাদের ওপর গুলি চালাবে।

ডাগানের মতে, এটুকুই, কেবল এটুকুই যথেষ্ট ছিল! এটুকু ঘটাতে পারলেই গাজা ভূখণ্ডের মুক্তিযুদ্ধে নিবেদিত সন্ত্রাসবাদীরা মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মবেশে থাকা ইসরায়েলিদের সুরক্ষিত স্থানে নিয়ে গিয়ে তুলত। উগ্রবাদীদের ঠিকানাও তখন মিলত আপনাআপনিই।

তারপরের প্ল্যানিং ছিল, জাহাজে যুযুধান হয়ে আসা ইসরায়েলি সৈন্যের ছদ্মবেশে থাকা দলেরা লোকেরা নৌকা থেকে নেমে পালানো মুক্তিযোদ্ধার বেশধারীদের খোঁজাখুঁজি করে অসফল এবং নিরাশ হয়ে ফেরার অভিনয় করবে এবং তারপর ওদিকে ওই মুক্তিযোদ্ধার বেশধারীরা নিজেদেরকে লেবাননের আবু সইফের দলের লোক বলে পরিচয় দিয়ে বেথ লোহিয়ার শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করবে। আর তারপর বুম-বুম!

সব কিছু একদম সেভাবেই সম্পন্ন হল, যেভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল এবং এই যোজনার সাফল্যের পর প্যালেস্টাইন মুক্তি মোর্চা এক ধাক্কায় বহু বছর পিছিয়ে গেল। রাতারাতি তারকায় পরিণত হলেন যুবক মির ডাগান।

এরপর পৃথিবীর সব দেশেই যা হয়, ঠিক তা-ই হল। মির ডাগান মিডিয়ার খেলার বিষয় হয়ে দাঁড়ালেন। মানুষটাকে ঘিরে তৈরি হতে আরম্ভ করে দিল অসংখ্য কিংবদন্তী। যেমন মিস্টার ডাগান নাকি সকালে ঘুম থেকে উঠেই আগে পিস্তল শ্যুটিং করেন, এটাই ওঁর ডেইলি রুটিন। কেউ কেউ তো এ কথাও রটাল যে, ডাগান নিজের শত্রুর হাতে বন্দুক ধরিয়ে দিয়ে বলেন, ‘যা, তোকে পালানোর সুযোগ দিলাম!’ আর তারপর পলাতক সন্ত্রাসবাদীকে গুলি করে ধরাশায়ী করেন।

এভাবেই একের পর এক খবরের কাগজের পাতা ভরে উঠতে থাকল ডাগানকে নিয়ে লেখা গল্পে।

১৯৯৪ সালের একটা দিনে য়িত্যাকের পক্ষ থেকে ডাগানকে অফার করা হল মোসাদের সর্বোচ্চ পদ— ‘উড ইউ লাইক টু বি মোসাদ চিফ?

ডাগান জানালেন, ‘নো! আই ওন্ট!’

এই সময়ে মেজর জেনারেল ডাগানের মনে হয়েছিল, ইসরায়েলে শান্তি ফিরেছে। সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে সেবা নিবৃত্তি নিয়ে উনি মোটরবাইকে চড়ে ওয়ার্ল্ড ট্যুর করতে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু সেই ভ্রমণ সম্পূর্ণ করার সময় পেলেন না ডাগান। মাত্র আট মাসের মাথায় ডাগানকে ইসরায়েলে ফিরে আসতে হল। অশান্ত হয়ে উঠেছিল ইসরায়লের রাজনৈতিক পটভূমি। কারণ নিহত হয়েছিলেন প্রাইম মিনিস্টার য়িত্যাক। আমৃত্যু একটা আক্ষেপ করে গেছেন ডাগান— ‘ইশ, যদি আমি মোসাদ চিফ হতাম, তাহলে হয়তো য়িত্যাককে মরতে হত না!’

মোসাদের দায়িত্ব নেওয়ার আগে ডাগানের এই আফশোসের মধ্যে দিয়েই আস্তে আস্তে বিদায় নিচ্ছিল বিংশ শতক। ওই সময়টা ছিল মোসাদের পতনকাল। এই মোসাদ আর মিগ ২১ হরণ করে আনা মোসাদ ছিল না। একের পর এক ফেইলড মিশন, খুঁজে বের করে মারা হচ্ছিল মোসাদ এজেন্টদের।

মোসাদের রাশ ধরে রাখা হাতেরা কূটনীতিতে পারদর্শী হলেও তা যোদ্ধার হাত ছিল

না। ওই হাতেদের মালিক ব্রাসেলসে ১০/১২-র কেবিনে বসে ইউরোপিয়ান সংঘের বৈঠকে ইসরায়লের রাজদূত হিসাবে কাজ করাতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন।

এরই মধ্যে এসে পড়ল একুশ শতক। জেনারেল শ্যারন হয়ে গেলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। ডাগানের কাছে আবার প্রস্তাব গেল— 'ডাগান, আমি একজন এমন যোদ্ধাকে মোসাদের দায়িত্ব দিতে চাই, যে নিজের দাঁতের নীচে ধারালো ছুরি ধরার ক্ষমতা রাখে।'

ডাগান এবারে আর 'না' বলেননি এবং এরপর ডাগান মিডল-ইস্টে যে তাণ্ডবলীলা চালিয়েছিলেন, তা ছিল অভূতপূর্ব! একজন নিরামিষাশী চিত্রশিল্পী, রঙ নিয়ে খেলতে ভালোবাসা সৈনিক, এরপরের অনেকটা সময় জুড়ে ইসলামিক মৌলবাদী তথা সন্ত্রাসবাদী দেশ এবং সংগঠনগুলির জন্য হয়ে উঠলেন দুঃস্বপ্ন।

বাঘের নখ, সাপের চোখ

২২ এপ্রিল, ২০০৪। স্থান উত্তর কোরিয়ার রিয়ঙ্গচন জেলা। একটি মালগাড়ি এগোচ্ছিল নিজের গন্তব্য পোর্ট অব নাম্পোর দিকে। আর তখনই ঘটল এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে আশেপাশের এলাকার মাটি কেঁপে উঠল। রিখটার স্কেলে সেই কাঁপন ধরা দিল ৩.৬ মাত্রায়। নিহত হল ৫৪ জন মানুষ। একটা ছোট শহর ধ্বংস হয়ে গেল। আহত হল ২,০০০ জন নাগরিক।

উত্তর কোরিয়ার সরকারের পক্ষ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রেস রিলিজ করে জানানো হল যে, ওই মালগাড়িতে লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম ছিল। বিদ্যুৎ পরিবাহী একটি তারের সংস্পর্শে আসার ফলেই ঘটে গেছে এই ভয়ানক বিস্ফোরণ।

শুধু তা-ই নয়। সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত ঘিরে ফেলা হল এলাকা। সাইটের আশেপাশে কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মিডিয়ার লোককে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছিল না। এক সপ্তাহের মধ্যে সারা দেশে আগামী পাঁচ বছরের জন্য সাসপেন্ড করে দেওয়া হল মোবাইল পরিষেবা। দেশে কী ঘটেছে, তা যাতে বহির্বিশ্বে না ছড়ায় তাঁর জন্যই নেওয়া হল এহেন পদক্ষেপ।

সময় সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। স্বাভাবিক নিয়মেই সকলে ভুলতে বসেছিল এই ঘটনাকে। কিন্তু ভোলেনি একটি দেশ। নর্থ কোরিয়ার পক্ষ থেকে দেওয়া সাফাই কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না সেই দেশটি। দেশটির নাম ইসরায়েল। তারা বুঝে গিয়েছিল কোথাও না কোথাও, কিছু না কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। আর তাই এত ঢাক ঢাক গুড় গুড়।

বিদেশের মাটি থেকে খবর আনা প্রতিটা দেশের কাছে দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিশেষত এত রাখঢাকে রক্ষিত বিষয়কে। কিন্তু ইসরায়েলের কাছে আছে মোসাদ। আর মোসাদের কাছে দুঃসাধ্য বা অসাধ্য বলে কিছুই নেই।

তখন মোসাদের চিফ ছিলেন মির ডাগান। রাষ্ট্রের সুরক্ষার জন্য যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পিছপা হওয়ার বান্দা ছিলেন না উনি। উত্তর কোরিয়ার গতিবিধি ছিল সন্দেহজনক। মির খোঁজ লাগাতে আরম্ভ করে দিলেন। খবর এল। একটি সিরিয়ান মিলিটারি প্লেন উত্তর কোরিয়ার মাটি স্পর্শ করেছে।

তা হঠাৎ সিরিয়ান মিলিটারি প্লেনের ল্যান্ডিংয়ের কারণ কী?

প্রাথমিক ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট আসার আগে মনে করা হয়েছিল যে, প্লেনটি বিস্ফোরণের পর মেডিক্যাল হেল্প নিয়ে গেছে।

কিন্তু না। বিষয় অন্য ছিল। ওই বিমানের মাধ্যমে বিস্ফোরণে নিহত ব্যক্তিদের দেহ সরিয়ে ফেলার কাজ চলছিল। সবথেকে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল, সিরিয়ানরা মরদেহগুলোকে প্লেনে তোলার আগে সীসে দিয়ে মোড়া কফিনে ভরছিল। যারা মৃতদেহ বহনের কাজ করছিল, তাদের পরনে ছিল কেমিক্যাল উইপন স্যুট। গড়বড়টা ভয়ানক মনে হচ্ছিল।

আরও বেশি চাঞ্চল্যকর তথ্য পেলেন ডাগান। মৃতদেহগুলোর সব ক'টাই উত্তর কোরিয়ার কোনো অধিবাসীর ছিল না। মৃতদের মধ্যে ছিলেন বেশ কয়েক জন সিরিয়ান বৈজ্ঞানিক। গোপন সূত্র থেকে পাওয়া খবরে জানা গেল যে, ১২ জন সিরিয়ান বিজ্ঞানী

সিরিয়ান সায়েন্টিফিক রিসার্চ সেন্টার থেকে একটি গোপন মিলিটারি গবেষণার জন্য উত্তর কোরিয়ায় গিয়েছিলেন।

ট্রেনের যে বগিতে বিস্ফোরণ ঘটে, তার মধ্যে বেশ ক'জন সিরিয়ান প্রযুক্তিবিদের থাকার সংবাদও মিলল। তাঁরা উত্তর কোরিয়াতে গিয়েই ছিলেন পারমাণবিক বিভাজন সংক্রান্ত কিছু বস্তু সংগ্রহ করতে।

তাহলে ঠিক কী ঘটছিল উত্তর কোরিয়ার মাটিতে? উত্তর কোরিয়া থেকে ৫,০০০ মাইল দূরে বসে থাকা মির ডাগানের পক্ষে সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানা সম্ভব হচ্ছিল না। ছটফট করছিলেন ডাগান। সন্দেহের মেঘ ঘনাচ্ছিল তাঁর মনে। ওদিকে উত্তর কোরিয়ার প্রশাসন অ্যান্টি কন্টামিনেশন স্যুট পরিহিত সৈন্যদের দিয়ে এলাকা ঘিরে ফেলে কিছু সংগ্রহ করছিল বিস্ফোরণস্থল থেকে। ডাগান আন্দাজ করলেন যে, হতে পারে ওটা প্লুটোনিয়ামের অবশেষ।

উত্তর কোরিয়া কি তাহলে সিরিয়াকে পরমাণু বোমা বানাতে সাহায্য করছিল? উত্তর পাওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু তাই বলে উত্তরের সন্ধান করা থামায়নি ইসরায়েল তথা মোসাদ।

২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাস। লন্ডনের একটি হোটেলের বারে একাকী বসে মদ্যপান করছিলেন এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। আচমকাই তাঁর নজর গিয়ে পড়ল পাশের স্টুলে বসা এক সুন্দরীর ওপর। চোখে চোখে ইশারা হল। তারপর হালকা ফ্লার্টিং।

'আপনার মতো একজন মারকাটারি সুন্দরী এভাবে একা...?'

'একা কই? আপনি তো আছেন।'

'হ্যাঁ, আমিই তো আছি।'

ক্রমশ কথার মায়াজালে ফাঁসছিলেন পুরুষ। এখানে বলে রাখি, ওই সুন্দরী ছিলেন একজন মোসাদ এজেন্ট। আর পুরুষটিও সাধারণ কেউ নন। তিনি ছিলেন সিরিয়ার নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক। একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের কাজে গিয়ে ওই আধিকারিক নাম ভাঁড়িয়ে লন্ডনের হোটেলে উঠেছিলেন। সবাইকে ধোঁকা দিতে পারলেও নজর এড়ানো যায়নি মোসাদের। আর খবর পাওয়া মাত্রই মোসাদ পাঠিয়ে দিয়েছিল নিজের ১০ জন বাঘা বাঘা এজেন্টকে।

১০ জনের টিম ভাগ হয়ে গিয়েছিল তিনটি ভাগে। প্রথম দলটির কাজ ছিল সিরিয়ান আধিকারিক লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে নামা মাত্রই তাঁকে চিহ্নিত করে ফেলা। হোটেল বুক করা বা আধিকারিকের জন্য নির্দিষ্ট হোটেলকে খুঁজে বের করার দায়িত্বে ছিল দ্বিতীয় দলটি। আর অন্তিম দলের কাজ ছিল ওই সিরিয়ান আধিকারিকের প্রতিটি পদক্ষেপ, মিটিংকে নখদর্পণে রাখা তথা তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ডেটা হরণ করা।

এই কাজের জন্য সেরার সেরাদের বেছে নিয়েছিল মোসাদ। বিদেশের মাটিতে কাজ করা মানে সাপের গর্তে হাত ঢুকিয়ে তাকে বের করে আনার চেষ্টা। কিডন ডিভিশন থেকে গুপ্তহত্যায় বিশেষজ্ঞ আনা হয়েছিল। হোটেলের ঘরে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ইলেকট্রনিক ডেটা ট্রান্সফারের জন্য স্পেশালিস্ট হিসেবে আনা হয়েছিল নেভিয়ট ডিভিশনের লোক।

ওদিকে হোটেলের বার লাউঞ্জে বসে সুরা এবং সুন্দরীতে মজে ছিলেন সিরিয়ান আধিকারিক। আর এদিকে হোটেলের সিকিউরিটি সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে

আধিকারিকের কক্ষে প্রবেশ করে গিয়েছিল নেভিয়ট টিম। মেথডিক্যাল সার্চ আরম্ভ হল। টেবিলে রাখা ছিল ল্যাপটপ কম্পিউটার। মুহূর্তের মধ্যে ল্যাপটপের ডেটা ট্রান্সফার হয়ে গেল তেল আভিভের মোসাদ হেডকোয়ার্টার্সে। পুরো প্রক্রিয়াটা কোনো হলিউড স্পাই মুভির মতোই বা বলা ভালো যে, হলিউড স্পাইগুলো সম্ভবত এমনই হয়।

হোটেল রুমের ডেটা ট্রান্সফারের কাজ শেষ হলে সিরিয়ান আধিকারিকের ল্যাপটপে ইনস্টল করে দেওয়া হল একটি 'বাগ'। এর মাধ্যমে পরবর্তীকালে ল্যাপটপের যাবতীয় গতিবিধি দেখা যাবে তেল আভিভে বসেই। সিগন্যাল দিয়ে দেওয়া হল হোটেল লাউঞ্জের মোসাদের সুন্দরী এজেন্টকে, 'বাগান পরিষ্কার হয়ে গেছে।' বেচারা সিরিয়ান কর্তার আম আর ছালা দুইই গেল সেবারের মতো।

ডাগানের সামনে বিশ্লেষকরা তুলে ধরলেন যাবতীয় তথ্য। একের পর এক ছবি ফুটে উঠছিল কম্পিউটার স্ক্রিনে। আর সেগুলো দেখতে দেখতে চিন্তার ভাঁজ জন্মাচ্ছিল ডাগানের কপালে। উত্তর কোরিয়ার নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম অফিসিয়াল চৌ চিবুর সঙ্গে দেখা গেল সিরিয়ার অ্যাটমিক এনার্জির নির্দেশক ইব্রাহিম ওঠমানকে।

মরুভূমির মধ্যে একটা সুবিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেসিলিটির কয়েকশ ছবি পাওয়া গেল। আন্দাজ করা হল জায়গাটার পরিমাপ— ১৩০ ফুট × ১৩০ ফুট ৭০ ফুট। বিল্ডিংটার ভেতরকার যন্ত্রপাতির ছবি দেখেই ডাগান ধরে ফেললেন ঠিক কী ঘটে চলেছে। তাঁর মাথায় ভেসে উঠল পুরোনো একটা ছবি। উত্তর কোরিয়ার য়ংবিয়ন নিউক্লিয়ার রিসার্চ সেন্টারের রিয়্যাক্টরের হুবহু একটা রেপ্লিকা বানানো হয়েছিল সিরিয়ার বুকে কোথাও। আর তাতে মদত দিয়ে চলেছিল উত্তর কোরিয়া।

ডাগান সঙ্গে সঙ্গে কথা বললেন লন্ডনে মোসাদ টিমের সঙ্গে। নির্দেশ দিলেন যে, প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুসারে ডেটা পেয়ে যাওয়ার পর সিরিয়ান আধিকারিককে গুপ্ত ভাবে হত্যা করা হবে ঠিক করা হলেও তা যেন না করা হয়। কারণ পরবর্তী খবরাখবর পাওয়ার জন্য ওই আধিকারিক সোনার ডিম দেওয়া হাঁসের মতোই দামি।

নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের পিছনে সিরিয়া বা উত্তর কোরিয়া যেই থাক না কেন, আগামী দিনে যে সেটা ইসরায়েলের কাছে বিপদ হয়ে দাঁড়াবে তা বোঝা মাত্রই মাথা ঘুরে গিয়েছিল মির ডাগানের। আর তাঁর কাছে রাষ্ট্র সবার ওপরে। রাষ্ট্রের বিপদ এড়াতে তিনি সব করতে পারতেন। সমগ্র সিরিয়ার স্যাটেলাইট ইমেজ চাইলেন ডাগান। উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে পিন পয়েন্ট করে ফেলা হল নিউক্লিয়ার ফেসিলিটির নিখুঁত লোকেশন আল-কাবার। দেখা গেল এই এলাকা থেকে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হয়েছে অগুনতি বার। স্যাট ইমেজ এবং ল্যাপটপ ইমেজের বিল্ডিং মিলেও গেল।

খবর দেওয়া হল ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী য়হুদ অলমার্টকে। অবস্থা দেখেই ব্যবস্থার কথা বললেন তিনি। সম্ভাব্য এয়ার স্ট্রাইকের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার কথাও শুনিয়ে রাখলেন। তিন সদস্যের একটি প্যানেল তৈরি হল। ছ' মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিল সেই প্যানেল। জেনারেল ইয়াকভ আমিড্রোর প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন, 'শুধু উত্তর কোরিয়াই নয়, ইরানও এই প্রোজেক্টে সিরিয়ার পাশে আছে। ১ বিলিয়ন ডলার ফান্ডিং হয়েছে ইরানের পক্ষ থেকে। নিজেদের মাটিতে ইউরেনিয়াম এনরিচমেন্ট প্রকল্পে অসফল হলে ইরান সিরিয়ার ফেসেলিটি ব্যবহার করতে চায়।' মানে বাঘের নখ আর সাপের চোখ একই সঙ্গে ইসরায়েলকে শিকারে পরিণত করা পথ খুঁজছিল।

জুলাই, ২০০৭ সাল। উত্তর সিরিয়ার মুসলমিয়া অঞ্চলে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণে প্রাণ

হারাল ১৫ জন সিরিয়ান মিলিটারি পারসোনেল এবং আহত হল ৫০ জন ব্যক্তি। সেপ্টেম্বরের মধ্যে খবর এসে গেল ডাগানের টেবিলে— একটি স্কুড-সি মিসাইলে মাস্টার্ড গ্যাস ভরতে গিয়েই এই বিপত্তি ঘটে যায়। অবশ্য এ ঘটনার আগেই নিজেদের চর সিরিয়ায় নিয়োগ করে ফেলেছিল মোসাদ।

মোসাদ তত দিনে নিঃসন্দেহ হয়ে গেছে সিরিয়ার উদ্দেশ্য-বিধেয় নিয়ে। এবার শুধু করণীয়কে রূপ দেওয়ার পালা। য়হুদ অলমার্ট ডাগানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সিরিয়ার এই নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর কতখানি অপারেশনাল হয়েছে বা আদৌ চালু হয়েছে কি? কারণ যদি তা পুরোপুরি ভাবে সক্রিয় হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তার ওপরে এয়ার স্ট্রাইক করে বোমাবর্ষণ করলে ফল হবে প্রলয়ঙ্কর। ঘটে যেতে পারে পলিউশন পয়জনিং ক্যাটাস্ট্রফ।'

উত্তর দিতে পারলেন না মোসাদ চিফ ডাগান। আল-কাবারের এই রিয়্যাক্টর আদৌ চালু হয়েছে কিনা কিংবা হয়ে থাকলে তা কোন মাত্রায় রয়েছে তা নিয়ে কিছুই জানা ছিল না ডাগানের, কারণ তাঁদের কাছে থাকা ছবিগুলো ছিল প্রায় দেড় বছর পুরোনো।

আরম্ভ হল বাঘের নখ আর সাপের চোখ উপড়ে আনার পালা। ডাগানকে করা প্রশ্নর উত্তর খোঁজার জন্য ডাক পড়ল ইসরায়েলের সবথেকে এলিট ব্ল্যাক অপস্ ইউনিট সায়েরাত মটকলের। ইসরায়েলের সবথেকে দুর্ধর্ষ এই কম্যান্ডো ইউনিটের তুলনা টানা যায় বিশ্ববিখ্যাত এসএএস (ব্রিটিশ), সিল টিম (ইউএস) বা ডেল্টা ফোর্সের সঙ্গে। নিজের দেশের সীমানা পেরিয়ে বিভিন্ন অপারেশন সেরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে ফেরার বিষয়ে সায়েরাত মটকলের জুড়ি মেলা ভার। নিজেদের কার্যকলাপের সমস্ত চিহ্ন চুকিয়ে এরা অপারেশন সেরে এসেছে জর্ডন বা লেবাননের মতো শত্রুভূমিতেও।

আগস্ট, ২০০৭ সাল। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ১২জন মটকলিস্ট কম্যান্ডো উড়ে চলল একজোড়া সিএইচ ৫৩সি স্ট্যালিয়ন হেলিকপ্টারে। রাডারের চোখ-কান এড়াতে চপারগুলো উড়ছিল মাটি থেকে খুব অল্প উচ্চতায়। কম্যান্ডোদের পরনে ছিল সিরিয়ান সোলজারদের ইউনিফর্ম। চিরাচরিত এম ১৬ রাইফেলের বদলে কম্যান্ডোদের হাতে ছিল একে ৪৭। এটাও ছিল ওদের ছদ্মবেশের অন্যতম অঙ্গ। ক্যামোফ্ল্যাজের জন্য সিরিয়ান মডেলের পুরোনো মিলিটারি জিপ বয়ে নিয়ে যাওয়া হল চপারে। মাটিতে নামার পর পরিবহনের ব্যাপারটা মাথায় রাখতে ভোলেনি মটকলিস্টরা।

ব্যাক আপ টিম সঙ্গ দিল সমানে। ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টার দুটি ছাড়াও ছিল একাধিক অ্যাটাক হেলিকপ্টার এবং একটি রেসকিউ চপার। ইসরায়েলের সুরক্ষিত মাটি থেকে সুদূর সিরিয়ার মরুভূমিতে দেশের মানুষকে বিপন্ন অবস্থায় কি ফেলে আসতে পারে ইসরায়েল? একটি কম্যান্ডো প্লেন তাই সমানে রাডার পরিধি ও সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল সিস্টেমের সীমার ওপরে চক্কর দিতে লাগল সিরিয়ার আকাশে। তার কাজ ছিল সিরিয়ান মিলিটারি কমিউনিকেশনকে ডিকোড করতে থাকা এবং বিপদের আঁচ পেলেই আগাম সতর্কতা দেওয়া।

কম্যান্ডোদের ব্যক্তিগত কিটের মধ্যে কত ওজনের অস্ত্র বা সরঞ্জাম দেওয়া হবে এই নিয়ে দ্বিধা ছিল প্রথম থেকেই। বিপদসংকুল এই মিশনে ধরা পড়ার সম্ভাবনাও ছিল প্রবল। তাই পলায়নপথে বাধা যতটা সম্ভব কম রাখাই ছিল উদ্দেশ্য। নিউক্লিয়ার ফেসিলিটি থেকে প্রায় এক মাইল দূরত্বে নামিয়ে দেওয়া হয় কম্যান্ডোদের। শুধুমাত্র একটি কম্পাসের সাহায্য নিয়ে বা অনেক সময় তারও অনুপস্থিতিতে ভিনদেশের মাটিতে নিজের লক্ষ্যকে খুঁজে বের করতে ওস্তাদ সায়েরাত মটকল টিম।

টিমের পরিকল্পনা নিখুঁত। একটি দল স্কাউট গাইডের কাজ করে জানান দেবে রাস্তা সাফ আছে কিনা। কোর টিমের তুলনায় ১০০ মিটার এগিয়ে থাকবে স্কাউটরা। টু ওয়ে কমিউনিকেশন বজায় থাকবে সবসময়। পথের বিপদ নেই জানলে তবেই এগোবে কোর টিম। প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর কম্যান্ডারের নির্দেশ মেনে টিমের সদস্যরা থামবে। নিজেদের কিট থেকে দরকারি এনার্জি বার ও ড্রিঙ্ক খেয়ে নেবে। খাওয়ার পর যে কোনো প্যাকেট বা বোতল বাইরে না ফেলে রাখতে হবে নিজের কিটব্যাগের মধ্যেই।

কোর টিমের প্রত্যেক অপারেটর সদস্যকে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়েছিল ভূবিজ্ঞানী, পদার্থবিদদের অধীনে। কী দেখতে হবে, কোন জিনিসটা খোঁজা দরকার, কীভাবে চিহ্নিত করতে হবে দরকারি বিষয়কে তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল নিপুণ ভাবে। রিয়্যাক্টরের কাছাকাছি পৌঁছানো মাত্রই টিম লিডারের নির্দেশে দলের সদস্যরা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরতে শুরু করে দিল আবর্জনা, মাটি, ঘাসপাতা এবং জলের নমুনা। মাটির নমুনা সংগ্রহ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত মাটিও খুঁড়তে হচ্ছিল।

মূল কাজ অর্থাৎ নমুনা সংগ্রহ করতে লেগেছিল মাত্র কয়েক মিনিট। আসল কাজটা শুরু হচ্ছিল তারপরে। স্যাম্পেল কালেক্টরদের পিছনে একজন করে সদস্য একটা অত্যাধুনিক যন্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকছিল। সেটাকে ঝাড়ুর ই-ভার্সন বলা চলে। খোঁড়া গর্তকে বুজিয়ে ফেলা বা সায়েরাত মটকল টিমের উপস্থিতিজনিত যে কোনো চিহ্নকে বিলোপ করার কাজটা সারছিল তারাই। অর্থাৎ, সাক্ষ্যপ্রমাণ রাখা চলবে না। সাক্ষী রইল শুধু নীরব ইউফ্রেটিস।

ফোর্স কম্যান্ডার সিগন্যাল দেওয়া মাত্রই আরম্ভ হল প্যাক আপ মিশন। নিরাপদেই ইসরায়েলে ফিরল পুরো সায়েরাত মটকল টিম। সংবাদ দেওয়া হল দেশের প্রধানমন্ত্রী য়হুদ অলমার্টকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। কারণ টিমের একটি সামান্য ভুলও দুই দেশের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

ল্যাব রেজাল্ট জানা গেল কয়েক দিনের মধ্যেই। সেখানে দেখা গেল, মাটির নমুনা পজিটিভ। সিরিয়ার আল-কাবারে নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরের উপস্থিতি নিয়ে আর কোনো দ্বিধা রইল না।

ডাগানের সঙ্গে মিটিংয়ে বসলেন য়হুদ অলমার্ট।

ডাগান বললেন, 'নমুনা পরীক্ষণ পরিণাম বলছে যে, রিয়্যাক্টর পুরোপুরি চালু হয়নি। এবার?'

'দ্য রিয়্যাক্টর ইজ অন ইটস ওয়ে টু বিকাম হট। আর দেরি করলে চলবে না। এখুনি আঘাত হানতে হবে!' বললেন প্রধানমন্ত্রী অলমার্ট।

একটি স্বাধীন দেশের বুকে অপর একটি রাষ্ট্রের বোমাবর্ষণ কিন্তু সহজ কাজ নয়। আর এই কথাটা খুব ভালো ভাবেই জানতেন প্রধানমন্ত্রী অলমার্ট। উনি তৎকালীন আমেরিকান রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশের সম্মতি চাইলেন এক্ষেত্রে। বিভিন্ন সূত্র দাবি করে যে, উক্ত নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরের সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার সম্পর্কের কথা শোনা মাত্রই সেটাকে ধ্বংস করার অনুমতি দেন রাষ্ট্রপতি বুশ। যদিও জুনিয়র বুশের আত্মজীবনী 'ডিসিশন পয়েন্টস্'-এ দাবি করা হয়েছে যে, অলমার্টকে পারমাণবিক রিয়্যাক্টর ধ্বংস করার ব্যাপারে কোনো সম্মতি উনি দেননি। বুশের বক্তব্য অনুসারে নিম্নরূপ ছিল সেই কথোপকথনঃ

বুশ: একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে এভাবে আপনি বোমা ফেলতে পারেন না। নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে অস্ত্র উৎপাদন হচ্ছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

অলমার্ট: বিষয়টাকে দীর্ঘ এবং বিরক্তিকর করে তুলছেন আপনি। ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য যা করা দরকার, তা আমি করবই।

এরপর একটি জরুরি বৈঠক ডাকেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী এবং দেশের সামরিক বিভাগের প্রধানরা। সিরিয়ার পারমাণবিক রিয়্যাক্টর ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সিদ্ধান্তকে সাদরে আহ্বান করেন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। কর্মসূচির একাত্মতা নিয়ে উনি কোনো প্রশ্নই তোলেননি।

প্রশ্ন উঠল অন্য বিষয় নিয়ে। আক্রমণ হানা হবে কোন পথে? স্থলপথে নাকি বায়ু মাধ্যমে? পক্ষে এবং বিপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেখানো হল। স্থলপথে আক্রমণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভোট পড়ল বেশি। যেমন যদি কোনো অপারেটর ধরা পড়ে যায় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতি সমস্যায় পড়বে; অত সুবিশাল একটি ফেসিলিটিকে বিধ্বস্ত করার মতো দরকারি বিস্ফোরক প্লান্ট করা না গেলে ব্যাপারটা পর্বতের মূষিক প্রসবে পরিণত হবে। অতএব, বিমান হানাই শ্রেয়।

প্রধানমন্ত্রীর লিখিত নির্দেশ বেরোল— প্রিপেয়ার ফর অ্যান এয়ার অ্যাটাক অন দ্য সিরিয়ান রিয়্যাক্টর অ্যান্ড দ্য মিটিং কোডনেমড দ্য অপারেশন 'অপারেশন অর্চার্ড'।

ডাকা হল ইসরায়েলের একটি স্পেশ্যাল ফোর্সেস ইউনিট, স্কোয়াড্রন ৬৯- কে। এর ২৫ বছর আগে একটি ইরাকি নিউক্লিয়ার ফেসিলিটিকে বিধ্বস্ত করার কাজে অভিজ্ঞ স্কোয়াড্রন ৬৯-কেই বেছে নেওয়াতে কোনো দ্বিমত হল না। এফ ১৬ এবং এফ ১৫ ফাইটার জেট সমৃদ্ধ এই বাহিনীর কাছে আকাশপথে হামলা চালানো এমন কিছু কঠিন কাজ ছিল না। তবে সিরিয়া রাশিয়ার কাছ থেকে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল টেকনোলজি কিনে নেওয়ায় সেদিকটা একটু ভেবে দেখার মতো তো ছিলই। যদিও অমন বহু এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে বোকা বানাতে পারার অভিজ্ঞতায় ঝুলি ভর্তি ছিল স্কোয়াড্রন সিক্সটি নাইনের। এই ফাইটার জেটগুলো থেকে ইসিএম ফ্লেয়ার ব্যবহার করে সিস্টেম গাইডেড মিসাইলকে পথভ্রষ্ট করার ব্যবস্থাও ছিল।

পুরো মিশনের দায়িত্ব দেওয়া হল ইসরায়েলি এয়ারফোর্সের জেনারেল এলিজার কেডি-কে। নিজের কাজের ক্ষেত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন এই ব্যক্তি ইসরায়েলের এয়ার ডিফেন্স, অ্যাটাক মেকানিজম এবং অস্ত্রভাণ্ডারকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন যে সেই কথাগুলো আজকের দিনে বসে শুনলেও মনে হয় কল্পবিজ্ঞানের গল্প। একজন দুদে ফাইটার পাইলট হিসেবে উনি শত্রুপক্ষের ডিফেন্সে ভয়ানক আক্রমণ চালানোর পাশাপাশি আমজনতার ন্যূনতম ক্ষতির তত্ত্ব তুলে এনেছিলেন। একটি বিশাল বিল্ডিংয়ের একটি নির্দিষ্ট তলার একটা নির্দিষ্ট কক্ষে হামলা চালানোর মতো নিখুঁত লক্ষ্যভেদী অস্ত্রের উদ্ভাবনে ওঁর যোগদান অনস্বীকার্য। জ্যামে ভরা রাস্তায় একটি মাত্র মোটরবাইকে হামলা চালিয়ে তার আরোহীকে নিকেশ করাতে চাইলে সেটা করার মতো দক্ষতাও ইসরায়েলি এয়ারফোর্স স্পর্শ করেছিল ওঁর আমলেই।

অপারেশন অর্চার্ডের জন্য নিজে পাইলট বাছাই করলেন জেনারেল কেডি। এয়ার রেইডের আগে চলল বেশ কয়েক দিনের প্রশিক্ষণ পর্ব। প্রশিক্ষণের সময়ে রাতের বেলায় ছোট আকারের টার্গেটে নিশানা লাগিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে হত পাইলটদের। আঘাত হানতে

হত ৩৫ ডিগ্রি কোণ করে। যে ডামি বোমাগুলো ব্যবহার করা হত, সেগুলো ফাটা মাত্রই ফসফরাসের সাদা ধোঁয়া ছেয়ে যেত বিমানের নীচে। তার মধ্যেই করতে হত লক্ষ্যভেদ।

এসবের মাঝে ৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর দফতরে খবর এল যে, সিরিয়ার উপকূলে হাজির হয়েছে একটি ১,৭০০ টনের জাহাজ। জলযানটি উত্তর কোরিয়ার। কাগজপত্র অনুসারে সেই জাহাজ সিমেন্ট বহন করে নিয়ে এলেও বাস্তবে তার মধ্যে লুকিয়ে আনা হয়েছে নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরকে পুরোপুরি ভাবে চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। অতএব, আঘাত হানার জন্য ইসরায়েলের হাতে আর বেশি সময় রইল না।

৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৭। রাত ১১: ৫৯। স্কোয়াড্রন সিক্সটি নাইনের ১০ জন পাইলট উড়ানের প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিলেন। টেক অফ করার আগে তাদের বলা হল কোন মিশনে যাচ্ছেন। কেউ জানতেন না লক্ষ্যবস্তুই বা কী? কিছুক্ষণের মধ্যেই ইসরায়েলের রামাত ডেভিড এয়ারবেসের রানওয়ে থেকে প্রতি ২০ সেকেন্ডের তফাতে আকাশে পাড়ি জমাল একটার পর একটা এফ ১৬ আর এফ ১৫। প্রতিটি বিমানকে সাজনো হয়েছিল ৫০০ পাউন্ড ওজনের লেজার গাইডেড এজিএম ৬৫ বোমা দিয়ে।

সাগরপানে উড়ে গেল জেটগুলো। গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৬০০ মাইল। সিরিয়ার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে এড়ানোর জন্য প্লেনগুলো বেছে নিল একটি বিকল্প পথ। সিওরায়েল থেকে পশ্চিমে গিয়ে ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে উত্তরে ঢুকল। তারপর বাঁক নিল পূর্বে। তুরস্ক হয়ে প্রবেশ করবে সিরিয়ায়, এ-ই ছিল উদ্দেশ্য।

ওদিকে তখন তেল আভিভের ইসরায়েলি এয়ারফোর্সের আন্ডারগ্রাউন্ড কম্যান্ড সেন্টারে উপস্থিত হয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী সহ দেশের বরিষ্ঠ সামরিক আধিকারিকেরা। সেখান থেকে জেটগুলো পেল পরবর্তী নির্দেশ— তিনটি এফ ১৫ বিমানকে বেসে ফেরার অর্ডার দেওয়া হল। বাকি সাতটি বিমান সিরিয়ান রাডারকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য মাটি থেকে ২০০ ফুটেরও কম উচ্চতায় উড়তে উড়তে এগোতে থাকল সিরিয়ার দিকে।

ঠিক ওই সময়েই জেনারেল কেডি পাইলটদের বলে দিলেন যে তাঁদের লক্ষ্যবস্তু কী হতে চলেছে। জেনারেল জানালেন, 'আপনারা এখন সিরিয়ান এয়ারস্পেসে প্রবেশ করেছেন। ওদের এয়ার ডিফেন্স খুব উন্নত হলেও চিন্তার কোনো কারণ নেই। সেই সিস্টেম আমরা আগেই জ্যাম করে দিয়েছি। লক্ষ্যবস্তুর কথা তো বলেই দিয়েছি। আর হ্যাঁ, কোনো সিভিলিয়ান এরিয়ায় বোমা ফেলবেন না। আই রিপিট... সিভিলিয়ান এরিয়ায় বোমা ফেলবেন না!'

সিরিয়ান এয়ারস্পেসে প্রবেশ করার পরপরই টাল্ল আল-আবয়াদ-এ একটি রাডার সাইটকে ধ্বংস করে দেয় বিমানগুলি। একাধিক রাডারকে জ্যাম করে দেওয়া হয়েছিল আগেই। সেক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল কোড। রাশিয়ানদের থেকে কেনা রাডারগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য রাশিয়ানদেরই কিনে নিয়েছিল মোসাদ। পেয়ে গিয়েছিল রাডারকে বোকা বানাবার জ্যামিং কোড। জ্যামিং প্রসেস আরম্ভ করে দিতেই রাডারে দেখাচ্ছিল ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেন ঢুকছে, আবার সবকিছু শূন্য হয়ে যাচ্ছিল পর মুহূর্তেই। স্বাভাবিক ভাবে সিরিয়ানরা মনে করছিল প্রযুক্তিগত কোনো সমস্যার মুখে পড়েছে তারা। সিরিয়ার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমটাই চলে গিয়েছিল মোসাদের কবজায়।

ইসরায়েলি পাইলটদের প্লেনে থাকা অন বোর্ড কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেওয়া হল আল-কাবার নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরের নিখুঁত অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশের বিবরণ। নিজেদের অবস্থান

থেকে দক্ষিণে বেঁকে গেল ফাইটার জেটগুলো। বোমা যে ফেলতে হবে সেদিকেই।

অপারেশন অর্ডার্ডের সবথেকে বিপজ্জনক অংশ আরম্ভ হল এখান থেকেই। বোমা চার্জ করার সময়ে ফাইটার প্লেন সবথেকে বেশি অরক্ষিত অবস্থায় থাকে। নিজেদের সুরক্ষার দিকটা তখন পাইলটের পক্ষে খেয়াল রাখা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আরম্ভ হল বোমাবর্ষণ। একটি করে আঘাত হানার পর প্রতিক্রিয়ায় থরথর কেঁপে উঠছিল বিমানগুলোও। গুঁড়িয়ে দেওয়া হল রিয়্যাক্টরের ছাদ, দেওয়াল। প্রতিটা দৃশ্য ধরে রাখা হল ক্যামেরায়। সিরিয়ার যে ক্ষতি হল, তা ছিল অপূরণীয়।

সবচেয়ে উদ্বিগ্ন অবস্থায় সময় কাটছিল ইসরায়েলের এয়ারবেসের সেনানায়কদের তথা প্রধানমন্ত্রীর। কী ঘটছে, না ঘটছে তার একমাত্র আন্দাজ করা সম্ভব হচ্ছিল পাইলটদের সঙ্গে কথা বলেই। নচেৎ শত্রুপক্ষ জানতে পেরে গিয়ে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে কিনা বা নিলেও তার ফলে কোনো ক্ষতি হয়ে গেল কিনা বোঝার রাস্তা ছিল না ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আগে অবধি। প্রতিটা সেকেন্ডকে মনে হচ্ছিল শতাব্দীর মতো দীর্ঘ। আর এমন সময়ে রেডিও ট্রান্সমিশনে ভেসে এল একটা শব্দ— 'অ্যারিজোনা'। উল্লাস করে উঠল ইসরায়েলি এয়ারবেসে উপস্থিত সকলে। কারণ অপারেশন অচার্ড আরম্ভ হওয়ার আগে পাইলটদের বলে দেওয়া হয়েছিল যে, লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনে তা ধ্বংস করতে পারার পরেই যেন বলা হয় এই শব্দটিকে। সংবাদ এল, কোনো ইসরায়েলি বিমানের ক্ষতি হয়নি এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরটি। দ্য মিশন ইজ ওভার।

এরপর বিন্দুমাত্র সময় ব্যয় না করে ইসরায়েলের পাইলটরা বেরিয়ে আসে সিরিয়ার এয়ারস্পেস থেকে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী অলমার্ট আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বুশকে ফোনে করে বলেন, 'নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সিরিয়া, ইরান আর উত্তর কোরিয়ার সাজানো বাগান।' কিন্তু বাস্তবে বিরোধী পক্ষের বাগান থেকে তার প্রিয় ফুলটাকে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল মাত্র, কাঁটা সাফ হয়নি তখনও। আর সেই কাঁটার নাম ছিল সুলেইমান। জেনারেল সুলেইমান।

অপারেশন অর্চার্ড তাই এখানেই শেষ হয়েও শেষ হল না। সিরিয়া প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া রূপে জানাল যে, ইসরায়েলের কয়েকটি যুদ্ধবিমান তাদের দেশের আকাশসীমা লঙঘন করে ঢুকে পড়ায় তারাও প্রতি-আক্রমণ করে বের করে দেন বিমানগুলিকে। ওদিকে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে এই হামলা নিয়ে কোনো কথা তোলা হয় না।

কিন্তু মির ডাগান ছিলেন পারফেকশনিস্ট। একটা খুঁতখুঁতানি কিছুতেই যাচ্ছিল না ওঁর মন থেকে। সাতটা দীর্ঘ বছর ধরে একটা নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর তৈরির কাজ চালিয়ে গেল সিরিয়ানরা, আর সেটার খবর মোসাদ পেল না? কীভাবে সম্ভব হল এত গোপনীয়তা?

আর ডাগান হলেন ডাগান! বলা হয় যে, পাতালে ঢুকে লুকোলে ঈশ্বরের প্রকোপ থেকে মুক্তি মিললেও মিলতে পারে, কিন্তু ডাগানের হাত থেকে পার পাওয়া অসাধ্য ব্যাপার। মোসাদের তদন্তকারীরা খুঁজে বের করলেন একটা নতুন তত্ত্ব। সিরিয়া নিজেদের রিয়্যাক্টর তৈরি করার জন্য খবরাখবর আদানপ্রদানের সময়ে কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমের ব্যবহারই করেনি। পুরোনো দিনের মতোই কাগজে-কলমে নথিপত্র নেওয়াদেওয়া করা হয়েছিল এক্ষেত্রে। হতে পারে সেই পদ্ধতি অনেক ধীরগতির, কিন্তু নিরাপত্তার বিষয় ছিল প্রথম। আর সত্যিই তা ফলদায়ী হয়েছিল। তাই বিপক্ষের দ্বারা হ্যাক হওয়া বা ডেটা কপি করে ফেলতে পারার মতো বিপদ ঘটেনি।

প্রতি বারেই সিরিয়া বা উত্তর কোরিয়া কোনো তথ্য পাঠানোর সময়ে তার প্রিন্ট বের করে নিয়ে সেটাকে একটা খামে ভরে খামটার মুখ বন্ধ করে দিত গালা বা মোম দিয়ে সিল করে। ওপরে লেখা হত 'টপ সিক্রেট'। তারপর সেটাই ডাকে বা ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে গিয়ে পড়ত উলটো দিকের হাতে। এভাবেই সাত বছর ধরে ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল এত বড় একটা প্রকল্পকে।

এসব কিছুর মাস্টারমাইন্ড ছিল জেনারেল মুহম্মদ সুলেইমান। সে ছিল সিরিয়ান প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের ছায়াসঙ্গী তথা অন্যতম পরামর্শদাতা। মোসাদের টনক নড়ল আরও নতুন কিছু তথ্যে। নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর ধ্বংস হওয়ার পরেও আবার নতুন রি-অ্যাক্টর বানাবার সর্বপ্রকার সম্ভাব্য প্রয়াস করে চলেছে সিরিয়া, যার নেপথ্য-নায়ক ছিল এই সুলেইমান। এবারে নতুন করে প্রকল্প করা অনেক সহজ ছিল সিরিয়ার কাছে। অর্থের জোগান ছিল, প্রযুক্তির বেশিরভাগটাই চলে এসেছিল আয়ত্তে, আর ছিল অদম্য মনোবল। এমতাবস্থায় একটি শক্তিশালী পারমাণবিক অস্ত্র থেকে সিরিয়ার দূরত্ব ছিল হয়তো মাত্র পাঁচটি বছর।

ডাগান তথা মোসাদ একটা কথা খুব ভালো করেই বুঝে গিয়েছিল যে, যত দিন সুলেইমান টিকে থাকবে, ততদিন পারমাণবিক অস্ত্রের বিপদ হাতে নিয়ে ভয় দেখানোর ক্ষমতা রাখবে সিরিয়া।

শুরু হল সুলেইমানকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার যোজনা। বাস্তবে দেখা গেল সুলেইমানকে হত্যা করার থেকে সহজ ছিল নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে বম্বিং করা। একটা স্থাবর সম্পত্তিকে বোমা মেরে বিধ্বস্ত করা, আর একজন বুদ্ধিমান মানুষকে মারা এক কাজ নয়। সুলেইমানকে সবসময়ে ঘিরে থাকত কয়েক জন দুর্ধর্ষ অঙ্গরক্ষক। সশস্ত্র সেই বাহিনীকে টেক্কা দিয়ে সুলেইমানকে নিহত করা অসাধ্য কাজ হয়ে দাঁড়াল মোসাদের কাছে।

কিন্তু এ ছিল ডাগানের মোসাদ। ছল, বল বা কৌশল কোনোটার ব্যবহার করতেই ডাগান পিছপা হতেন না। প্রাথমিক ভাবে সুলেইমানের ওপরে আঘাত হানতে না পারলেও তিনি নজরে রাখলেন সুলেইমানকে। তক্কে তক্কে থাকল মোসাদ। ২০০৮ সালের গ্রীষ্মকাল। মোসাদের কাছে ইন্টেল রিপোর্ট গেল যে, নিজের দামাস্কাসের বাড়ি ছেড়ে তারতাসের একটি ভিলায় ছুটি কাটাতে যাবেন জেনারেল সুলেইমান। তারতাস একটি সৈকত নগরী। অনুপম সৌন্দর্যে ভরা এই শহরে কাটানো ছুটিই যেন সুলেইমানের শেষ ছুটি হয় তার জন্য তৎপর হয়ে উঠল মোসাদ।

এ ধরনের কাজে প্রয়োজন ছিল গুপ্তহত্যার। আর তাই ডাকা হল ইসরায়েলের ব্ল্যাক অপস্ টিম 'দ্য কিডন'-কে। সতর্ক শিকারীর মতোই আগুপিছু বিবেচনা করে এগোয় কিডন টিম। তারা ছকে ফেলল সুলেইমানের ভিলার নকশা। প্রাসাদোপম বাড়িটা দুর্গের মতোই অভেদ্য। তার একদিকে নীল সমুদ্র। সাগরের দিকের খোলা বারান্দাতেই নিজের অতিথিদের জন্য পার্টির আয়োজন করে সুলেইমান।

২ আগস্ট, ২০০৮। সন্ধ্যাবেলা। সুলেইমানের ভিলায় তখন হইহই করছে অভ্যাগতরা। বারান্দায় পাতা টেবিলে বসে একে অপরের শুভকামনা করে গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে অতিথিরা গলায় ঢালছেন সোনালি পানীয়। নেশা চড়ছে ক্রমশ। ভূমধ্যসাগরের বুক চিরে আসা একটি ইয়ট এসে থেমে গেল সুলেইমানের ভিলা থেকে প্রায় এক মাইলেরও বেশি দূরত্বে। জলযান থেকে ডুবুরির কালো পোশাক পরে জলে নেমে গেল দুজন মানুষ। সঙ্গে জলেও ব্যবহার উপযোগী থাকবে এমন অস্ত্র। ভাসতে ভাসতে সেই লোক দুটোই এসে পৌঁছাল ভিলা থেকে ১৫০-২০০ গজের দূরত্বে। অগাধ জলরাশিতে মানুষ দুজনকে দুটি

নিশ্চল বিন্দু বললেও বেশি বলা হয়। তাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া ছিল কার্যত অসম্ভব।

স্নাইপারের মাধ্যমে তারা নজর রেখেছিল সুলেইমানের ওপরে। বন্ধু, আত্মীয়, অভ্যাগতদের নিয়ে জেনারেল টেবিলে খেতে বসলেন। দুজন স্নাইপারই নিশানার জন্য ক্রসহেড স্থির করল সুলেইমানের ওপর। ট্রিগার টিপতে যাবে নিশানাবাজরা এমন সময়ে এক অভ্যাগত এসে দাঁড়াল সুলেইমানের সামনে। থামতে বাধ্য হল স্নাইপাররা। নিজেদের অবস্থান বদলে আবার নিশানা স্থির করল তারা।

দুজন স্নাইপারের নিশানার মধ্যে তালমিল বজায় রাখার জন্য ব্যবস্থা করা ছিল ইলেট্রনিক কাউন্টডাউনের। যাতে একইসঙ্গে ফায়ার করা সম্ভব হয়। টাইমার সেট করে কাউন্টডাউনের তালে দুজনেই গুলি চালায় এবার। নির্ভুল নিশানা। একটি গুলি গিয়ে লাগল সুলেইমানের গলায়, আরেকটি বিদ্ধ করল ওর মাথাকে। বন্দুকে সাইলেন্সার লাগানো ছিল এ কথা বলাই বাহুল্য। তাই প্রাথমিক ভাবে পার্টিতে উপস্থিত লোকজনে বুঝতেই পারেনি যে ঠিক কী ঘটেছে। গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হয় সুলেইমান। মাথাটা হেলে যায় পিছন দিকে। মাথা আর গলা থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে ভিজে ওঠে তার পোশাক। হুলস্থুল পড়ে যায় আসরে।

সিরিয়ার রিয়্যাক্টরে এয়ার স্ট্রাইকের পর যেমন বলা হয়েছিল ‘অ্যারিজোনা’, তেমন ভাবেই এই গুপ্তহত্যার পর দুই ঘাতকের একজন নিজের হেডকোয়ার্টারে খবর দেওয়ার সময়ে জানায়, ‘ভেরি হ্যাপি ইনসিডেন্ট!’

সুলেইমানের হত্যাকাণ্ড নিয়ে কোনো রকমের তথ্য ফাঁস করেনি মোসাদ। তাই এই হত্যা নিয়ে অনেক কন্সপিরেসি থিওরি কাজ করে। কেউ বলে, ইসরায়েলের ফ্লোটিলা টিমের সদস্যরা এই কাজটা করেছিল। অনেকে আবার এই হত্যাকাণ্ডের পরেই একজন মোসাদ স্পাইয়ের গ্রেফতার হওয়ার কথা বলে থাকে। উইকি লিক্‌-এর তথ্য ফাঁসের সময়ে উঠে এসেছিল আরেকটি তথ্য। সেখানে জানানো হয়েছিল যে, প্রেসিডেন্টের ভাই মাহের আল-আসাদ রাজনৈতিক স্বার্থে গুপ্তহত্যা করিয়েছিলেন সুলেইমানের। আবার ফ্রান্সের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, সুলেইমানের ভিলায় আদৌ সুলেইমানকে হত্যাই করা হয়নি। ওর গাড়িতেই ওকে গুলি মেরে হত্যা করা হয়। বাকি সবটাই সাজানো ঘটনা।

তবে জঙ্গি সংগঠন হিজবুল্লাহর পক্ষ থেকে হাসান নাসারাল্লাহ্‌ বলেছিল, ‘২০০৬ সালের জুলাই মাসে আমাদের সাহায্য করেছিল জেনারেল সুলেইমান। তারই খেসারত চোকাতে হল ওকে। ইসরায়েল বদলা নিল।’

মধ্যপ্রাচ্যে হিজবুল্লাহ্‌ সাপের মতোই খতরনাক। আর বাঘের মতো শক্তিশালী সুলেইমান তাদের সাহায্য করায় ভয়ানক জোড়া ফলার মতো এগোচ্ছিল তারা। তাই বাঘের নখ আর সাপের চোখকে নষ্ট করে দিতে কোনো কসুর বাকি রাখেনি মোসাদ।

আট-ন’ বছরের বাচ্চাটার পিঠে বেত পড়ছে সপাসপ। ছেলেটা থরথর করে কাঁপছে। প্রার্থনার ভঙ্গীতে তার দুই হাত নিবদ্ধ। মুখে টু শব্দটি নেই। ফরসা মুখটা হয়ে উঠেছে টকটকে লাল। অত মার খেয়ে হাঁফ ধরছে। হাঁফিয়ে উঠেছেন ছেলেটির বাবাও। তাঁর হাতেই বেত যে!

মারতে মারতে বাবা বলছেন, ‘বল, আর যাবি ওখানে?’

প্রথম বারে ছেলেটা কোনো উত্তরই দিল না। আবার ধেয়ে এল প্রশ্ন, সঙ্গে বেতের ঘা-ও। এবার মাথা নীচু করে ছেলেটি বলল, ‘আমি ওখানে গেলে কার, কী ক্ষতি হবে?’

‘ক্ষতি নয়, হারাম হবে... হারাম! আমরা মুসলিম। ওরা জিউস। শত শত বছর ধরে ওদের সঙ্গে আমাদের লড়াই চলছে। ইজ্জতের লড়াই, ইমানের লড়াই। আর তুই কিনা ওদের উপাসনার সময়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকছিস? এই শিক্ষা হচ্ছে তোর? দোজখেও জায়গা হবে না! ইয়াল্লাহ!’

‘আমি তো ওদের সঙ্গে ইবাদত করতে যাই না, ওদের মন পড়তে যাই।’

‘মন পড়তে যাস? কী হবে শুনি মন পড়ে?’

‘কারো সঙ্গে তর্ক করতে গেলে আগে তার যুক্তি বুঝতে হয়। সেটাই করছি।’

পরের আঘাত করার আগে বাবা ভাবলেন, ছেলেটা কি সত্যিই এই কথাগুলো বুঝে বলছে? নাকি ও পাগল? ওকে মারা কি ঠিক হবে? তাই আরেকবার সুযোগ দিলেন ছেলেকে — ‘কথা দে, আর জিউসদের আড্ডায় যাবি না।’

‘আমি তো যাবই!’

এরপরে বেতের ঘায়ে চামড়া ফেটে গিয়েছিল ছেলেটার। রক্তাক্ত দেহের ভেতরে তার থেকেও বেশি ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল ছেলেটার মন। বাবার প্রতি জন্ম নিয়েছিল অকল্পনীয় ঘৃণা। সেই ঘৃণা শেষ হয়নি পরবর্তীকালে পিতার মৃত্যুতেও।

আর সেদিনের সেই ছোট্ট ছেলেটা? তার কী হল?

সে বড় হতে হতে ‘শের’ হয়ে গেল। মরুসিংহ!

মোহাম্মেদ আবদেল রহমান আবদেল রাউফ আরাফাত অল-কুদওয়া অল- হুস্পেইনি, ওই মরু সিংহের নাম। কারো চোখে তিনি নায়ক; কেউ বলে, তিনি খলনায়ক। ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্মের প্রথম দিন থেকেই তার ঘোর বিরোধী এই ব্যক্তিত্ব দশকের পর দশক জুড়ে পিএলও-এর মাথা হয়ে ইসরায়েলের জননায়কদের বুকে কাঁপন ধরিয়েছেন। ইয়াসের আরাফাত-হ্যাঁ, এই নামেই সারা বিশ্ব তাঁকে চেনে।

কিন্তু এত বড় একটা নাম থাকতে পিএলও চেয়ারম্যান কীভাবে ‘ইয়াসের আরাফাত’ হয়ে গেলেন?

মধ্যপ্রাচ্যের অবাক করা অপার ভাণ্ডারের মতোই অবাক করে দেওয়ার মতো সেখানকার রীতিনীতিও। তেমনই একটি উদাহরণ হল ইয়াসের আরাফাতের পিতৃপ্রদত্ত এই

নাম। নামের ছত্রে ছত্রে যুক্ত রয়েছে তাঁর বংশ, গোত্র, স্থান— সবকিছুর ইতিহাস। 'মোহাম্মেদ আবদেল রহমান'ই হল ইয়াসের আরাফাতের আসল নাম। ইংরাজিতে যাকে বলে, ফার্স্ট নেম। স্বীয় জাতির রীতি মেনে পিতার নাম 'আবদেল রাউফ' যুক্ত হয়েছিল। আর তার ঠিক পরেই বসা 'আরাফাত' ছিল ইয়াসের আরাফাতের পিতামহের নাম। জনজাতির পরিচয় মিলত 'অল-কুদওয়া' থেকে, ঠিক যেমন গোত্রের পরিচয়ের জন্য ছিল 'অল- হুস্পেইনি'। আরাফাতের জন্ম হয়েছিল মিশরের কায়রো শহরে। আর সেখানকার রীতি ছিল নামের প্রথমে 'মোহাম্মেদ' থাকলে সেটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া। 'মোহাম্মেদ' বাদ দিয়েই ক্ষান্ত হননি আরাফাত। বাবার দেওয়া পুরো নামটাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দিলেন। ছিন্ন করে ফেললেন নিজের পিতার নামটাকেও।

আরাফাত ছাত্রজীবন থেকেই কট্টর ইসলামিক পন্থার দিকে ঝুঁকেছিলেন। প্রথমে মুসলিম ব্রাদারহুড জয়েন করেন। ইসলামকে কট্টর তথা তাঁদের শুদ্ধতম রূপে বিশ্বজনীন করে তোলাই হয়ে উঠেছিল আরাফাতের একমাত্র লক্ষ্য। নিজেকে হজরত মহম্মদের অনুসারী রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিলেন তিনি এবং সেইমতো পদক্ষেপও নিলেন। হজরত মহম্মদের এক অন্যতম সঙ্গী অম্মার ইবন ইয়াসিরের নামের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নিজের নাম রাখলেন 'ইয়াসের'। গোত্র এবং জনজাতির পরিচয় বাহক অংশ বাদ পড়লেও বাদ গেল না 'আরাফাত'। ইসলামে মক্কার আরাফাত উপত্যকার গুরুত্ব অপরিসীম। পয়গম্বর মহম্মদ অন্তিম বিদায়ের আগে এখানেই নিজের বাণী ঘোষণা করেছিলেন।

'আরাফাতের পিএলও গঠন' কিংবা 'ফাতাহ্ নামক সংগঠনের জনক হিসাবে আরাফাত' এই জাতীয় বিষয় নিয়ে লিখতে বসলে পাতার পর পাতা ব্যয় করতে হবে। ইসরায়েলকে একটার পর একটা ধাক্কা দিয়ে গেছেন আরাফাত। আজকের শিব খেরা বা সন্দীপ মাহেশ্বরীকে দেখলে অসামান্য মোটিভেশনাল স্পিকার মনে করা হয়। ইয়াসের আরাফাতকে শুনলে মনে হবে এঁরা ওঁর কাছে শিশু। হাজার হাজার যুবককে কট্টরপন্থী ইসলামের জন্য উদ্বুদ্ধ করে প্রাণ দিতে ও নিতে রাজি করিয়ে ফেলা কিন্তু চাট্টিখানি কথা নয়! জুডাইজমে আস্থাবান ইসরায়েল, জায়নিস্ট রাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রচণ্ডতম শত্রুর নাম ছিল ইয়াসের আরাফাত।

টানা চার দশক ধরে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে একক ব্যক্তিত্ব হিসাবে আরাফাত যেভাবে খবরে থেকেছেন তা সম্ভবত এর আগে কখনো হয়নি এবং এরপরেও কখনো হবে না। ইসরায়েলের বিরোধ হোক বা শান্তিচুক্তির কথা কিংবা সেই শান্তিচুক্তির প্রক্রিয়াকে ভঙ্গ করে 'সেকেন্ড ইন্তিফাদা', নাম একটাই- আরাফাত... আরাফাত!

ইসরায়েলের মাথাব্যথার এই অন্যতম কারণের উদ্দেশ্যে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী আরিয়েল শ্যারন একবার বলেছিলেন, 'মাই রেসপন্স, মাই রিয়েকশন উইল বি টোটালি ডিফারেন্ট।'

এই কথা শুনে ইয়াসের আরাফাতের উপদেষ্টা বলেছিলেন, 'আপনি কি হুমকি দিচ্ছেন?'

'আমি কাউকে হুমকি দিই না। আপনারা আমার নীতি তো জানেনেই, যেই ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, আমি তাকে শায়েস্তা করে দেব। পথের সেই কাঁটাটাকে সরিয়ে দেব!'

কিন্তু সহজ হয়নি আরাফাত নামের এই কাঁটাকে উপড়ে ফেলা। যখনই কোনো পিস প্রসেস এগিয়েছে, তখনই বাধার কারণ হয়েছেন ইয়াসের। দিনের পর দিন ইসরায়েল কিংবা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা করে থেকেছে যে, কবে ইয়াসের আরাফাত তাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াবে। কবে বন্ধ হবে তাঁর খেলা। ২০০৩ সালে আরাফাতকে মসনদচ্যুত করার চেষ্টাও হয়। কিন্তু কেউ তা করে দেখাতে পারেনি। 'তোমার চেষ্টা, আমার জয়' সুলভ ভঙ্গীতে ক্ষমতা হাতে রেখেছেন আরাফাত।

বিশ্ব রাজনীতির চালও বড় অদ্ভুত। আমেরিকার মতো বিগ ব্রাদার সেখানে বড় ভূমিকা নেয়। কখনো টমকাকার দেশের মানুষেরা বলেন, আমরা সন্ত্রাসবাদ সহ্য করব না। আবার কখনো তাঁদেরই উবাচ, ইসরায়েল যেন আরাফাতের কোনো ক্ষতি না করে।

হ্যাঁ, এমনই কথা বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল আরিয়েল শ্যারনকে দিয়ে। কিন্তু তাঁর মুখের কথাই কি মনের কথা ছিল?

আরাফাতের উত্থান প্রায় সকলের জানা। ইতিহাস বলছে, আরাফাতের বিরুদ্ধে লড়াই চলেছে বটে, কিন্তু তাঁর পতন ঘটানো যায়নি। ইসরায়েলের মতো সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন প্রতিপক্ষও আরাফাতের টিকিটি ছুঁতে পারেনি বলেই দাবি করে প্যালেস্টাইন। কিন্তু সত্যিই কি তাই? কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল প্যালেস্টাইনের মরুসিংহের?

১২ অক্টোবর, ২০০৪। নিজের বাসগৃহে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন আরাফাত। খাওয়ার চার ঘণ্টার মধ্যেই গা গুলোনো, বমি, তলপেটে যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে যায়। ভয়ানক দুর্বল বোধ করছিলেন আরাফাত। মূর্ছাও যান। কিন্তু জ্বর আসেনি। প্যালেস্টাইনের এই নেতার চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা ওমর ডাকা সঙ্গে সঙ্গেই ওষুধ দেন। কিছু দিন আগেই 'ফ্লু'তে আক্রান্ত হয়েছিলেন আরাফাত, তাই ওমর ভেবে নিয়েছিলেন হয়তো জ্বর রিল্যাপ্স করেছে।

আরাফাত যে শ্রেণীর নেতা, তাঁদের ক্ষেত্রে রোগ কিংবা অন্য যে কোনো ধরনের আক্রমণে শরীর ক্ষতিগ্রস্থ হলেও ইমেজ নষ্ট হওয়ার ভয়ে সেই খবর স্বীকার করা হয় না। তাই কেউ মানতে রাজি হচ্ছিল না যে, আরাফাত ভয়ানক রকমে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দিন ছয়েক এভাবেই কাটল। ১৭ অক্টোবর মিশর থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল এল চিকিৎসার জন্য। কিন্তু তাঁরাও রোগের উৎস নিরূপণ করতে পারলেন না। ডাক্তাররা বললেন, গ্যাসএন্ট্রাইটিস। অথচ ওষুধে কাজ হচ্ছিল না। দিন তিনেকের মধ্যে হু হু করে নামতে লাগল অনুচক্রিকার সংখ্যা। দেহের আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা বেড়ে চলল। অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে নানা রকমের পরীক্ষামূলক চিকিৎসা চলছিল। চলল স্টেরয়েড। কিন্তু কোনো লাভ হল না।

আরাফাত অসুস্থ জেনে ফোনের পর ফোন করে চলেছিলেন তাঁর স্ত্রী সুহা আরাফাত। সাড়া মিলছিল না। অসুস্থ ইয়াসেরের সঙ্গে কিছুতেই যোগাযোগ করতে পারছিলেন না সুহা। বলা হচ্ছিল সামান্য জ্বরই হয়েছে। শেষে অবশ্য কথা হল। কিন্তু সেই বার্তালাপের পর বিস্মিতই হয়েছিলেন সুহা। আরাফাত দম্পতি খুব ভালো করেই জানতেন যে, শত্রুপক্ষ সবসময়ে তাঁদের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বজায় রেখেছে। প্রতিটা ফোনকল ট্যাপ করছে বিপক্ষ। তাই ফোনে কথা বলার সময়ে অত্যন্ত কেজো তথা নীরস কথাই চলত দুজনের মধ্যে। ফর্মাল সুর ছেড়ে ওইদিনে অসুস্থ আরাফাত হঠাৎ করেই বলেছিলেন, 'সুহা, আই লভ ইউ!' চমকে উঠেছিলেন পত্নী সুহা। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আজকে হঠাৎ এভাবে কথা বলছ কেন?' ইয়াসের সেদিন আবার বলেছিলেন, 'আই লভ ইউ! আই লভ জাহওয়া!' জাহওয়া হল আরাফাত দম্পতির একমাত্র কন্যার নাম।

আরাফাতকে দেওয়া কোনো ওষুধেই কাজ হচ্ছিল না। টিউনিশিয়া থেকে এক দল

ডাক্তারকে আনা হল। ভয়ানক বমি এবং ডায়েরিয়ার প্রকোপে ইয়াসের তখন নাস্তানাবুদ। ভাবার মতো কথা যে, একজন ৭৫ বছর বয়স্ক মানুষের পক্ষে আর কতখানি কষ্ট সহ্য করা সম্ভব। মিশরের চিকিৎসকেরা স্টমাক লাইনিং-এ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বোঝার জন্য এন্ডোস্কপি করার কথা জানালে প্যালেস্টাইনের পক্ষ থেকে 'না' করে দেওয়া হল। বলা হল আগেই এন্ডোস্কপি করা হয়েছে।

২৮ অক্টোবর জর্ডন থেকে এল এক দল চিকিৎসক। কিন্তু হাল শোধরালো না দেখে পশ্চিমের কোনো দেশে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়ার কথা ঠিক হল সর্বসম্মতিক্রমে।

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দুটো চপার আরাফাতকে নিয়ে যেতে। সম্ভবত এই প্রথম আরাফাতকে মারার জন্য নয়, তাঁর জীবন রক্ষার জন্য কপ্টার আসছিল। দুর্বল আরাফাতকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হল। মাথায় চিরপরিচিত সেই ফিশনেট কাফিয়াটা ডান কাঁধ দিয়ে ত্রিভুজের মতো ঝুলছিল না। তার বদলে মাথায় শোভা পাচ্ছিল একটা রাশিয়ান ফারের টুপি। ক্ষীণ দেহ। মুখের বলিরেখা বৃদ্ধি পেয়েছিল। গালের পাকা, খোঁচা খোঁচা দাড়ির ফাঁকে চামড়ায় লাল, হলুদ ছোপ জানান দিচ্ছিল মানুষটা ভয়ানক অসুস্থ। জনতার ভিড়ে ভর করে এলেন মরুসিংহ। চপারে ওঠার সময় সমানে হাত নেড়ে নিজের সমর্থকদের উদ্দেশে ছুড়ে দিলেন চুম্বন। মুখে স্মিত হাসি— আমি ফিরে আসব, তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা ক'রো।

ফ্রান্সের পার্সি মিলিটারি হসপিটালের হেমাটোলজি ওয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হল আরাফাতকে। প্লাজমা, ব্লাড ক্লটিং এজেন্ট দেওয়া আরম্ভ হল। চিকিৎসায় সাড়া দিতে শুরু করল রোগী। বমি বন্ধ হল। ডায়েরিয়ার প্রকোপ কমল। এসবের পাশাপাশি একের পর এক পরীক্ষার মাধ্যমে চলতে লাগল রোগের সঠিক অন্বেষণ। কিন্তু কিচ্ছু ধরা পড়ল না।

তাহলে কি বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল আরাফাতকে?

ফরাসি চিকিৎসকেরা কিন্তু সে কথা কখনো স্বীকার করেনি।

সবই ভালোর দিকে এগোচ্ছিল। হঠাৎ করেই ৩ নভেম্বর অবস্থার অবনতি ঘটল। নাটকীয় ভাবে মুহূর্তে মুহূর্তে পালটাতে লাগল চিত্র। বিছানা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন অসুস্থ ইয়াসের। চিৎকার করছিলেন।

শারীরিক বেদনার উপশম ঘটানোর সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মানসিক ভাবে সুহা তাঁকে সাহস জোগাচ্ছিলেন, 'শান্ত হও! শান্ত হও!'

আরাফাতের বিছানার ঠিক পাশেই মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে ইয়াসেরের দুই হাতের ওপর হাত রেখেছিলেন সুহা। নিজের প্রাক্তন সেক্রেটারি, নিজের প্রেমিকা, নিজের পত্নী সুহাকে চিনতে পারছিলেন না মরুভূমির সিংহ। একটাও কথা বেরোচ্ছিল না আরাফাতের মুখ থেকে। নিথর হয়ে থাকা একটা অসহায় মানুষকে দেখে তখন কে বলবে যে ইসরায়েলের মতো একটা প্রবল শক্তিশালী রাষ্ট্রের চার দশকের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল এ-ই? চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল কেবল। আর সেই দৃশ্য দেখে কেঁদে খানখান হয়ে যাচ্ছিল সুহার হৃদয়, আরাফাতের প্রেমিকার বুক।

এটাই আরাফাতের ইহজীবনের অন্তিম দৃশ্য। এরপর কোমায় চলে যান তিনি। স্বাভাবিক ছন্দে আর ফিরতে পারেননি ইয়াসের।

সুহা নিজে ভালোবাসার মানুষকে ফিরিয়ে আনার জন্য সবরকম সম্ভাব্য প্রয়াস

করেছিলেন। মন মানেনি বলে আরাফাতের রুমে বসে কোরানের আয়াত পড়েও শুনিয়েছিলেন। সেই সময়ে ইয়াসেরের হাত নড়ে ওঠে। ডাক্তারকে ডেকে আনা হয়। ডাক্তার বলেন, কোমায় এমনটা হয়। আশার শেষ আলো ওখানেই নিভে গিয়েছিল।

আরাফাতকে মৃত বলে ঘোষণা করার খবর ছড়িয়ে পড়ছিল। সুহা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, 'ওঁকে জীবিত অবস্থাতেই কবর দিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।' প্যালেস্টানিয়ান অথোরিটির প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস অন্যান্য রাজনেতাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব গঠন করার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন।

একজন মৃত্যুপথযাত্রীর যাত্রা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ফরাসি ওই হসপিটালে ওই সময়ে আরাফাতের দেহ থেকে নানা স্যাম্পেল কালেক্ট করা হয়। আরসেনিক থেকে আরম্ভ করে প্রচলিত সমস্ত রকমের বিষ এবং ড্রাগসের উপস্থিতি আছে কিনা খতিয়ে দেখাও হয়। কিন্তু কোনো সূত্র মেলে না। 'ল্যুভে' এবং 'ফ্রেডরিখ'— এই দুটি ছদ্মনামকে ব্যবহার করেই এই সমস্ত রিপোর্ট করা হয়েছিল,যাতে প্রতিটা পরীক্ষণের গোপনীয়তা বজায় থাকে।

আরম্ভ হয় তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতির পরীক্ষা। গামা অ্যাকটিভিটির রিপোর্ট নেগেটিভ আসে।

অবশেষে ১১ নভেম্বর মরুসিংহের পথচলা থেমে যায়। আধিকারিক ভাবে তাঁর মৃত্যু ঘোষণা করা হয়। মৃত্যুর কারণ হিসাবে লেখা হয়, 'মিস্টেরিয়াস ব্লাড ডিসঅর্ডার'।

গুজব ছড়িয়ে পড়ে আগুনের মতো। কেউ বলে, অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে লিভার সিরোসিস হয়েছিল। কেউ লিখল, এইডস। কারো মতে আবার লিউকেমিয়া হয়েছিল আরাফাতের। এরই মাঝে প্যালেস্টাইনের বিদেশমন্ত্রী নাবিল শাথ দাবি করে বসলেন, 'আরাফাতকে রাজনৈতিক কারণে গুপ্তহত্যা করা হয়েছে।'

সাংঘাতিক এক তত্ত্ব! তাহলে কি আরাফাতের পতনই ঘটানো হয়েছিল? কে বা কারা ছিল এর নেপথ্যে?

ফরাসি চিকিৎসকেরা যে জানিয়েছিলেন কোনো বিষ দেওয়া হয়নি? নাকি কথাটাকে সামান্য অন্যভাবে পড়া উচিত— এমন এক বিষের ব্যবহার করা হয়েছিল যা ফরাসি ল্যাবরেটরিতে মেলেই না?

আর আশ্চর্যের বিষয় হল না সুহা, না প্যালেস্টাইন গভর্নমেন্ট কেউই আরাফাতের মৃতদেহের অটোপসি করানোর কথা ভাবেনি বা বলেনি।

কারণ কী?

সুহা পরে জানিয়েছিলেন, 'আমার মাথাতেই আসেনি ব্যাপারটা।' আর প্যালেস্টাইনের পক্ষ থেকে বিষয়টা ইসলামে হারাম বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হল, পয়জনিং-এর প্রশ্নটা তাহলে উঠছে কোথা থেকে?

২০০৯ সালে আরাফাতের এক প্রাক্তন উপদেষ্টা বাসসাম আবু শরীফ নিজের বই 'আরাফাত অ্যান্ড দ্য ড্রিম অব প্যালেস্টাইন: অ্যান ইনসাইডারস অ্যাকাউন্ট'- এ লিখে বসলেন যে, ইসরায়েল তেজস্ক্রিয় পদার্থের মাধ্যমে ইয়াসের আরাফাতকে হত্যা করেছে। তিনি লিখলেন, আইডিএফ আরাফাতের ওষুধ সরবরাহকারী অ্যাম্বুলেন্সটিকে আটক করে

আধ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালায়। তল্লাশি তো কিছুই হয়নি, সেই সময়ে কোনো ওষুধের ভায়াল বদলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় বিষাক্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং সেই পদার্থ নিয়মিত একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় আরাফাতের দেহে যেতে থাকার ফলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, প্যালেস্টাইনের মধ্যেই আরাফাতের শত্রুর অভাব ছিল না। তারাই হয়তো বিষপ্রয়োগে মেরেছিল তাঁকে। এক্ষেত্রে নাম উঠে আসে 'পপুলার রেজিস্টান্স কমিটিজ'-এর। এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটি ইয়াসের আরাফাতের মৃত্যুর অব্যবহিত সময় পরেই গাজা ভূখণ্ডের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স হেড জেনারেল মুসা আরাফাতকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে যায়। এরা নাকি আরাফাত পরিবারের কাউকে মসনদে চাইছিল না। কিন্তু উঠে আসে আরেকটা প্রশ্নও, যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের নাম পরে শোনা যায়, সেই 'পোলোনিয়াম ২১০' কি পপুলার রেজিস্টান্স কমিটিজের মতো ক্ষুদ্র সংগঠনের হাতে আসা সম্ভব?

তাহলে কে বা কারা?

প্যালেস্টাইনের এক অন্যতম আধিকারিক তথা স্বর্গত ইয়াসের আরাফাতের আত্মীয় নাসির আল-কুদওয়া বলেন, 'ইসরায়েলের হাতে পোলোনিয়াম আছে এবং তারা ইয়াসের আরাফাতকে হত্যা করার ক্ষমতা ও উদ্দেশ্য দুই-ই রাখে।' তরজা চলতে থাকে। খবর পাকা করে সুইজারল্যান্ডের ইন্সটিটিউট অব রেডিয়েশন ফিজিক্স জানায় যে, অসুস্থ হওয়ার পর থেকে চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে আরাফাত যে পোশাক ব্যবহার করেছিলেন কিংবা তাঁর কাফিয়া থেকে পাওয়া চুলে নাকি পোলোনিয়ামের অস্তিত্ব মিলেছে। চুলে পোলোনিয়াম যে স্তরে মিলেছে তাতে বোঝা যায় বেশ কিছু দিন ধরেই নাকি আরাফাতকে তেজস্ক্রিয় এই পদার্থের ডোজ দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু এসবই ২০১২ সালের ঘটনা।

আর মৃত্যু ঘটেছিল কবে?

২০০৪ সালের ১১ নভেম্বর।

মাঝে কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। তাই যখন ইসরায়েলের দিকে সন্দেহের আঙুল তোলা হতে লাগল, তখন ইসরায়েল জবাব দিল, সুহা এতদিন ধরে না কাচা জামাকাপড় রেখে দিয়েছিলেন? আচমকা মনে হল পরীক্ষা করা প্রয়োজন আর আকাশ থেকে হাত ঘুরিয়ে পোলোনিয়াম পাওয়া গেল? সেটাও ইসরায়েল দিয়েছে বলা হয়ে গেল?

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সুহা এবার আরাফাতের দেহ কবর থেকে তোলার অনুমতি জোগাড় করে ফেললেন। জেসাস ক্রাইস্টের পরে কার্যত আবার একবার 'রেজারেকশন' দেখল মধ্যপ্রাচ্য। রাশিয়া, ফ্রান্স এবং সুইস ফরেনসিক টিম এসে আরাফাতের দেহাবশেষের নমুনা সংগ্রহ করল। উদ্দেশ্য একটাই পোলোনিয়ামের অস্তিত্ব খোঁজা। কিন্তু ওই যে, মাঝে এতগুলো বছর চলে গিয়েছিল। আর পোলোনিয়ামের এই আইসোটোপের হাফ লাইফ ১৩৮ দিন ৯ ঘণ্টার সামান্য বেশি। এমতাবস্থায় প্রতি ১৩৮ দিন ৯ ঘণ্টায় এই পদার্থ ঠিক নিজের অর্ধেক পরিমাপে কমে আসে, আর তাই সেক্ষেত্রে ৮ বছরের এই সুদীর্ঘ ব্যবধানে এর নমুনা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবুও কাজ চলল। সুইস অথোরিটি জানাল, পোলনিয়ামের উপস্থিতি দেখা গেছে এবং আরাফাতের মৃত্যুর কারণও এই পোলোনিয়ামই হতে পারে। রাশিয়া এবং ফ্রান্সের রিপোর্ট কিন্তু সার্বজনীন করা হল না। পরে জানা গেল যে ফ্রান্সের রিপোর্টে পোলোনিয়ামের উপস্থিতি প্রমাণিত হলেও তা 'প্রাকৃতিক'। রাশিয়ার ফলাফলে বলা হয়েছিল, কোনো পোলোনিয়ামই মেলেনি।

ধোঁয়াশা! ধোঁয়াশা! শুধুই ধোঁয়াশা!

একজন মৃত ব্যক্তি। হত্যা নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু? চতুর্দিকে অজস্র শত্রু। অসংখ্য জিউসের রক্তে রাঙা হাত দুটোকে কাটার জন্য কি একবারও ভাবেনি ইসরায়েল? তা তো নয়— বহু বার ব্যর্থ প্রয়াস হয়েছে আরাফাতকে মারার। পরে খানিকটা মার্কিন চাপের ফলেই প্রকাশ্যে সেই হত্যার প্রয়াস থেকে পিছিয়ে এলেও কিন্তু ইসরায়েল হাল ছাড়েনি। শোনা যায়, ২০০৪ সালের ১১ নভেম্বরের ইসরায়েলের এক মিটিংয়েই নাকি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল ইয়াসের আরাফাতের ভাগ্য। বাকিটা ঈশ্বর জানেন। তবে হ্যাঁ, এই কথা মানতেই হয় যে, রোগে ভুগে মরুন বা বিষের প্রয়োগে, জীবনের অন্তিম ক্ষণে মরুভূমির এই দুর্ধর্ষ ব্যক্তি শত শত জিউসের রক্তে রাঙা দুই হাতেও প্রেমিকাকেই জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘সুহা, আই লভ ইউ!’

মারে মোসাদ রাখে কে

১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮। সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস। ভরা দুপুরবেলা। একটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে কয়েক জন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে ঘোরাঘুরি করছে। ওরা আসলে মোসাদ এজেন্ট। অল্পক্ষণের মধ্যেই অ্যাপার্টমেন্টের পার্কিং লটে এসে দাঁড়াল একটা রুপোলি রঙের পাজেরো গাড়ি। গাড়ির মধ্যে বসে আছে এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। মুখে চাপ কিন্তু নিখুঁত ভাবে ছাঁটা দাড়ি। উচ্চতা গড়পড়তা। পরনে কালো রঙের দামি একটা স্যুট।

লোকটা গাড়ি থেকে নামা মাত্রই অতিমাত্রায় সক্রিয়তা দেখা দিল মোসাদের এজেন্টদের মধ্যে। সিরিয়ার দামাস্কাস থেকে ইসরায়েলের তেল আভিভ অবধি ট্রান্সমিট হয়ে গেল একটা বাক্য, 'আওয়ার ম্যান হ্যাজ অ্যারাইভড অ্যান্ড হি ইজ অ্যালোন।'

কার কথা বলছিল মোসাদের এজেন্টরা? কী-ই বা করছিল সে দামাস্কাসে?

ওই ব্যক্তির নাম ছিল ইমাদ ফয়েজ মুঘানিয়া। হিজবুল্লাহ নামক জঙ্গি সংগঠনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিল ইমাদ। নিজে প্রতিষ্ঠা করেছিল লেবানন'জ ইসলামিক জেহাদ অর্গানাইজেশন।

১৫ নভেম্বর, ২০০১ সাল। আমেরিকার এফবিআই-এর পক্ষ থেকে জারি করা হল বিশ্বের মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসবাদীদের নামের একটি তালিকা। ২২ জন কুখ্যাত আতঙ্কবাদী, ২২টা নাম। এই তালিকায় প্রথম নামটা ছিল ইমাদ মুঘানিয়ার। ৯/১১-এর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার হামলা হওয়ার আগে অবধি এই ইমাদই ছিল সবথেকে বেশি সংখ্যক আমেরিকান নাগরিকের মৃত্যুর কারণ। ইমাদের মাথার দাম হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ভাবার মতো বিষয়ই বটে। কিন্তু কেন এ হেন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ইমাদের নামের ওপরে? কী এমন কাজ করেছিল সে?

উলটো দিক থেকে উত্তরটা খুঁজলে হয়তো সহজ হবে। কী এমন কাজ করেনি ইমাদ? তালিকাটা দীর্ঘ—

১৯৮৩

-বেইরুটের মার্কিন দূতাবাসে বোমা বিস্ফোরণ। তেষট্টি জনের মৃত্যু ঘটে। আহত হয়েছিল বহু মানুষ।

-বেইরুটের মার্কিন মেরিন ব্যারাকে বোমা বিস্ফোরণ। নিহতের সংখ্যা ছিল ৩০০ জন।

-লেবাননের ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ)-এর হেডকোয়ার্টার্সে বোমা বিস্ফোরণ। নিহত হয়েছিল ৬০ জন।

১৯৮৪

-আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব বেইরুটের প্রেসিডেন্ট ম্যালকম এইচ কেরকে হত্যার অপরাধ।

-লেবাননে নিযুক্ত সিআইএ-এর স্টেশন চিফ বিল বাকলেকে অপহরণ এবং হত্যার অপরাধ।

১৯৮৫

-ইসরায়েল এবং লেবাননের সীমান্তে আইডিএফ-এর কনভয়ে হামলা, যার ফলে ৮

জনের মৃত্যু হয়।

-টিডব্লিউএ ৮৪৭ ফ্লাইট হাইজ্যাকিং।

১৯৮৮

-কর্নেল উইলিয়াম হিগিন্সকে অপহরণ এবং হত্যার ষড়যন্ত্র।

১৯৯২

-আর্জেন্টিনায় অবস্থিত ইসরায়েলি দূতাবাসে বোমা বিস্ফোরণ। ২৯ জনের মৃত্যু ঘটে।

১৯৯৫

-বুয়েনাস এয়ার্সে জিউইশ কমিউনিটি সেন্টারে বোমা বিস্ফোরণ। নিহতের সংখ্যা ছিল ৮৬ জন।

১৯৯৬

-সৌদি আরবের খোবারের খোবার টাওয়ার্স-এ বোমা বিস্ফোরণের মাস্টারমাইন্ড।

আমেরিকা, ইসরায়েল সহ বিশ্বের নানা দেশের অগণিত সামরিক এবং অসামরিক ব্যক্তির রক্তে নিজের হাত রাঙিয়ে ফেলেছিল ইমাদ। একজন কট্টর সন্ত্রাসবাদী রূপে ক্রমশ নিজের ছায়াকে বড় করতে থাকা মুঘানিয়াকে দমন করা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠছিল আমেরিকা কিংবা ইসরায়েলের মতো দেশের ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলির কাছে।

কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল ইমাদ। ‘তাকে ধরা যায় না, তাকে মারা যায় না,’ এ কথাই চালু হয়ে গিয়েছিল সিআইএ আর মোসাদের করিডরে। যেন এক ভূত— ‘আ গোস্ট!’

ইমাদকে ধরতে না পারার একটা বড় কারণ ছিল সে মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশে অবাধে বিচরণ করত এবং কোথাও একটানা বেশি দিন থাকত না। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কাছে ইমাদের কুকীর্তির একটা দীর্ঘ তালিকা থাকলেও আসল জিনিসটাই ছিল না — তার হুলিয়া। ইমাদ মুঘানিয়াকে কেমন দেখতে কিংবা তার স্বভাব সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। কিছুতেই খুঁজে বের করা সম্ভব হচ্ছিল না তার লুকিয়ে থাকার জায়গাগুলোকে। কিচ্ছু জানতে পারছিল না এজেন্সিগুলি।

১৯৮২ সাল। ইসরায়েল আর লেবাননের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধল। হিজবুল্লাহর জন্ম হল। হিজবুল্লাহকে অস্ত্রশস্ত্র জোগান দেওয়ার পুরো কাজটা করেছিল ইরান’স রেভোলিউশনারি গার্ডস। প্রশিক্ষকের কাজটাও তারাই সেরেছিল। হিজবুল্লাহ নামক এই সংগঠনটিকে তৈরি করার একটাই উদ্দেশ্য ছিল—- ইসরায়েলকে ধ্বংস করে দেওয়া এবং নিজের জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকেই আঘাত হানা আরম্ভ করে দিয়েছিল। বাস্তবে ইরান-ইসরায়েল দ্বন্দের মধ্যে ইরানের হয়ে ছদ্ম যুদ্ধ চালাতে আরম্ভ করল এই সংগঠন। ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল আয়েতোল্লা খোমেইনির আদর্শে চলা হিজবুল্লাহ।

ওদিকে লেবাননে জমি হারাচ্ছিল প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা পিএলও। একটা সময়ে প্রায় ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেওয়া হয় পিএলও-কে। নিজেদের প্রাণ রক্ষা করার জন্য পিএলও-এর নেতা স্থানীয়রা টিউনিশিয়াতে পালিয়ে যাচ্ছিল। ইমাদ নিজে পিএলও-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল, ইয়াসের আরফাতের দলে একজন নির্ভরযোগ্য স্নাইপার হিসাবে কাজ করত। লেবাননে পিএলও মুছে গেলেও কিন্তু সে লেবানন ছেড়ে পালানোর পথে হাঁটেনি। আর এখান থেকেই ইমাদ মুঘানিয়ার রাজনৈতিক কেরিয়ারে একটা বিরাট

পালাবদল আসে। লেবাননে পিএলও-এর বিভিন্ন গোপন আস্তানার খবর তার কাছে ছিল। সেখানকার বিপুল পরিমাণ অস্ত্রের ভাণ্ডারের খবর ইমাদ দিয়েছিল হিজবুল্লাহকে। এরপর ওকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। মধ্যপ্রাচ্যের ত্রাসে পরিণত হয়েছিল ইমাদ মুঘানিয়া।

বহু জায়গায়, বিভিন্ন হামলায় এবং ষড়যন্ত্রে ইমাদের নাম জড়িয়েছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তার নামে ফাইল বানিয়েছে একাধিক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে ইমাদ মুঘানিয়া নামটির পাশে বিবরণের জায়গাটা হয় ফাঁকা রাখা হয়েছে নয়তো একটি ফাইলে লেখা ইমাদের বিবরণের সঙ্গে অন্য ফাইলে লিখিত বিবরণ মেলেনি। একটি রিপোর্টে লেখা হল যে, ইমাদ হিজবুল্লাহর লিডার শেখ মুহম্মদ হুসেন ফদলল্লাহর অঙ্গরক্ষী ছিল। আবার অন্য একটি ফাইলে বলা হয়েছিল, ইমাদ মুঘানিয়া হিজবুল্লাহর অপারেশনস চিফ। হিজবুল্লাহ পার্টির অনেক নেতা টিভিতে সাক্ষাৎকার দিত, অনেক নেতার ভাষণও দেখা যেত। সেই সব কথায় মূলত ইসরায়েলকে ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকিভরা বার্তাই থাকত। কিন্তু ইমাদকে কখনো এ ধরনের কোনো সাক্ষাৎকার বা ভাষণ দিতে দেখা যায়নি। অন্তরালে থাকা ইমাদ নিজের পরিচয় জানান দিত নিজের নাশকতামূলক কাজের দ্বারা। একের পর এক বীভৎস আক্রমণের ফলে মাত্র এক দশকের মধ্যেই ইমাদকে এফবিআই, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কিংবা মোসাদ মারাত্মক একজন সন্ত্রাসবাদী রূপে গণ্য করতে শুরু করে দিয়েছিল।

পাশ্চাত্যের কোনো ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কাছেই ইমাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য ছিল না। যেটুকু জানা গিয়েছিল তা হল, নিজের এক তুতো বোনের সঙ্গে ইমাদের বিয়ে হয়েছিল। তার স্ত্রীর নাম ছিল শাদা বদর আল-দীন। শাদা এবং ইমাদের তিন সন্তান; ফাতিমা, মুস্তফা এবং জিহাদ। ইমাদের বাবার নাম ছিল ফয়েজ। প্রাথমিক ভাবে কিছু রিপোর্টে ইমাদকে লেবাননের এক বিখ্যাত লেখক তথা রাজনৈতিক বোদ্ধা জাভেদ মুঘানিয়ার ছেলে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। পরে এটা ভুল তথ্য বলে প্রমাণিত হয়। এমনই ছিল ইমাদ, এমনই ছিল তাকে ঘিরে থাকা কিংবদন্তী। আর তাই ইমাদকে বলা হত, 'হিজবুল্লাহ'জ ফ্যান্টম! '

এই চলমান অশরীরীকে ঘিরে বাড়তে থাকা অস্বস্তির ফলে এফবিআই, সিআইএ-এর মতো এজেন্সিগুলি মোসাদের দ্বারস্থ হল। তারা জানত যে, পারলে একমাত্র মোসাদই করে দেখাতে পারে। বাইরের এজেন্সিগুলির সঙ্গে হওয়া কথামতো ইমাদের একটা প্রোফাইল বানাতে আরম্ভ করে দিল মোসাদ।

কী লেখা হল সেখানে?

-ইমাদ একা একা থাকতে পছন্দ করে।
-ইমাদ একজন অনন্য সাধারণ প্রতিভাবান মিলিটারি ট্যাকটিসিয়ান।
-মনের দিকে থেকে বেশ সংবেদনশীল মানুষ ইমাদ।
-ইমাদ সহজে কাউকে বিশ্বাস করে না।
-অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট সম্পর্কে ইমাদের ব্যুৎপত্তি অসাধারণ।

আটের দশক থেকেই সিআইএ, ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস এবং মোসাদ ইমাদকে ধরার বা গুপ্তহত্যা করার বহুবার চেষ্টা করেছিল। যেমন ১৯৮৩ সালে মার্কিন দূতাবাসে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর পর থেকেই হিজবুল্লাহ সিআইএ-এর রাডারে চলে আসে। ১৯৮৫ সালে সিআইএ ডিরেক্টর উইলিয়াম কেসি সৌদি আরবের সহায়তায় হিজবুল্লাহ নেতা মুহম্মদ হুসেন

ফদলল্লাহর ওপরে একটি গাড়িবোমা বিস্ফোরণ ঘটান। নিশানায় ছিল ইমাদ মুঘানিয়াও। কিন্তু এদের কিছু হয় না। ৮০ জন সাধারণ নাগরিক নিহত হয়। নিহতের তালিকায় অবশ্য ইমাদের এক ভাইও ছিল। এরপরেও একাধিক বার ইমাদকে মারার পরিকল্পনা করা হয় এবং প্রতি বারেই বেঁচে যায় সে। ২০০২ সালে জেএসওসি (জয়েন্ট স্পেশাল অপারেশনস কম্যান্ডো)-এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের চিফের মিটিং হয়। বিষয় ছিল ইমাদ মুঘানিয়ার গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা।

ইমাদ ছিল শিকারি বিড়াল। বিড়ালকে নিয়ে ইংরাজিতে একটা প্রবাদ খুব চলে— 'দ্য ক্যাট হ্যাজ নাইন লাইভস— থ্রি ফর প্লেয়িং, থ্রি ফর স্ট্রেয়িং, থ্রি ফর স্টেয়িং।' বারংবার অকৃতকার্য হওয়ার পর মোসাদ-কর্তারা ইমাদ মুঘানিয়াকে নাম দিয়েছিল, 'আ টেররিস্ট উইদ নাইন লাইভস।' অর্থাৎ, এমন একজন সন্ত্রাসবাদী যার কাছে ৯টা জীবন আছে।

কিন্তু এত গোপনীয়তা, একই লোকের রিপোর্টে এত রকমের ফেরবদল কীভাবে সম্ভব হচ্ছিল তা খুঁজে বের করতে কোনো কসুর বাকি রাখেনি মোসাদ। লেবাননের সঙ্গে দ্বিতীয় বার যুদ্ধের পর এমন কিছু প্যালেস্টাইনকে মোসাদ নিজেদের এজেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করে রেখেছিল, যারা হিজবুল্লাহ সংগঠনকে ঘৃণা করত। তাদের লেবাননেই রিক্রুট করে রাখা হয়েছিল। এমনই একজন এজেন্টের এক দূরসম্পর্কের বোন থাকত 'তায়র ডিব্বা' গ্রামে। এই তায়র ডিব্বা গ্রামেরই ছেলে ছিল ইমাদ। আর ইমাদকে নিয়ে সেখানে অনেক কথা চলবে এটাই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। মেয়েটি জানত না যে, তার তুতো সম্পর্কের ওই ভাই একজন মোসাদ এজেন্ট। একদিন এ কথা-সে কথা বলতে বলতেই মুখ ফসকে সে বলে ফেলে, 'কিছু দিন আগেই ইমাদ ইউরোপ গিয়েছিল। আর ইউরোপ থেকে ফেরার পর তো ওর মুখটাই পুরো পালটে গেছে। চেনাই যাচ্ছে না!' ওই মোসাদ এজেন্ট অস্ফুট স্বরে তখন একটাই কথা স্বগতোক্তি করে বলেছিল, 'প্লাস্টিক সার্জারি!'

এই দুটো শব্দকে সম্বল করেই আবার নতুন দিশা দেখতে আরম্ভ করে দিল মোসাদ। সামনে এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। ইউরোপের সমস্ত প্লাস্টিক সার্জারির ক্লিনিক চেলে ফেলার কাজটা সহজ নয় এ কথা আর কে না জানে? সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে থাকা অগুনতি মোসাদ এজেন্টদের কাছে একটাই মেসেজ পাঠিয়ে দেওয়া হল— 'নিজের এলাকার মধ্যে যেখানে যত প্লাস্টিক সার্জারি ক্লিনিক আছে তার বিস্তৃত বিবরণ জমা দাও!' কাজ হতে লাগল যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। অবশেষে খবরও মিলল। সংবাদ এল জার্মানির বার্লিন শহরের এজেন্ট জানাল ইমাদ একবার নয় ৮ বার প্লাস্টিক সার্জারি করিয়েছিল। আর সব ক'টাই করিয়েছিল (তৎকালীন) পূর্ব জার্মানির একটি ক্লিনিক থেকে। এই ক্লিনিক আগে ইস্ট জার্মানির স্টাসি (পূর্ব জার্মানির সিক্রেট পুলিশ 'স্টেট সিকিউরিটি সার্ভিস') চালাত। নিজেদের এজেন্টদের মুখের আদল প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে বদলে ফেলে বিভিন্ন অপারেশনে পাঠানোর জন্যই স্টাসি এই ক্লিনিকটিকে ব্যবহার করত।

মোসাদের তরফ থেকে ওই ক্লিনিকে যোগাযোগ করা হল। কিন্তু পেশাগত গোপনীয়তার কথা বলে ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ কথা বলতে রাজি হল না। সবই তো ঠিক ছিল, কিন্তু ক্লিনিক অথোরিটি এই কথা ভুলে গিয়েছিল যে, মোসাদ হল ইসরায়েলের এজেন্সি। আর ইসরায়েল যখন কাউকে লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেয় তখন স্বয়ং যমরাজও তাকে রক্ষা করতে পারে না। সবারই একটা বিক্রয়মূল্য থাকে, ক্লিনিকের কর্তৃপক্ষেরও ছিল। সেই পরিমাণ অর্থ দিয়ে ইমাদের ফাইল কিনে নিল মোসাদ। সেই ফাইলে পাওয়া গেল ইমাদের ৩৪টা সাম্প্রতিক ছবি। ফটোগুলোকে অ্যানালিসিস করে ফেলল মোসাদের টিম। তৈরি হয়ে গেল রিপোর্ট।

কী বলা হল রিপোর্টে?

-ইমাদ মুঘানিয়ার চোয়াল আর থুতনিতে অপারেশন করা হয়েছে।
-সামনের দিকের বেশ কয়েকটা দাঁত তুলে তাদের জায়গায় কৃত্রিম দাঁত বসানো হয়েছে।
-চোখের আকৃতিতে বদল এনেছে সার্জেন্ট।
-আগে চুলের রঙ ছিল কালো, শেষ অপারেশনের পর সব চুল ধূসর করে দেওয়া হয়েছে।
-ইমাদ চশমা ব্যবহার করত। লেসিক সার্জারি হয়েছে। এখন চশমার বদলে ব্যবহার করে কন্টাক্ট লেন্স।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, আটের দশক থেকে বিভিন্ন সময়ে নানা এজেন্সি ইমাদের যেসব ছবি নিজেদের সংগ্রহে রেখেছিল, তাদের সঙ্গে ইমাদের এখনকার চেহারা আর মিলবে না। ইমাদের খোলনলচে বদলে ফেলা হয়েছিল।

এবার আসরে নামে সিআইএ। মোসাদের গোয়েন্দাদের সঙ্গে কথাবার্তার পর তারা বিশেষ আইইডি বিস্ফোরক ব্যবহার করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। পরবর্তীকালে খবরে প্রকাশ পেয়েছিল যে, ইমাদকে মারার জন্য সিআইএ ২৫টি বোমা তৈরি করে ট্রায়াল দিয়েছিল। এমন ভাবেই সেই বোমা তৈরি করা হয়েছিল যাতে বিস্ফোরণের মাত্রা ভয়ানক হলেও বিস্ফোরণ-স্থলের ২০ ফুট দূরে থাকা কোনো ব্যক্তির ক্ষতি যেন না হয়।

মোসাদের চিফ সেই সময়ে মির ডাগান। উনি ইসরায়েলের কিডন নামক সংস্থাকে এই অপারেশনে আনার সুপারিশ করেন।

কিডন কী?

ইসরায়েলের এই সংস্থার প্রধান কাজই হল ইসরায়েল রাষ্ট্রের শত্রুদের গুপ্ত ভাবে হত্যা করা। কিডনের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বাইরে আসে না। বলা হয় যে, আইডিএফ-এর প্রাক্তনীদের নিয়েই কাজ করে কিডন। অপারেশন 'রাথ অব গড'-এর সময়ে কিডনের ভূমিকাই ছিল অগ্রগণ্য।

কিডন, মোসাদ আর সিআইএ, এই তিনটি ফলা ইমাদকে নির্মূল করার জন্য লেগে পড়ল। নিজেদের ফিল্ড ওয়ার্ক থেকে মোসাদ প্রাথমিক ভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, পশ্চিমের কোনো দেশে ইমাদকে নিকেশ করা মোটেই সহজ কাজ নয়। কারণ ইউরোপের কোনো দেশেই ইমাদ খুব দরকার না পড়লে ভ্রমণ করে না। তার বেশিরভাগ সময়টাই কাটে সিরিয়া এবং ইরানে। অর্থাৎ অপারেশন সারতে হবে মিডল ইস্টেরই কোনো দেশে। মোসাদ লেবানন, তিউনিসিয়ার মতো মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশে এর আগেও কাজ করেছিল। কিন্তু এই দেশগুলোর তুলনায় ইরান বা সিরিয়ার মতো দেশগুলো ছিল অনেক বেশি বিপজ্জনক এদের গুপ্তচর সংস্থাগুলি ছিল যথেষ্ট উন্নত এবং এদের সামরিক ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে গেলেও দু' বার ভাবতে হত প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রকে। তাই মির ডাগান বুঝেছিলেন, একটা ফেইলড মিশন মানে ইমাদ হাতছাড়া তো হবেই, তাছাড়াও যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকবে। আবার অন্য দিকে সফল হতে পারলে ইসরায়েল নিজের শত্রুদের তথা সন্ত্রাসবাদীদের বুক কাঁপিয়ে দেবে।

এরপরে টানা রেইকি চলল ইমাদ মুঘানিয়ার ট্রাভেল প্যাটার্ন নিয়ে। সেখান থেকেই বেরিয়ে এল নতুন সূত্র। মোসাদ অনুমান করল যে, ১২ ফেব্রুয়ারি ইমাদ দামাস্কাসে যাবে।

সেখানে ইরানিয়ান রেভোলিউশন-এর বর্ষপূর্তির উৎসব পালন হওয়ার কথা ছিল। কেবল ইমাদ নয়, ইরান এবং সিরিয়ার উচ্চপদস্থ সামরিক আধিকারিকদেরও উপস্থিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু পাকা খবর ছিল না, এটা ছিল অনুমান মাত্র। মোসাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল এই অনুমানের সত্য হওয়ার সম্ভাবনা ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ।

আরও গভীর তদন্ত চালানো হল। সিআইএ সহ বেশ কয়েকটি বিদেশি ইন্টেলিজেন্স সংস্থার সাহায্য নিয়ে নিজেদের সামনে কিছু প্রশ্ন সাজাল মোসাদ।

-মোসাদ কি সত্যিই ১২ ফেব্রুয়ারি দামাস্কাসে যাবে?
-যদি যায়, তবে কোন পরিচয়পত্র ব্যবহার করতে পারে?
-কী গাড়ি ব্যবহার করবে ইমাদ?
-কোথায় গিয়ে উঠবে ইমাদ?
-কে বা কারা ইমাদের সঙ্গী হবে?
-ইরান এবং সিরিয়ান অধিকর্তাদের সঙ্গে ইমাদ কখন দেখা করতে যাবে?
-সিরিয়ান গভর্নমেন্ট এবং হিজবুল্লাহ কি ইমাদের এই ট্রিপ সম্পর্কে অবহিত?

নিজেদের অপারেশনের সাফল্যের জন্য এই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরের প্রয়োজন ছিল মোসাদের। ভিন্ন ভিন্ন ইরানি এবং লেবানিজ তথ্যসূত্র থেকে মোসাদ এই খবর পাকা করে ফেলে যে, ১২ ফেব্রুয়ারি ইমাদ দামাস্কাসে যাচ্ছে। ব্যস! কিডনের এজেন্টরা বেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হয়ে সিরিয়ায় গিয়ে পৌঁছায়। মোসাদের একটি স্পেশাল টিম স্মাগলিং-এর মাধ্যমে দরকারি বিস্ফোরক পৌঁছে দেয় দামাস্কাসে। ঠিক ছিল ইরানিয়ান রেভোলিউশনের বর্ষপূর্তি করার জায়গার কাছেই কোথাও শেষ করে দেওয়া হবে ইমাদ মুঘানিয়াকে।

শেষ মুহূর্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর পায় মোসাদ। মোসাদের এক গুপ্তচর জানতে পারে যে, ইমাদ যখনই দামাস্কাসে যায়, তখনই সে একজন সুন্দরী মহিলার সঙ্গে দেখা করে। সেই মহিলা আসলে ইমাদের রক্ষিতা।

আরও তথ্য মিলল। মোসাদ, কিডন, সিআইএ-এর এজেন্টরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে গেল ইমাদের গোপন প্রেমের কথা জানতে পেরে। না, কোনো কেচ্ছা ছড়ানোর জন্য নয়, ইমাদকে এই দুনিয়ার ইতিহাস-কাহিনিতে স্থান করেদেওয়ার এত বড় সুযোগ যে এভাবে মিলবে তা যে তারা ভাবেনি।

ইমাদের রক্ষিতা; বয়স ত্রিশ বছর। নাম নিহাদ হায়দার। অসাধারণ রূপবতী। সিরিয়ার নাগরিক। নিজের রক্ষিতার সঙ্গে ইমাদ নির্দিষ্ট একটি বিল্ডিংয়েই দেখা করত এবং সেই বিল্ডিংয়ের মালিক ছিল সিরিয়ান প্রেসিডেন্টের এক খুড়তুতো ভাই, রামি মাক্লফ। মোসাদ জেনে গিয়েছিল যে, ইমাদ নিজের রক্ষিতার সঙ্গে দেখা করতে একলাই যায়। নিজের জীবনের হাজার ঝুঁকির কথা খুব ভালো ভাবে জানলেও ওই সময়ে ইমাদ সঙ্গে কোনো বডিগার্ড রাখে না।

১১ ফেব্রুয়ারি কিডনের হিট টিমের ৩ জন মেম্বার আলাদা আলাদা পথে গিয়ে পৌঁছাল দামাস্কাসে। ইউরোপের বিস্তীর্ণ দূরত্ব অতিক্রম করে এরা সিরিয়ায় পৌঁছেছিল, যাতে কেউ এদের কোনো ভাবেই সন্দেহ না করতে পারে। এদের একত্রিত হওয়ার পরে এরা মোসাদের এজেন্টদের সঙ্গে দেখা করে। মোসাদের এজেন্টরা আবার বেইরুটের পথে সিরিয়ায় প্রবেশ করেছিল। মোসাদের এজেন্টরা কিডন-এজেন্টদের নিয়ে গিয়ে একটি গ্যারাজে তোলে। সেখানেই রাতের থাকার আয়োজন করা হয়েছিল। এই গ্যারাজের মধ্যে

কিলিং টিমের জন্য একটি গাড়ি এবং দরকারি বিস্ফোরকের ব্যবস্থা করাই ছিল। কিডনের হিট টিমের ওই তিন সৈন্য সারা রাত জেগে বোমাটাকে ঠিক জায়গায় লাগায়। 'ঠিক জায়গা' বলতে ভাড়ার যে এসইউভি গাড়িটা কিডন টিম ব্যবহার করছিল, তারই স্পেয়ার টায়ারে বোমাটাকে লুকোনো হয়েছিল। অপর দিকে মোসাদের আরেকটি টিম ইমাদের রক্ষিতার অ্যাপার্টমেন্টের চারপাশে মোতায়েন হয়ে তীক্ষ্ণ নজর বজায় রেখেছিল।

১২ ফেব্রুয়ারি দুপুরে যেই না ইমাদের গাড়ি গিয়ে ওই বিল্ডিংয়ের সামনে গিয়ে থামল, তখনই সতর্ক হয়ে উঠল মোসাদ, কিডন এবং সিআইএ-এর টিম। সতর্কবার্তা গেল তেল আভিভে— 'আওয়ার ম্যান হ্যাজ অ্যারাইভড অ্যান্ড হি ইজ অ্যালোন।' ইমাদ যতক্ষণ নিজের প্রেমিকার সঙ্গে ছিল ততক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করল গুপ্ত হন্তারকরা। বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে ইমাদ বাইরে বেরিয়ে আসে। নিজের গাড়িতে চেপে সে রওনা দেয় নিজের পরবর্তী গন্তব্যস্থলের দিকে। মোসাদ, কিডন এবং সিআইএ-এর টিম মেম্বাররা তাকে অনুসরণ করতে থাকে।

মোসাদ টিমের কাছে পাকা খবর ছিল যে, ইমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল ক সোসা। সেখানেই তার সঙ্গে ইরানের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। নিজেদের অনুমান সত্যি হতে দেখে কিডন টিম গাড়িবোমাটিকে মাহমুদ আল ফাক্কানি রোডের পাশের একটি পার্কিং লটে নিয়ে গিয়ে রাখে।

রাত পৌনে দশটা নাগাদ ইমাদ ওই পার্কিং লটে পৌঁছায়। মিটিংয়ে যাওয়ার আগে সে নিজের গাড়ি পার্ক করে কিডনের রাখা গাড়ির দুটো গাড়ি পরেই। গাড়ি পার্ক করে যেই না ইমাদ দরজা খুলে বেরোতে যায়, তখনই মোসাদ, সিআইএ এবং কিডন এজেন্টরা রিমোট কন্ট্রোলড ব্লাস্ট ঘটায়। ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে কফ্র সোসা এলাকা। হিজবুল্লাহ পার্টির 'নম্বর টু' ইমাদ মুঘানিয়া, 'দ্য গোস্ট' ইমাদ মুঘানিয়ার কাহিনির 'দি এন্ড' হয় এভাবেই।

ইমাদের মৃত্যুতে প্রচণ্ড ভয়ানক ধাক্কা খেয়েছিল হিজবুল্লাহর নাশকতামূলক কাজকর্ম। সিরিয়ার নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর তৈরি করে তোলার ক্ষেত্রেও ইমাদ মুঘানিয়া সিরিয়ার সরকারকে সমানে সাহায্য করে চলেছিল। তাই পিছিয়ে গেল সেই প্রকল্পও। বিড়ালের ৯টা প্রাণ থাকলেও সবথেকে বলশালী শিকারির সামনে পড়লে সে প্রাণ খোয়ায়। ইমাদকেও প্রাণ দিতে হয়েছিল। কারণ যখন মারে মোসাদ, তখন রাখে কে?

অপারেশন প্লাজমা স্ক্রিন

দুবাই। বিশ্বের অন্যতম ধনকুবেরদের নগরী। সারা দুনিয়া থেকে হাজার হাজার পর্যটক ঘুরতে আসেন সৌদির এই শহরে। ওপর থেকে শান্ত জলাশয়ের মতো দেখতে হলেও ২০১০ সালের ১৯ জানুয়ারি দুবাই সাক্ষী হল এমন এক ঘটনার, যার ফলে কেঁপে উঠল আরব সরকার।

ঠিক কী ঘটেছিল দুবাই নগরীর বুকে?

মাহমুদ অল-মাহর হত্যা।

কে এই মাহমুদ অল-মাহ?

হামাস নামক জঙ্গি সংগঠনের মিলিটারি উইং 'ইজাজ অল-দীন অল-কাসাম' ব্রিগেডের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিল মাহমুদ। ১৯৮৯ সালে অর্থোডক্স জিউসের ছদ্মবেশ ধারণ করে আভি সাস্পোরটাস এবং ইলান সাদোন নামে দুজন ইসরায়েলি সৈনিককে অপহরণ এবং হত্যার মতো ঘৃণ্য কাজের সঙ্গে নাম জড়িয়েছিল এই হামাস নেতার। হত্যাকাণ্ডের পরে আল জাজিরা চ্যানেলে নিজের মুখ ঢেকে এবং নাম গোপন করে সাক্ষাৎকার দেয় অল-মারুহ। গর্বের সঙ্গে বলে, 'ওদের মারার সময়ে আমিই ড্রাইভ করছিলাম। প্রথম সৈনিকের মুখে ফায়ার করেছিলাম। দ্বিতীয় জনের কপালে গুলি না করার আক্ষেপ থেকে গেল।' দুই সৈনিককে মারার পর ওদের দেহ দু' পায়ে দলেছিল অল-মারুহ অ্যান্ড কোম্পানি। তবে হ্যাঁ, সেদিন মুখ এবং পরিচয় গোপন করে রাখলেও ইসরায়েল অল-মানুহকে চিনতে ভুল করেনি। তার গলার স্বরই বলে দিয়েছিলে সে কে।

হামাসের 'ইউনিট ওয়ান-ও-ওয়ান'-এর কম্যান্ডার থেকে হামাসের সর্বোচ্চ কর্তাদের একজন হয়ে ওঠার পিছনে ছিল শুধুই নৃশংসতার চেহারা। তার একটাই যোগ্যতা ছিল, সে ইসরায়েলের শত্রু।

এবং ইসরায়েল তার কোনো শত্রুকে ভোলে না। ১৯৮৯ সালে নেগেভ মরুভূমি থেকে ওই দুই সৈনিককে অপহরণ ও হত্যার পরই অল-মাহর নামে 'রেড পেজ' জারি করে মোসাদ। রেড পেজ হল ইসরায়েলের তরফ থেকে মোসাদকে দেওয়া একটা নির্দেশ, যার মাধ্যমে কাউকে হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয়। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর যৌথ সম্মতি ক্রমে রেড পেজ জারি হয়ে থাকে। অভিনব ব্যাপার হল কারো নামে রেড পেজ ইস্যু হওয়া মানেই তাকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করতে হবে এমন কোনো মানে নেই। এই রেড পেজের কোনো এক্সপায়ারি ডেট হয় না। হিট টিম ঠিক খুঁজে নেবে তাকে। কোনো না কোনো সময়।

তাই দেরিতে হলেও হিটলিস্ট অনুসারে যমের দ্বারে মাহমুদকে পাঠানোর সময় উপস্থিত হতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে ইসরায়েলের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি মোসাদ। যথা চিন্তা, তথা কাজ। মোসাদের পক্ষ থেকে চিফ মির ডাগান গ্রিন সিগন্যাল হিসাবে রেড পেজ আদায় করে নেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। প্রাইম মিনিস্টার বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু মিরকে বলেন, 'সেন্ড ইয়োর বয়েজ!'

মানুহ পরে জর্ডনে চলে যায়। সেখানে হামাসের একটা গোপন ঘাঁটি বানিয়ে ইরান থেকে অস্ত্র পাচার করে এনে গাজা স্ট্রিপে অশান্তিমূলক কার্যকলাপে নিয়মিত ইন্ধন জোগাত। ১৯৯৫ সালে মানুহকে জর্ডন সরকার নির্বাসিত করে। অবশ্য কেবল মাবুহই নয়,

নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল সকল হামাস নেতাকেই। দামাস্কাসে ডেরা জমিয়ে বসে সে। যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকে ইরানিয়ান রেভলিউশনারি গার্ডের সঙ্গে।

২০০৯ সালে ফৌজ রকেট ভর্তি ট্রাকের কনভয়কে গাইড করে নিয়ে যাওয়ার সময়ে ইসরায়েলি ড্রোনের হামলার মুখে পড়েছিল মাবুহ। বরাতজোরে রক্ষা পায় সে যাত্রায়।

মাবুহর গতিবিধি ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। চিন, ইরান, সিরিয়া, সুদান, মিশর এবং আরব আমিরশাহীর মতো দেশগুলিতে ঘুরে ঘুরে হামাসের জন্য অর্থ, অস্ত্র এসব জোগাড় করতে থাকে মাবুহ।

ইসরায়েল এবার মাবুহ নামক এই শয়তানকে শেষ করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল। ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে দুবাইতেই মানুহকে হত্যা করার প্রথম চেষ্টাও করে মোসাদের সিজারিয়া ইউনিট। হোটেলের যে রুমে মাবুহ উঠেছিল, সেই রুমের লাইট, ফ্যান এবং এসির সব সুইচে তথা দরকারি জিনিসে বিষ মাখিয়ে রেখেছিল সিজারিয়া ইউনিট। মাবুহ সেই বিষকে স্পর্শ করে, যথারীতি অসুস্থও হয়। কিন্তু সেবারেও রক্ষা পায় মাবুহ। মোসাদ এবার শপথ নেয় যে, এরপরের বারে দুবাইয়ের মাটিতে মানুহকে শেষ করে তবেই তারা দেশে ফিরবে।

২০১০ সালের ১৮ জানুয়ারি হিট টিম আবার দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। ব্রিটিশ, আইরিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান এবং অস্ট্রেলিয়ান পাসপোর্ট ব্যবহার করে তারা গিয়ে উপস্থিত হল সৌদি নগরীর বুকে। ১২জনের এই টিম মাত্র ১৯ ঘণ্টাই ছিল সেখানে। মাহমুদকে শেষ করার ৫ ঘণ্টার মধ্যে তারা দুবাই ছেড়ে বেরিয়েও আসে।

হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী তদন্ত করতে গিয়ে দুবাই পুলিশ সিসিটিভির ফুটেজ থেকে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে জুড়ে পুরো চিত্রটা সামনে আনে। কী জানিয়েছিল দুবাই পুলিশ?

১৯ জানুয়ারির ভোররাত থেকেই একের পর এক ফ্লাইটে চেপে ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ইতালি থেকে ব্যবসায়ীদের পরিচয়ে দুবাইতে প্রবেশ করতে থাকে মোসাদের হিট টিমের মেম্বাররা। ট্রলি ব্যাগ কিংবা ল্যাপটপ কেস হাতে আর ৫ জন সাধারণ যাত্রীর মধ্যে থেকে তাদের আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা কার্যত অসম্ভবই ছিল।

হিট টিমের মেম্বাররা আলাদা আলাদা হোটেলে উঠেছিল। কেভিন ডাভেরন নাম নিয়ে জাল আইরিশ পাসপোর্ট ব্যবহার করে এক সদস্য গিয়ে ওঠে আল বুস্তান রোতানা হোটেলে। দুবাইতে এলে এই হোটেলেই মাহমুদের থাকার কথা ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আল বুস্তান রোতানায় এসে উপস্থিত হয় মোসাদের আরেক এজেন্ট। সে পিটার এলভিঞ্জার নাম ব্যবহার করছিল।

এভাবে নানা হোটেলে চেক ইন করার পর টিমের মেম্বাররা সামান্য বিশ্রাম নিয়ে নেয়। এরপর তারা সম্মিলিত হয় একটি শপিং সেন্টারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল নিজেদের অপারেশনের কোনো বিন্দুতেই তারা একটি বারের জন্যও একে অপরকে ফোন করেনি। ফোন কিছু করা অবশ্য হয়েছিল, কিন্তু তার সবকটাই করা হয়েছিল অস্ট্রিয়ার একটি নম্বরে। একজন যে তথ্য সেই নম্বরে ফোন করে জানাচ্ছিল, অন্য জন সেই নম্বরে ফোন করে সেই তথ্যটাই জেনে নিচ্ছিল। রিলে করার মতো আর কি! মনে করা হয় যে, এই অপারেশনটির জন্য অস্ট্রিয়ার একটি হোটেলকেই নিজেদের কম্যান্ড সেন্টার বানিয়ে ফেলেছিল ইসরায়েলের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি মোসাদ।

ওদিকে নিজের আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে অজ্ঞাত মাহমুদ সিরিয়া থেকে ভোর ৩:১৫-র ফ্লাইট ধরেছিল। একজন মোসাদ এজেন্ট মাহমুদের গতিবিধির ওপর নজর রেখে সেইসব খবর সমানে পাচার করে চলেছিল হিট টিমের কাছে।

কিন্তু মাহমুদ অল-মাবুহ কেন আসছিল দুবাইতে?

ওই যে, যাকে নিয়তি বলে... নিয়তির টানে....

কেউ কেউ বলে, হামাসের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্মস ডিল করতে দুবাইতে আসছিল অল-মারুহ। কিন্তু তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো প্রমাণ মেলেনি। অল-মাবুহর দুবাইতে আসার কারণ এবং পদ্ধতি দেখলে মনে হয় দুবাইতে পা রাখার আগে থেকেই মোসাদ নিজের জালে ফাঁসিয়ে ফেলেছিল হামাসের এই শীর্ষকর্তাকে।

কীভাবে?

সিরিয়া থেকে জাল পাসপোর্ট এবং ভুয়ো নাম নিয়ে প্লেনে চাপে অল-মানুহ। পাসপোর্টে তার নাম ছিল মাহমুদ আবদুল রউফ মোহম্মদ। কিন্তু পাসপোর্টে নিজের নাম বদলালেও নসিব বদলাতে পারেনি অল-মাবুহ, কারণ সেই নসিব লেখার দায়িত্ব নিয়েছিল ইসরায়েলের মোসাদ। যে অল-মাবুহ সিরিয়ার মাটিতেও নিজের দেহরক্ষীদের ছাড়া এক পা হাঁটতে চাইত না, তাকেই একেবারে একা যেতে হচ্ছিল দুবাইতে। ওই ফ্লাইটে তার সঙ্গে কোনো সহায়ক কিংবা দেহরক্ষী যাওয়ার সুযোগ পায়নি। এয়ারলাইন্স অথোরিটি থেকে বলা হয়েছিল, 'ফ্লাইট ইকে ৯১২-তে আর টিকিট নেই!'

দুবাইতে পা রেখে ইমিগ্রেশন অফিসারকে যে পাসপোর্ট অল-মারুহ দিয়েছিল, তাতে পেশার জায়গায় লেখা ছিল 'মার্চেন্ট'। হ্যাঁ, মৃত্যুর সওদাই তো করত এই সওদাগর। তাই একদিক থেকে দেখতে গেলে কথাটা সত্যিই ছিল।

হিট টিমের কয়েক জন সদস্য দুবাইয়ের এয়ারপোর্ট টার্মিনাল থেকেই মানুহকে ফলো করতে শুরু করে এবং তার পিছু নিয়ে এসে পৌঁছায় পাঁচতারা হোটেল আল বুস্তান রোতানাতে।

তখন দুপুর ২:১২। হোটেলের মেইন লবিতে রিসেপশনের সামনে দিয়ে আনাগোনা করছে অজস্র টুরিস্ট। মার্বেলের মেঝের ওপরে তাদের ট্রলির চাকার শব্দ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ফোয়ারার জলের শব্দে। মাবুহ হোটেলের তিন তলায় নিজের বুক করা রুম নম্বর ২৩০-এ যাওয়ার জন্য এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছিল। ওর পিছু পিছু অপর দুজন টুরিস্টকে দেখা গেল। তাদের হাতে টেনিস র‍্যাকেট এবং কাঁধে তোয়ালে। মাথায় ছিল ক্যাপ। ওরা আসলে মোসাদের এজেন্ট ছিল।

মানুহ মোসাদ তথা ইসরায়েল নিয়ে বরাবরই সতর্ক থাকত। লিফটে ওঠার সময়ে সে নিজের পিছনে দুই টেনিস খেলোয়াড়কে একবার আড়চোখে দেখেও নেয়। আশ্বস্ত হয়, 'এরা আশা করি মোসাদ এজেন্ট নয়!'

নিজের সুরক্ষার দিকে কোনো খামতিই রাখেনি মাবুহ। হোটেলের রুম বুক করার সময়ে বেশ কয়েকটা শর্ত মেনে ঘর দিতে বলেছিল সে। যেমন—

-নন স্মোকিং রুম হতে হবে।
-রুমের উইন্ডো সিলড থাকবে।

-রুমে কোনো ব্যালকনি থাকবে না।
-রুমে ঢোকার দরজা থাকবে একটাই।

দ্রুত পদচারণায় দীর্ঘ লবি পার করে নিজের রুমে ঢুকে পড়ে মাবুহ। মাবুহর পিছনে থাকা দুই এজেন্ট তৎক্ষণাৎ টেক্সট মেসেজ করে পিটার এলভিঞ্জারকে মানুহর রুমের নম্বর এবং তার ঠিক উলটো দিকের রুমের নম্বর জানায়। পিটার নীচেই রিসেপশনে ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে ২৩০ নম্বর রুমের ঠিক বিপরীত দিকের ২৩৭ নম্বর রুমটি বুক করে নেয়।

বিকেলে ঠিক ৪:২৩-এ মাবুহ হোটেল থেকে বেরোয়। কিন্তু সে এই সময়ে কোথায় গিয়েছিল তার হদিশ মেলেনি। পরে দুবাই পুলিশ নিজের ইনভেস্টিগেশনে জানায় যে, মাবুহ আসলে দামাস্কাস থেকে দুবাই হয়ে প্রথমে চিন এবং পরে সুদানে যাওয়ার টিকিট কেটেছিল। দুবাই ছিল ওর কাছে বিশ্রামস্থল মাত্র। অথচ ইসরায়লের কাছে পাকা খবর ছিল যে, একজন ইরানি আর্মস ডিলারের সঙ্গে ডিল করার জন্যই দুবাইতে হল্ট করেছিল অল-মানুহ।

আসল 'কিল টিম' রোতানায় ঢোকে পাক্কা সন্ধে ৬:৩৪-এ। এজেন্ট ছিল চার জন। বৃষস্কন্ধ মোসাদ এজেন্টদের মাথায় বেসবল ক্যাপ, হাতে শপিং ব্যাগ এবং পিঠে ব্যাকপ্যাক ছিল।

সন্ধে আটটা বাজতেই মোসাদ এজেন্টরা মাবুহর রুমের বাইরে হলওয়েতে পজিশন নিতে থাকে। একজন স্পেশালিষ্ট ২৩০ নম্বর রুমের ইলেকট্রনিক লক ব্রেক করতে থাকে। তখন অন্যরা হলওয়েতে পাহারা দেয়। মাবুহ হোটেলে ফেরে ৮:২৩ নাগাদ। নিজের রুমে ঢোকে মাবুহ। সে বুঝতেও পারেনি যে, তার রুমে চার জন গুপ্তঘাতক অপেক্ষা করছিল।

মানুহকে প্রাণে মেরে ফেলা হয়। তার মৃত্যুটাকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক বলে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রথমেই তাকে সাকসিনিলকোলিন নামক একটি কেমিক্যাল ইনজেক্ট করে দেয় মোসাদ এজেন্টরা। সাকসিনিলকোলিন একটি সাংঘাতিক ধরনের মাসল রিলাকট্যান্ট। এর প্রভাবে এক মিনিটের মধ্যে সারা দেহে পক্ষাঘাত নেমে আসে। এই মারাত্মক ড্রাগের প্রকোপেই সম্ভবত মাবুহ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে যায় এবং তারপর তার মুখে বালিশ চাপা দিয়ে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা হয়।

রুদ্ধশ্বাস হলিউড মুভির কায়দায় পুরো অপারেশন সারে মোসাদ টিম। তবে মোসাদ বা ইসরায়েলের পক্ষ থেকে এই অপারেশনের কথা কখনো জনসমক্ষে স্বীকার করা হয়নি।

যে কথাটুকু না বললেই নয় তা হল, মোসাদ নাকি এই অপারেশনের নাম রেখেছিল 'অপারেশন প্লাজমা স্ক্রিন'। পরবর্তীকালে দুবাই পুলিশ সিসিটিভির ফুটেজ প্লাজমা স্ক্রিনের টিভিতে দেখেই এই কেসটিকে রিকন্সট্রাক্ট করেছিল। মোসাদের মতো সুচারু একটি এজেন্সির কাজে এ ধরনের সূত্র রেখে যাওয়া কাম্য ছিল না। তাহলে কি সূত্র রেখে যাওয়াটা ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত? এই কথা বোঝাতেই কি সূত্র রাখা হয়েছিল যে, ইসরায়েল তার শত্রুদের কক্ষনো ক্ষমা করে না?

জেহাদ এবং মোসাদ

[ইসরায়েল ভার্সেস র‍্যাডিক্যাল ইসলাম নিয়ে কিছু টুকরো কথা]

‘জেহাদ’ এবং ‘মোসাদ’ এই দুটো শব্দ আসলে এই বিশ্বের জীবন্ত ‘টম অ্যান্ড জেরি’। ২০০৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ‘দ্য গোস্ট’ ইমাদ মুঘানিয়ার মতো মাস্টার টেররিস্টকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিল মোসাদ। লেবাননের জেহাদি সংগঠন হিজবুল্লাহর হেড ইমাদ। একটা সময়ে এই ইমাদ মুঘানিয়া এফবিআই-এর মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে ওসামা বিন লাদেনকেও পিছনে ফেলে হয়ে গিয়েছিল ‘নম্বর ওয়ান’।

আর কাজ?

এই ব্যক্তি বেইরুট শহরে ২৪১ জন ইউএস মেরিন কম্যান্ডোকে একটি বোমা বিস্ফোরণে হত্যা করেছিল। শুধু তা-ই নয়, এই বিস্ফোরণ কাণ্ডে শত শত আমেরিকা, ইসরায়েলি, ফরাসি এবং আর্জেন্টিনিয়ান কম্যান্ডোর রক্ত বয়েছিল।

এরপর থেকেই ইসরায়েল নিজের লক্ষ্য স্থির করে নেয়— ইমাদকে মারতেই হবে। বার বার অসফল হয়। শেষে গিয়ে কাজ উদ্ধার হয় ২০০৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি।

আর এই পদক্ষেপ কিন্তু জেহাদের বিরুদ্ধে ইসরায়েল বা তার মোসাদের প্রথম পদক্ষেপ ছিল না, না ছিল অন্তিম পদক্ষেপ। একদম প্রথম থেকেই ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়ে এসেছে ইসরায়েল। সম্ভবত প্রত্যেক ইসরায়েলি এই কথাটা জানে যে, ইসলামিক সন্ত্রাস যত মজবুত হবে, ততই ওই সন্ত্রাসবাদীরা ইসরায়েলে অবস্থিত নিজেদের মসজিদগুলোকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা প্রবল করে তুলবে।

ইসরায়েল তখনও এই যুদ্ধ থেকে পিছু হটেনি, যখন মিশরে অগুনতি জনতা তাহরির স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে আমেরিকান ফ্ল্যাগ জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানানোর পরে ইসরায়েলি দূতাবাসে আক্রমণ করেছিল। সেদিন উন্মত্ত জনগণের দাবি ছিল একটাই— মিশর যেন ইসরায়েলের সঙ্গে করা শান্তিসন্ধি বাতিল করে দেয়।

এই ঘটনা এবং এরকম অনেক ঘটনা ঘটার পরে সারা বিশ্বে ইসরায়েলি নাগরিকেরা ইসলামিক মৌলবাদের নিশানায় এসে যায়। কিন্তু তবুও ইসরায়েল পিছু হটেনি। এক পা-ও নয়!

আজ ভারতে কিংবা বিশ্বের অন্যান্য দেশে ইসলামিক জেহাদের বিরুদ্ধে যে পরিবেশ গড়ে উঠছে, তার জন্য সাধুবাদ জানাতে হয় ইসরায়েলকেই। খুব নির্দিষ্ট ভাবে বললে সেই সাধুবাদের দাবীদার হল ‘মোসাদ’।

ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের উত্থানটাও বড় নাটকীয়। স্বল্প পরিসরে তা বোঝানো বড় কঠিন কাজ। কেবল এটুকুই বলা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, জেহাদিরা মধ্যপ্রাচ্যের বেইরুট, দামাস্কাস, বাগদাদ, তিউনিশ-এর মতো ভৌগোলিক গুরুত্ব সম্পন্ন শহরগুলিকে নিজেদের গড়ে পরিণত করে তুলেছিল এবং ইউরেশিয়ার প্যারিস, রোম, অ্যাথেন্স তথা সাইপ্রাসের মতো শহরে/ দেশগুলিকে নিজেদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল করে তুলেছিল এই সন্ত্রাসবাদীদের দল।

কিন্তু ইসরায়েলের মোসাদ ইসলামিক সন্ত্রাসের সঙ্গে কখনো আপোষ করেনি। তাদের কোনো সুযোগ দেয়নি। গত শতাব্দীর সাতের দশক থেকে মোসাদ সেই যে জেহাদিদের শিকার করতে আরম্ভ করেছে, তা আজও জারি আছে

বিগত ৪০ বছর ধরে অবিরত লড়াই চালিয়ে ইসরায়েল কিন্তু ইসলামিক সন্ত্রাসবাদকে কয়েক দশক পিছিয়ে দিয়েছে। এতটাই ধাক্কা খেয়েছে সন্ত্রাসবাদ যে আগামী চার দশকেও তাদের ক্ষতি পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর ঠিক এই কারণেই দুনিয়ার বেশিরভাগ ইসলামিক রাষ্ট্র ইসরায়েলের নামও মুখে আনতে চায় না।

চলতি শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ইরানের হুকুমত বলেছিল, 'আমরা ইসরায়েলকে এই পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দেব!' আর এই বাক্য উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ইরানের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। এতটাই ক্ষমতা ইসরায়েলের।

চলতি শতকের দ্বাদশতম নভেম্বর মাসের ১২ তারিখ। ইরানের তেহরানে একটি গোপন মিসাইল বেসে প্রবল বিস্ফোরণ ঘটল। ধ্বংস হয়ে গেল সেই গোপন ঠিকানা। ডজন ডজন মিসাইল মুহূর্তে পরিণত হল দগ্ধ লোহার টুকরোয়।

ওই মিসাইলগুলো কোন কাজে লাগত?

সমগ্র পাশ্চাত্য সমেত আমেরিকাকে নতজানু করার অস্ত্র ছিল ওই মিসাইলগুলোই। ওই ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর সাহায্যেই ইরানের জেহাদি সরকার সারা বিশ্বকে ধুলিস্মাৎ করে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল।

মিসাইল বেসের ধ্বংসাবশেষে উদ্ধারকাজ চলল। স্থানীয় পুলিশ সতেরোটি শবদেহ উদ্ধার করে আনল।

কাদের শবদেহ?

ইরানের শ্রেষ্ঠ কম্যান্ডো বাহিনীর সদস্যদের।

আর ধ্বংসাবশেষের এক কোণ থেকে উদ্ধার হল ইরানের মিসাইলম্যানের মরদেহ। জেনারেল হাসান তেহরানি মুগহদ্দম। ইরানের তৎকালীন মিসাইল প্রোগ্রামের ইনচার্জ। রক্তাক্ত, নিথর দেহ নিয়ে পড়ে ছিল ইরানের 'ফাদার অব শেহাব'।

'শেহাব' কী?

সেই সময়ে ইরানের সবথেকে দূর অবধি নিক্ষেপণের যোগ্য মিসাইলের নাম ছিল শেহাব।

অজস্র নষ্ট হয়ে যাওয়া মিসাইলের মধ্যে মুগহদ্দমের লাশ দেখে মনে হচ্ছিল এক পিতা নিজের কন্যাদের সঙ্গে নিষ্প্রাণ, রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

প্রাথমিক ভাবে সমগ্র বিশ্ব মনে করেছিল যে, এই হামলা জেনারেল হাসান তেহরানিকে হত্যা করার জন্যই করা হয়েছে। কিন্তু ভুল ভাবা হয়েছিল। সেই প্রমাদ নষ্ট হতে দেরিও হয়নি বেশি। সিআইএ, এফবিআই, র, আইএসআই, কেজিবি-এর মতো তাবড় গোয়েন্দা সংস্থা থাকতে এই জগতে কি কিছু চাপা থাকতে পারে? সেটাও আবার এমন এক সময়ে, যখন তাদের হাজার হাজার চোখ কৃত্রিম উপগ্রহ হয়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

এই উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন দুনিয়ায় সত্যি সত্যিই কিছু লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। অল্পকালের মধ্যেই সামনে এল আসল কথা— সলিড ফুয়েল নিয়ে যে রকেট এঞ্জিন কোনো

নিউক্লিয়ার মিসাইলকে ৬,০০০ মাইল দূরত্ব অবধি পাঠাতে পারত, সেই এঞ্জিনটাকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্যই আক্রমণ হয়েছিল।

নিউক্লিয়ার মিসাইল? ৬,০০০ মাইল?

হ্যাঁ, এটাই ইরান থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দূরত্ব।

ইরানের জেহাদি মাথারা আমেরিকার প্রধান শহরগুলোকে নিজেদের লক্ষ্যস্থলে রেখে বিশ্বের মহাশক্তি হয়ে ওঠার স্বপ্নকে লালন করে চলেছিল। কিন্তু 'নভেম্বর ব্লাস্ট'-এর ফলে সেই পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যায়। ধাক্কা খায় ইরানের বিশ্বশক্তি হয়ে ওঠার স্বপ্ন।

সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই 'নভেম্বর অপারেশন'-এর প্রশংসা করল। আর এই অপারেশনকে সফল করে তোলার পিছনে ছিল একটাই দেশ—- ইসরায়েল। আরও নির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে, মোসাদ।

কিন্তু ইরানের নিশানায় ছিল আমেরিকা, আর অপারেশন ইসরায়েল চালাল কেন?

কারণ ইসরায়েলের রাষ্ট্রপতি ইরান সরকারের সেই বয়ানে রুষ্ট হয়েছিলেন, যেখানে বলা হয়েছিল যে বিশ্বের মানচিত্র থেকে ইসরায়েলের নাম মুছে দেওয়া হবে।

ইসরায়েলের খারাপ লেগেছিল এবং ইসরায়েলের খারাপ লাগলে কী হতে পারে তারপরিণাম সারা দুনিয়া দেখল।

কিন্তু পেরস এখানেই থামলেন না। পেরস, শিমোন পেরস, মানে ইসরায়েলের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি। উনি বিশ্ববাসীকে বুঝিয়ে দিলেন একজন ইসরায়েলির কাছে রাষ্ট্র মানে কী। কতটা হতে পারে একজন ইহুদির জেদ, তার আন্দাজ দিলেন সকলকে।

নিজেদের বড় বড় বচনের ফলেই ইরান নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনল। আর বিপদের নাম যখন ইসরায়েল, তখন বিষয়টা ভাবায় বইকি।

আরম্ভ হল বিভিন্ন পারমাণবিক পরীক্ষণ প্রকল্পকে নষ্ট করার মধ্যে দিয়ে যন্ত্রপাতি, ল্যাব ভাঙচুর হয়ে যেতে লাগল সকলের অজ্ঞাতসারে। নিহত হতে লাগল একের পর এক ইরানি বৈজ্ঞানিক। ইরানের সৈনিক সাজসরঞ্জামে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে থাকল। সেনার জন্য দরকারি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম তৈরির করার জন্য কাঁচামাল সরবরাহকারী সংস্থাগুলি মাল দেওয়া বন্ধ করে দিল। অনেকে পাততাড়িই গুটিয়ে বন্ধ করে দিল নিজেদের ব্যবসা। ইরানের সেনাদলের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্তাব্যক্তি তথা বিজ্ঞানীরা পরিবার সমেত অজ্ঞাত দেশের উদ্দেশে পাড়ি দিল।

সমগ্র ইরানের ইন্টারনেটে দৌড়াতে লাগল মারাত্মক ভাইরাস।

এতেও শান্ত হলেন না শিমোন পেরস। আর এভাবে চলতে চলতে এক সময়ে একটা এমন দিন এসেই পড়ল যখন এই ছদ্মযুদ্ধের পরিণাম অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। এ ধরনের ছায়াযুদ্ধের ফলে যে কোনো রাষ্ট্রের সেনার মনোবল তলানিতে গিয়ে ঠেকে। ইরানি সৈন্যদের সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটল 1

শেষমেশ, ইরানি সেনারা হরতাল করে দিল। এই সব ঘটনা ঘটাকালীন, ইসরায়েল একটাই জিনিস ভেবেছিল— তারা বানরের হাতে তরোয়াল দেখতে চায়নি। মানে, ইরানের

মতো জেহাদি দেশের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র চলে আসুক তা তারা চায়নি।

আমেরিকা ইসরায়েলের এই কাজের কাছে ঋণী ছিল, আছে এবং থাকবে। ঋণী হয়ে থাকা উচিত সমগ্র বিশ্বের। মোসাদকে বা ইসরায়েলকে যত বড় কুর্ণিশি করা হোক না কেন তা তাদের কাজের তুলনায় কিছুই নয়। কাজটা প্রায় অসাধ্যই ছিল।

বিগত শতাব্দীর শীতযুদ্ধে (কোল্ড ওয়ার) যখন বিপক্ষের কোনো গুপ্তচর ধরা পড়ে যেত, তখন তাদের প্রাণে মারা হত না। বার্লিনের কোনো শীতক্ষেত্রের কুয়াশা ঢাকা একটি ব্রিজের দুই প্রান্তে দুই পক্ষ গিয়ে দাঁড়াত। এক এক করে নিজেদের অধীনে বন্দি গুপ্তচরের অদল বদল চলত। রাশিয়ান হোক বা আমেরিকান, ব্রিটিশ হোক বা জার্মান, প্রত্যেক পক্ষের গুপ্তচরেরা জানত যে, কোল্ড ওয়ারে ধরা পড়লেও প্রাণে মারা হবে না। কিন্তু মোসাদের গুপ্তচরেরা জানে যে, বিশ্বের যে কোনো শত্রু-দেশে ওদের ধরা পড়ার মানে একটাই, মৃত্যু। ইসলামিক কট্টরপন্থা, জেহাদের বিরুদ্ধে তাদের এই নজরদারি করার কাজের খেসারত একটাই, জেহাদির বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়া।

তাই ইসরায়েলের কোনো কাজই সহজ ছিল না, সহজ হবেও না। তাদের এ ধরনের কাজের মূল্যায়ন স্বল্প পরিধিতে করতে পারা কার্যত অসম্ভব। দুরূহ। তবুও কিছুটা চেষ্টা করা হল। পাঠকদের পছন্দ হলে পরবর্তীতে ইসরায়েল নামক বেড়ালের বাঘ হয়ে ওঠার কাহিনিকে আরও বড় আকারে সামনে আনা হবে।

***